দেবপাল

কামাল রাহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

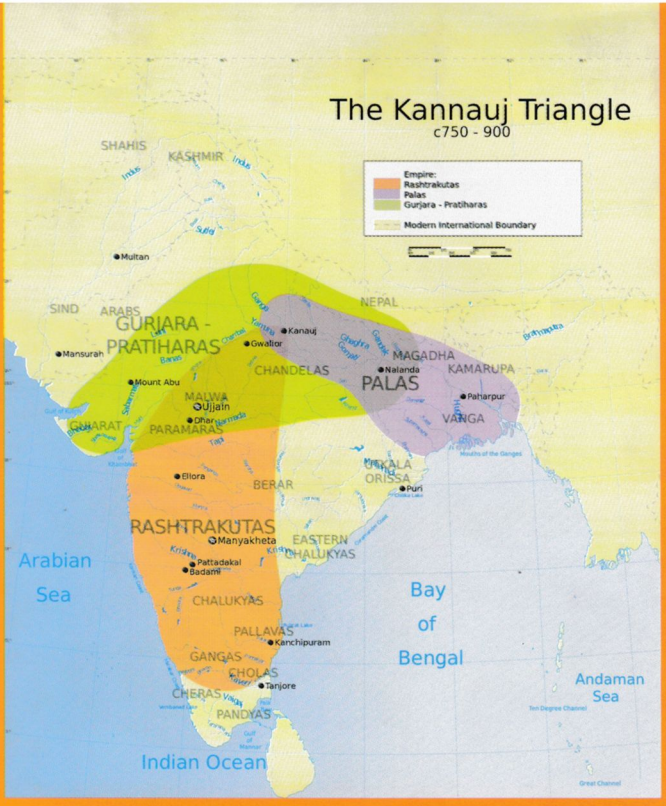

পুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

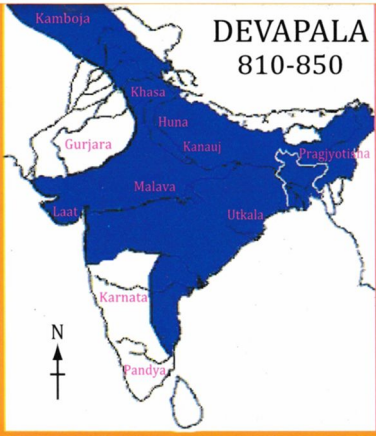

দেবপাল উপন্যাসটি পূর্বভারতের পাল রাজ্যের সুদীর্ঘ চারশো বছরের ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। পালরাজবংশের নৃপতিদের মধ্যে দেবপাল দক্ষতা ও নৈপুণ্যগুণে অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে এক অনন্য ইতিহাস গড়ে তুলেছিলেন। সম্রাট অশোকের পর এ ভূখণ্ডে এত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা আর কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। পালরাজ্যটি পূর্বে চীন সীমান্ত ও পশ্চিমে বর্তমান আফগান সীমান্ত প্রায় ছুঁয়েছিল। বাংলা-বিহারকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে এত বড় সাম্রাজ্য কখনোই ছিল না। বলা যায় পালরাজাদের সময়টাই বঙ্গালদের শ্রেষ্ঠ সময়। আমাদের অসামান্য মানসিক কৃতিত্ব যে নিজেদের বীরদের প্রশংসা না করে দূরদেশের প্রভুদের পূজা দিতে বেশি ভালোবাসি আমরা। যে বখতিয়ারের কাছে আমাদের স্বাধীনতা খর্ব হয়েছিল তার বীরত্বগাথা প্রচার করি। অথচ রাজা লক্ষণ সেনের গায়ে পালিয়ে যাওয়ার কলঙ্ক লেপন করতে কুণ্ঠিত হই না।

ইতিহাস বিস্মৃতি জন্ম দেয় ইতিহাস বিকৃতি। সাম্প্রতিক কালেও এর প্রভাব দেখা যায়।

বঙ্গাল রাজা দেবপাল অসীম কৃতিত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্যটা গড়ে তুলেছিলেন। অথচ প্রকৃত উত্তরাধিকারী রেখে যেতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী কয়েকশো বছরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উপন্যাসটির ভেতর ঐ সময়টাকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ত্রিকোণ ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে তিনটি বিশাল সাম্রাজ্যের একীভূত রূপ। পূর্বভারত, পশ্চিমভারত ও দক্ষিণভারত প্রকৃত অর্থেই তিনটি দেশ। ঐতিহাসিক কাল থেকে এই তিনটি অঞ্চল পরস্পর ঠোকাঠুকি করে নিজেদের আত্মবিনাশ ডেকে এনেছে। ফলে ভিনদেশীয়রা এখানে এক উগ্র সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এসবের যথাসম্ভব বিশেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি পাঠক পালরাজাদের চারশো বছরের ইতিহাসের ভেতর কিছু সময়ের জন্য হলেও বাঙালির প্রকৃত বীর, নিজেদের মূল সূত্র ও ভুলে যাওয়া ইতিহাসের কিছুটা সন্ধান পাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

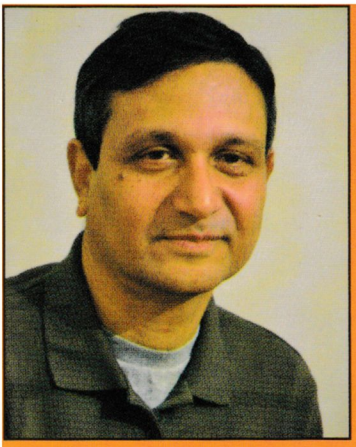

কামাল রাহমান

জন্ম: ১১ জানুয়ারি ১৯৫৫, শেরপুর, বাংলাদেশ।

শিক্ষা: এমবিএ।

পেশা: প্রাক্তন ব্যাংকার (শেষ কর্মস্থল: অধ্যক্ষ, প্রিমিয়ার ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, ঢাকা)।

পৈতৃকবাস: কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
মাতৃকবাস: সিলেট, বাংলাদেশ।

বর্তমান অবস্থান: যুক্তরাজ্য।

লেখকের অন্যান্য বই:

উপন্যাস: তাজতন্দুরি, ঝুমপাহাড়, অন্য আলো, ঝড়। গল্পগ্রন্থ : শীতের আপেল ও কমলা, স্টোনহেঞ্জ, ইঁদুর। কবিতা অনুবাদ: প্রেম ও অন্যান্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবপাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবপাল

কামাল রাহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

© ২০১৭ কামাল রাহমান

প্রথম প্রকাশ
বিজয় দিবস ২০১৬

প্রচ্ছদ
রিও

ধ্রুবপদ
রুমী মার্কেট
৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড ঢাকা-১১০০
প্রকাশক ॥ আবুল বাশার ফিরোজ
মুদ্রণ ॥ আলভী প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৪৮/৩ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা-১১০০
সেলফোন ০১৬৭০-৭৬৯০৪২

দাম
৩৫৫ টাকা মাত্র

ISBN 978-984-92168-9-6

Devpal by Kamal Rahman
Published by Abul Basar Firoz, Dhrubapada
Rumi Market 68-69 Payridas Road, Dhaka-1100
e-mail : dhrubapadafiroz@yahoo.com
: dhrubapadafiroz@gmail.com
First Edition : The Victory Day of 2016
Price : Taka 355 Only US $ 18 € 14

USA DISTRIBUTOR : MUKTADHARA
3769 74th ST Fl 2, JACKSON HEIGHTS
NY 11372. TEL : (718) 565-7258

ঘরে বসে ধ্রুবপদ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/dhrubapada
ফোনে অর্ডার করতে 015 1952 1971 হট লাইন 16297 এবং
www.porua.com.bd

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

পূর্বভারতের বিস্মৃত বীরপুরুষদের, যাঁদের অবদানে
বাংলা নামের একটা দেশ জন্ম নিতে পেরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি–
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী ।

–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

বরেন্দ্রর বুক চিরে বয়ে যাওয়া গঙ্গা ও এর অসংখ্য শাখা ও উপশাখার দু'তীরে শত সহস্র জনবসতি গড়ে উঠেছিল সেই কোন অনাদিকালে তা এখানের মানুষগুলোর জানা ও কল্পনারও বাইরে। এত জল বয়ে আনে নদীগুলো অথচ প্রতি বছর খরার মওসুমটা দুঃসহ হয়ে দেখা দেয় মানুষগুলোর জীবনে। খাবার না পেয়ে শত শত মানুষ ও অগুনতি পশুপাখি প্রাণ হারায়।

বুড়োবুড়িদের মুখে শোনা যায় সুদূর কোন অতীতে কোনো এক রাজার ভাণ্ডার থেকে এ সময়টায় সাধারণ মানুষগুলোকে খাদ্যশস্য ঋণ দেয়া হতো। আবার ফসল মওসুম এলে ওগুলো ফিরিয়ে দিলে চুকে যেত সব। কিন্তু এ সময়ের সামন্তরাজারা শুধু জনগণের রক্ত শোষণ করাটাই বোঝে। ওদের প্রয়োজনেই যে গরিবগুর্বো এই মানুষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তা বোঝে না।

চৈত্র মাসের আগুনে জলবাতাসে বরেন্দ্রর লালমাটি তাতিয়ে ওঠে উত্তরাবর্তের কিশোরী বালিকার রক্তিম শরীরবর্ণের মতো। অন্যান্য বছর তবু এক পশলা বৃষ্টি হয় মাঘ-ফাল্গুনে। ওটাও হয়নি এ বছর। গুটি ধরার আগেই ঝরে পড়েছে আমের বোল। জলশূন্য হয়ে পড়েছে কম গভীর জলা জায়গাগুলো। দীর্ঘ এ খরায় শুধু মানুষই না, পশুপাখিদের জীবনও বিপন্ন হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠেছে। ঘাসবিচালি না পেয়ে গরুমোষগুলো হাম্বা হাম্বা ডেকে ছোটোছুটি করে একটু গলা ভিজিয়ে নেয়ার জন্য। মানুষের তাড়া খেয়ে দিক ঠিক করতে না পেরে কোথাও পড়ে যায় মুখ থুবড়ে। উঠে যাওয়ার সামর্থ্য বা ইচ্ছে কোনোটাই থাকে না আর ওদের।

মানুষগুলো তবু কচি তালশাঁস খেয়ে জলের তৃষ্ণা কিছুটা মেটাতে পারে। বনজঙ্গলের লতাপাতা খেয়ে ক্ষুধা মেটাতে পারে। মাটির এই ধরণীতে এমন কিছু নেই যা মানুষেরা খায় না। জলের মাছ, আকাশের পাখি, জমির ফসল, গাছের ফলপাকুড় সবই খায়। অথচ এ জগতে ওদের ক্ষুধা কখনো মেটে না। বনজঙ্গল কেটে উজাড় করে, নদী নালা খাল বিল জলাশয় দখল করে সব নিজের করে নেয়। অন্য সব প্রাণীর কোনো অধিকার যেন নেই এ পৃথিবীতে।

তালশাঁস খেয়ে ফেলে দেয়া খোসা চিবিয়ে গরুমোষগুলো ক'দিনই বা আর বাঁচে। তারপর আবার যখন তখন সামন্তের লাঠিয়াল এসে গোশালার সামনে দাঁড়ায় গরুমোষের দুধ দুইয়ে দিতে। শালারা বোঝেও না যে দুধের বড় অংশ জল। ঘাসবিচালি না পেলে, জাবনা না খেলে, গরুমোষগুলো পেটের ভেতর দুধ জমাবে কী করে। প্রাণীগুলোর পাছা দিয়ে পেচ্ছাবই বেরোয় ফোটায় ফোটায়। তাও আবার মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুষে নেয় রুখা মাটি। এক রত্তি সবুজ নেই লাল মাটির উপর। এসব কিছুই বোঝে না সামন্তের পাইক। শুধু বলে দুধ চাই। নইলে সামন্তগিন্নির খরগের নিচে মাথা। মনে মনে গাল আসে মানুষগুলোর। শালারা, সামন্তগিন্নির দুধ দুইয়ে নিস না কেন। কিন্তু ওটা বলার সাহস আছে কারো?

সন্ধ্যার কালি-আন্ধার পেরোনোর পর পঞ্চমীর চাঁদ ওঠে আকাশে। পথ ঘাট সব পরিষ্কার। মোষের বাথান নিয়ে উত্তরে পালিয়ে যাওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে বেরোয় অভিনন্দ। রাতের অন্ধকারে গরুমোষগুলো বাথান ছেড়ে বেরোতে চায় না। অভিনন্দেরা তিন ভাই, বড়ো ভাইয়ের দু'ছেলে, ওর মেজো ভাই ও নিজে, সব মিলিয়ে ছয় জোয়ান। এঁড়ে-বাছুর-বকনা একুনে তেইশটা অবলা প্রাণী একসঙ্গে দু'তিনটা করে বেঁধে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় ওরা। সবার পেছনে অভিনন্দ। ওর নিয়ন্ত্রণে চারটে মহিষ। শক্তপোক্ত একটা মহিষের পিঠে বসে সামনের পথ দেখিয়ে এগিয়ে যায় অভিনন্দের মেজো ভাই ছিতপ। পিছনে যেতে যেতে ওর মহিষটার সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলে অভিনন্দ।

'সামান্য আর একটু এগিয়ে যা কালাভূতু। নদীর ধারে কাশবন পাবি, পেট ভরে সবুজ কাশ চিবিয়ে নদীর জলে নাক ডুবিয়ে জল খাবি, তারপর ধ্যাদ্দের, ধ্যাদ্দের ধ্যাদ্দের-ধ্যাদ্দের চল কালাভূতু, চল, এই একটুখানি রাস্তা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাত পেরিয়ে যায় অভিনন্দের এই একটুখানি রাস্তা পেরোতে। সান্তালদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে রাখা আছে ওখানে। শুকনো মওসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গলে থাকতে দেবে ওরা। ফেরার সময় দুটো দুধেল গাই রেখে আসতে হবে। দুধ উঠে গেলে গাই দুটো ফিরিয়ে দেবে। বাছুর দুটো থেকে যাবে ওদের কাছে। কথার কোনো নড়চড় নেই সান্তালদের। গাই দুটো ফিরে পাবে নিশ্চিত। অভিনন্দদের জন্য এ চুক্তিটা ভালোই বলা চলে।

শেষ রাতে নিজেদের গ্রামে ফিরে আসে ওরা। তারপর সংসারের যাবতীয় গাট্টিবোঁচকা নিয়ে আবার সান্তাল গ্রামে যেয়ে ওঠে। নদীর ধারে পতিত জমিতে ঘরবাড়ি বেঁধে লুকিয়ে-ছাপিয়ে খরার কটা মাস পার করে দিতে পারলে হয়। তারপর আবার সামন্তের পাইকেরা এসে ধরে নিয়ে যাবে। ধরা দেয়ার জন্য ওরাও প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এমনটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। মওসুমের সময় ফসল ফলাতে হবে ওদের। নয়তো রাজার খাজনা যাবে কোথা থেকে। আর নতুন নতুন পাট্টা লেখা হবে কেমন করে। ওদের যখন প্রয়োজন তখন মুনীষের জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে। কেউ যেতে না চাইলে জোরজবরদস্তি করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এই চলছে অভিনন্দদের বংশ-পরম্পরা।

ক্লান্ত ও শ্রান্ত শরীরে মানুষগুলোর সঙ্গে গরুমোষগুলোও নেতিয়ে পড়েছে। নদীর ওপারে বুনো বাঘের চোখের হিংস্রতা নিয়ে সূর্য উঁকি দিয়েছে। ভগবানের পৃথিবীর এই সামান্য অংশটা ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে সবার চোখের সামনে। সবার আগে সক্রিয় হয়ে ওঠে মোষগুলো। প্রতিকূল আবহাওয়ায় টিকে থাকার শক্তি মনে হয় একটু বেশি ওদের। গঁ-গঁ ডেকে উঠে নদীর তীরে জন্মানো কাশবনের দিকে এগিয়ে যায়। ওদের দেখাদেখি গরুগুলোও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে একটু সময়। তারপর উঠে যায়। একটা বুড়ো গাইগরু এতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যে প্রথমে পেছনের পা দুটো মাটিতে চেপে ধরে শরীরের অর্ধেকটা তোলার পর সামনের দুপা অর্ধেক ভাঁজ করা অবস্থা থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারে না। অভিনন্দের চোখে পড়ে দৃশ্যটা। দৌড়ে যেয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করে ওকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গরুটা দেখে অন্য গরুমোষগুলোর রোদজ্বলা শণ ও ঘাস খাওয়ার দৃশ্যটা। তারপর ধীরে ধীরে ওখানে যেয়ে নিজেও অংশ নেয়, জীবনে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদটা নেয়ার জন্য।

ক্ষুধায় পেট চোঁ-চোঁ করে অভিনন্দের। অন্য সবারও নিশ্চয়। যেভাবেই হোক খাবার জোটাতে হয় এখন। পাশের গ্রামের সান্তালগুলোর খাবারে অভাব দেখা দেয় না কখনো। আকাশে পাখি আছে যত দিন ওদের হাতের তীরধনুকও রয়ে যাবে ততদিন। ঘুম থেকে উঠেই ওরা বেরিয়ে পড়ে শিকারে। কিন্তু অভিনন্দদের দু'মুঠো শস্যদানা না হলে চলে না। সান্তাল মুখিয়ার বাড়ির খোঁজে পা বাড়ায় সে। বাড়িতেই পেয়ে যায় ওকে। দু'খাঞ্চি চাল ভুট্টা গেঁউ যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক ধারের প্রস্তাব দেয় সে। দুধ ও মাখন দিয়ে শোধ করে দেবে। মুখিয়া সরেনবংশি বেশ রসিকজন। হেসে বলে–

'বাহা রে, ভঁইসার দুধের মাকখম, বাহা রে। লিয়ে যাও ভেইয়া। দু'খাঞ্চি বই তো নয়।'

হাসিটা মুখে ধরে রেখেই ডাকে–

'ওরে ধান্ন, গোলা খুইলে দুই খাঞ্চি গেঁউ দে তো দিখি।'

অভিনন্দের দিকে তাকিয়ে বলে–

'কিসে নিবে ভেইয়া, খাঞ্চি আইনছ?'

এত সহজে ধারটা পেয়ে যাবে তা হয়তো ভাবেনি অভিনন্দ। হঠাৎ আবিষ্কার করে যে সে খালি হাতে এসে পড়েছে। বলে–

'এই ঘুরে আইছি বলে মুখিয়া। আরেকজন সঙ্গী আনতে হবি তো। দুই খাঞ্চি একা বইতে পারব না।'

'এক কাজ কর রে ভেইয়া, খাঞ্চি একখান আমি ধার দেইছি। আইবার সময় ফিরা আনবি।'

একটু ভাবে অভিনন্দ। তারপর বলে–

'এক কাজ করলে হয় মুখিয়া, এই বেলা না আইলে?'

'হয়। ঐ বেলা আইলেও হয়। কাইলও হয়, পরশুও হয়। শুধা না আইলেই না হয়।'

হো হো করে হাসে মুখিয়া। ওর কালো মুখচোখ থেকে উজ্জ্বল দ্যুতি বেরোয়। বেশ একটা মজার মানুষ পাওয়া গেল বটে। মনে মনে ভাবে অভিনন্দ। বলে–

'না মুখিয়া, ঐ বেলাই আসব।'

গমের খাঞ্চিটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বলে মুখিয়া–

'জনমুনিষি কয় জুন যিন বুলছিলি তু?'

'এগারো জন।'

'ই ভগবান। দুই খাঞ্চি গেঁহু কয় দিনি খাবি রে?'

'শুধা গেঁহুর ছাতুই খাইনি আমরা মুখিয়া।'

'আমরাও শুধা গেঁহু খাইনি বটেক।'

'আর কী কী খাও মুখিয়া?'

'দুধ মাকখম।' বলে হাসতে থাকে মুখিয়া। আবার বলে–

'চাইল খাই, ভুট্টা খাই। আছমানের পঙ্খি, জঙ্গলের ছুট্টু ছুট্টু জন্তুজানুর, ফলপাকুড় খাই। আমরার খাওনের কুনু কমি নাইরে বুইঙ্গা।'

অভিনন্দকে বুইঙ্গা ডাকায় সে একটু ব্যথা পায় মনে মনে। বলে–

'তুরা তু জঙ্গুলে থাকিস, জংলি, তুদের কুনো অভাব থাকবি কেনে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বুদ্ধিমান সান্তাল মুখিয়া। ওর মুখে কালো ছায়া দেখে জিজ্ঞেস করে–

'বুইঙ্গা বুলায় মনে দুখ পাইলি ভেইয়া? তুমার নামডি তু আমরার জিভে আইছে নেইরে। কী যিনু বুইলছিলি, অবুনু...'

'থাউক মুখিয়া। তুমি বুইঙ্গাই বুলো।'

'ঠিক আছে, বুইঙ্গা ভেইয়া।'

বলে হাসে মুখিয়া।

নাহ্, এখন হাঁটতে হয়। মাথায় বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখিয়ার সঙ্গে খোশগল্প করার সময় নেই। ক্ষুধায় পেটের নাড়ির প্যাঁচ খুলতে শুরু করেছে। মুখিয়া বোধ হয় ওর মনের কথাটা ধরতে পেরেছে। হাত বাড়িয়ে বলে–

'খাঞ্চিটা টুখানি মাটিত নামাই রাখ তু দেখি।'

নিজেও হাত লাগায় ওটা মাটিতে নামিয়ে রাখার জন্য। বলে–

'দাঁড়া টুখান।'

দৌড়ে ঘরে যেয়ে এক ছড়ি পাকা কলা নিয়ে আসে। ওখান থেকে দুটো কলা ছিঁড়ে খেতে দেয় ওকে। খালি পেটে কলা দুটো যেয়ে ছুঁচোর কীর্তন গাওয়া শুরু করে। খাঞ্চিটা আবার অভিনন্দের মাথায় তুলে দিয়ে বলে–

'চল ভেইয়া, আমু যাবি তুর লগি।'

সামনের দিকে পা বাড়ায় দু'জনে। সান্তাল পাড়ার গাছপালা-ছাওয়া শীতল ঘরবাড়ির আঙ্গিনা পেরোতেই গ্রীষ্মের সূর্যে তাতানো বাতাসের হল্কা জাপটে ধরে অভিনন্দের শরীর। সামনে ধূ ধূ মাঠ। কোথাও ছায়া নেই। নদীর ধারে বাঁশবন। ওটা পেরিয়ে জনশূন্য ছোট্ট একটা বুনো ঝোপের মতো জায়গায় ওদের থাকার অনুমতি দিয়েছে মুখিয়া।

নদীর ধারে পৌঁছে ওরা দেখে এরিমধ্যে সংসার পেতে বসে গেছে মানুষগুলো। জঙ্গল কেটে খুঁটি বানিয়ে ঘর তুলে ফেলেছে। শণ দিয়ে চাল ছাইছে এখন। একটা একচালার নিচে চুলো বানিয়েছে ওর বৌদিদি। কোঁচ দিয়ে গেঁথে ওর মেজোভাই নদী থেকে মাছ ধরে এনেছে। কুটে বেছে আদা-হলুদের কন্দ ও লবণ মরিচ দিয়ে রান্না চড়িয়েছে। বাতাসে খাবারের গন্ধ পেয়ে ও এত তাড়াতাড়ি একটা পারিবারিক ছবি দেখে কিছুটা অবাক হয় অভিনন্দ। সান্তাল মুখিয়ার মনে হয় বিশ্বাস হয় না দৃশ্যটা। বলে–

'কুবে থেকে তুরা এখানে আছিস রে বটেক!'

একটা গাছের গুড়ি দেখিয়ে বলে ওকে অভিনন্দ–

'ইকটুখন বসিক মুখিয়া। টুখানি দুধ দুইয়ে দি।'

টুক করে মাটিতে বসে পড়ে মুখিয়া। হেসে বলে–

'মাকখুম দিবি না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মাকখুম তু তুলতি হবিরি মুখিয়া। তুলি নি, তখুন দিবনি।'

'জানিরে বুইঙ্গা ভেইয়া। তাম্‌সা কইরছি।'

কলার ছড়াটা দেখিয়ে বলে–

'খাইয়ে নে সব্বে মিলে।'

হাতে হাতে কলা ছিঁড়ে নেয় সবাই। অভিনন্দও নেয়। দুটো কলা মুখিয়াকেও খেতে দেয়।

গেঁহু দেখে পরিবারের মানুষগুলোর চোখ চকচক করে। কিন্তু মাছ দিয়ে তো গেঁহু খাওয়া যায় না। মুখিয়া জিজ্ঞেস করে–

'মাছ দিয়ি গেঁহু খাবু কিমুন করিরে?'

'মাছ খাই আমরা ভাত দিয়ি। গেঁহু ছাতু করিয়ে খাবু।'

বাড়ির বউঝিরা মাটির মালসা, হাড়ি পাতিল, হলুদ লবণ এসব যা সম্ভব নিয়ে এসেছিল। কিন্তু চাক্কি আনা সম্ভব হয়নি। রাতে ফিরে যেয়ে দেখবে। তখনো ওটা থেকে থাকলে মোষের পিঠে বেঁধে নিয়ে আসবে। কিন্তু ছোটো একটা গাইল-ছিক্কা নিয়ে এসেছিল ওরা কাঁধে করে। দু'হাড়ি গম ভেজে গরম গরম ছাতু বানিয়ে নেয়। সঙ্গে কলা মিশিয়ে সবার খাবার হয়ে যায় বেশ ভালোভাবে। মুখিয়াও ছাতু কলা খায় ওদের সঙ্গে। মাছের কথা আবার জিজ্ঞেস করে মুখিয়া–

'মাছ খাবি কেমুন করিরে বুইঙ্গা ভেইয়া?'

এবার একটু কৌশল করে অভিনন্দ।

'মাছ খাতি চাইলি ভাত লাগে যে মুখিয়া। চাইল পাবু কই?'

একটু ভেবে মুখিয়া বলে–

'চল আবার আমার লগে। এক কাড়ি চাইল ধার দিবুনি।'

'পারলি এক খাঞ্চি দেনা মুখিয়া। শুধ করি দিবুনে।'

'শুধের কথা হইছি নারে বুইঙ্গা। অত চাইল নাই। আইচ্ছা, দেখি আধা খাঞ্চি হইনি।'

'তাইলি কী অই আরেক খাঞ্চি গেঁহুও দিবি?'

'দিবেরে বুইঙ্গা, দিবে। সান্তালরা কথা ফিরায় না।'

'তাইলি ভাইটিক সঙ্গি নিতি হবিক।'

'নিয়েলি।'

মেজোভাই ছিতপকে সঙ্গে নিয়ে আবার সান্তাল পাড়ার পথে পা বাড়ায় অভিনন্দ। সূর্য তখন মাথার উপর। প্রায় জনমানবহীন এই মাটিতে আগুনের গোলা ছুঁড়ে দিচ্ছে। নদী তীরের এদিকটা মনে হয় প্রতি বছর বন্যায় তলিয়ে যায় আর গ্রীষ্মে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কোনো গাছপালা নেই। ছোটো ছোটো ঝোপঝাড় যাওবা জন্মে এক ঋতুর বেশি টিকে থাকতে পারে না। মাটির নিচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেকড়বাকড় থেকে গেলে পরের বছর সুদিনে আবার জীবনের অন্বেষণে সবুজ ছড়ায়। ফুল ফোটায়। ফলের আকাঙ্ক্ষায় পুজো দেয় মাতৃরূপী এই ধরণীরে। দিগন্তের দিকে চোখ রাখা যায় না। ধূ ধূ করে চোখে জ্বালা ধরায়। মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলের ধারে সান্তাল পাড়ায় পৌঁছে একটা গাছের নিচে বসে পড়ে অভিনন্দ। মুখিয়া বলে–

'বুইঙ্গা ভেইয়ারা শুধা মাছ ভাত খায়, হাঁটুত জুর নাই।'

অভিনন্দের আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। মুখিয়ার বাড়ি যেয়ে এক ভাড় জল খেয়ে চাউল ও গেঁহু নিয়ে ফেরার পথে পা বাড়ায়। একটু এগিয়েই মনে পড়ে, 'এইরে, মুখিয়াকে দুধ দুইয়ে দেয়া হয়নি!' ফিরে যেয়ে কথাটা বলতে যেতে চেয়েও আবার থেমে যায়। নাহ্, দুধ দুইয়ে নিয়ে আবার আসবে। কিন্তু এই আগুনজ্বলা রোদের মধ্যে ধূ ধূ মাঠ আবার পেরোতে হবে ভেবে মনের ভেতরটাই জ্বলতে থাকে।

ফিরে এসে দেখে কাশবনের ভেতর ছোটো একটা পরিবার মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে। একটা ঘরের চালার নিচে এসে শুয়ে পড়ে অভিনন্দ। ছিতপকে বলে–

'একটু জিরিয়ে নিয়ে একটা মোষ বা গাই দুইয়ে এক ভাড় দুধ যেন মুখিয়াকে দিয়ে আসে। ভীষণ ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়ে পড়ে অভিনন্দ। ঘুম ভাঙার পর জেগে দেখে সূর্য অনেকটা হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। নদীতে নেমে সাঁতরে স্নান করে ফিরে আসে। ভাত রান্না হয়ে গেছে ততক্ষণে। বাতাস মিষ্টি হয়ে ওঠেছে ভাতের গন্ধে। সবাই মিলে খেতে বসার কথা মনে হলে ওরা দেখে যে আশপাশে কোনো কলাগাছ নেই। ভাত খাবে কিসে নিয়ে। মাটির দু'তিনটে মালসায় নিয়ে খাওয়া যায়। কিন্তু কাকে ফেলে কে আগে খাবে। মুখিয়াদের পাড়ায় অনেক কলাগাছ আছে। কিন্তু শুধু কলাপাতার জন্য আবার এতটা পথ হাঁটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে পড়ে, প্রতি বেলায়ই তো কলাপাতা লাগবে। এখন কলাগাছের চারা পুঁতে আরও মাসখানেকের আগে পাতা পাওয়া যাবে না। তবে ওটা বড় কথা না। কলা বা কোনো ফলমূল গাছের আবাদ দেখলে সামন্তের পাইক বুঝে নেবে যে এখানে বসতি রয়েছে। ওদের হাত থেকে লুকিয়ে থাকা যাবেই বা আর ক'দিন?

এখন তো সমস্যা দেখা দিয়েছে রাঁধা-ভাত খাওয়া নিয়ে। ওদের বড় ভাই বিদ্যক বলে–

'বাচ্চাগুলিন খাউক আগে।'

সায় দেয় অভিনন্দ। বলে–

'একসঙ্গে ওদের মায়েরাও খেয়ে নিতে পারে।'

সব শেষে খেতে বসে ওরা তিন ভাই। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু জিরিয়ে আবার গাঁয়ে ফিরে যেতে হবে। সংসারের টুকটাক যা আছে নিয়ে আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। যদি এরিমধ্যে সামন্তের পাইকেরা সব ভেঙেচুরে ফেলে দিয়ে না থাকে। বিশেষ করে গম পেষাইর চাক্কিটা তো আনতেই হবে। সঙ্গে দুটো মোষ নিয়ে নেয়। সন্ধ্যা হলে মোষের পিঠে চড়ে দু'ভাই যাত্রা করে। বাড়ি পৌঁছে দেখে সব ঠিকই আছে। যা যা সম্ভব নিয়ে রাতারাতি ফিরে আসে।

কোনো ঝুট-ঝামেলা ছাড়া নদীর ধারে কাশবনের ভেতর দুটো দিন কাটিয়ে দেয় অভিনন্দেরা। কিন্তু মানুষ তো পালিয়ে বাঁচে না। মানুষের স্বভাবও না ওটা।

সান্তাল মুখিয়ার সঙ্গে বেশ ভালো ভাব হয়ে যায় অভিনন্দের। খুব মজার মানুষ সে। কালো কয়লা রং মানুষের ভেতরটা যে এত সাদা ভাবতে পারেনি অভিনন্দ। প্রতিদিন এসে ওদের সংসার দেখে যায়। গরুমোষগুলো সুখী মনে নদীর চরে ঘুরেফিরে পেট ভরিয়ে ঘড়া-ভরা দুধ দিতে শুরু করেছে। সান্তাল পল্লিতে দুধ বেঁচে টুকটাক এটা-সেটা লেনদেন করে সংসারের প্রয়োজন আপাতত মিটিয়ে নেয়া যায়। একদিন খুব সকালে এসে মুখিয়া বলে যে আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার ওদের। সামন্তের পাইকেরা প্রায়ই এসে ঘুরে দেখে কোথাও কোনো মানুষজনের সন্ধান পায় কিনা। শুকনো মওসুম এখন। নদীর দিক থেকে ভয় নেই। নৌকা চলে না। কিন্তু নদীর ধার ঘেঁষে পায়ে হাঁটা পথে ঘুরে বেড়ায় ওরা। গরুমোষ দেখতে পেলে ধরে নেয় যে আশপাশে ওদের মালিকেরা লুকিয়ে আছে। ফিরে গিয়ে দলবল নিয়ে এসে ধরে ফেলে মানুষগুলোকে। তখন রক্ষা পাওয়া খুব কঠিন। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে।

অভিনন্দ জিজ্ঞেস করে–

'তোমাদিগ কিছু কয় না ওরা?'

'কেন্ বইলবিক না? বইলতি আসে। তু কিনা হামগির তীরে কুচিলার বিষ আছি না?'

'তুরা কী তীর ছাঁড়িস?'

'পরথম পরথম ঝাঁরি নে। যা চাইলি, যা দিয়ি পায়ি, দিয়ি-থুয়ি বিদ্দে করি দি। বাড়াবাড়ি কইরলে হামরা তীর ঝাঁরি।'

'তাপর লাইঠ্যেল নি আইলে?'

হো হো করে গলা ফাটিয়ে হাসে মুখিয়া।

'জঙ্গুলে পাইলে যাই।'

'জঙ্গুলে ঢুকা পারে না উরা?

'উরা তু আইসি লাঠি বল্লুম লিইয়ে। হামরা তু তীর ঝাঁরি দূর থিকি। হামরাক পাবি কিনে?'

বিষয়টা বুঝতে পারে অভিনন্দ। চড়চড় করে রোদ উঠে আসে মাথার উপর। মুখিয়াকে নিয়ে নদীর ধারে যায় সে। অনেকটা ঘুরে নদীর একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাড়িতে এসে বসে ওরা। পেছনে খাড়া পাড় থাকায় ছায়া পড়েছে ওখানে। বেশ শীতল জায়গাটা। নদীর তীর ধরে কেউ হেঁটে গেলেও দেখতে পাবে না ওদের। তীরের মাটিতে বেশ কিছু গর্ত। ওগুলো দেখিয়ে মুখিয়া বলে সাবধানে থাকতে। ঘড়িয়ালের বাসা। ওখানে ডিম পাড়ে ওরা। হিংস্র কিনা জিজ্ঞেস করলে মুখিয়া বলে কোনো কোনোটা তো হিংস্র বটেই। বিশেষ করে পানিতে। সে জানিয়ে দেয় যে নদীতে স্নান করতে নামার সময় যেন সাবধানে থাকে।

আশপাশে কোনো ঘড়িয়াল দেখতে পাচ্ছে না কেন জিজ্ঞেস করলে মুখিয়া বলে গরমকালে ওরা গভীর পানিতে নেমে যায়। আর শীতকালে চরের বালুতে রোদ পোহাতে আসে।

অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে ওরা। মুখিয়া বলে–

'দেখ বুইঙ্গা ভেইয়া, তুরা খালি পাইলে বেড়াইস ইখেন থিকে সিখেনে। নিজে মরিস, হামগিরেও মারিস।'

'তুদিগ মারলিম কেনে?'

'তুরা খালি জঙ্গুল কাটি ফেলিস। হামরা কুখনো জঙ্গুল কাটি নে। এই জঙ্গুলই হামগির দ্যাওতা। হামগির খাতি দেয়, হামগির রইকখি করিয়ে, হামরায় বাঁচি রাখিয়ে।'

'জঙ্গুল না কাটি ফসল ফলি কিমনে? কী খাই বাঁচি?'

'তুরা তু ঝারিবংশি কাটি ফেলিস।'

'তাইলে তুরা আছিস কুন্ঠে?'

'ই রে, আই দিগি, হামগির জঙ্গুল কাইটবি, রাজার পাইক পারি নি, হুঁ!'

'তা বটিক, মুখিয়া।'

অভিনন্দ বুঝতে পারে নিজেদের সমাজের অবস্থাটা। কী করবে ওরা? মুখিয়ারা তীর ধনুক হাতে তুলে নিতে পারে। ওরা তো ওদের পেশার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের বাইরে অন্য কিছু হাতে ধরার সাহসও রাখে না। সমাজের অনুমতি নেই। জাতপাতের বাঁধনে বাঁধা ওরা। মুখিয়াকে জিজ্ঞেস করে–

'তু হামরা কী করবেক রে মুখিয়া?'

'জঙ্গুল কাটিস নে। পালি থাকতি পারবি।' বলে হাসে আবার।

অভিনন্দও যোগ দেয় ওর হাসিতে।

'পালি থাকলি কী জনম কাটি মুখিয়া, খাবু কী?'

'হামগির মতু ফলমূল খা, শিকার করি খা।'

'হামগির যি মাছ ভাত নইলি চলি নে।'

'তু খা তুরা, মাছ ভাত খা।'

ওর চকচকে মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে অভিনন্দ। বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জঙ্গুল না কাটলি হামরা ধান ফলি কুন্থে?'

'হামগির মাতায় তুরার মতু বুদ্দি নিইরে বুইঙ্গা ভেইয়া, তুরা ভেবি বেইর কর।'

অভিনন্দের মাথায়ও কিছু আসে না। এই সব হা-ভাতে মানুষগুলো কখনো তো রাজাউজির হওয়ার স্বপ্ন দেখে না। দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে-পড়ে বেঁচে থাকতে চায় শুধু। তাও নিজেদের উৎপাদনে। অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে না। নিজেরটা ছেড়ে অন্যের সীমানায় এক পাও বাড়ায় না। কী দোষ ওদের? দেশের কে রাজা, কে মন্ত্রী, তাও জানার দরকার বোধ করে না। যার জোর বেশি সেই রাজা হোক। বরং শক্তিশালী রাজা থাকাই ভালো। শুধু ঐ রাজার সেলামি দিয়ে বাঁচা যায়। অন্য রাজারা হামলা করতে সাহস পায় না।

বাবামায়ের মুখে শুনেছে অভিনন্দ, সেই কোন কালে ছিল এক গুপ্ত রাজা, তখন কিছুটা সুখে ছিল মানুষ। শশাঙ্ক রাজার কালেও নাকি সুখেই ছিল ওদের পূর্বপুরুষেরা। তারপর কী হলো ভগবান জানে। এই পালিয়ে বেড়ানো, শুধু পালিয়ে বেড়ানো! ঘরবাড়ি বেঁধে কোথাও একটু থিতু হয়ে থাকতে পারে না মানুষগুলো। দিগন্ত জুড়ে পতিত পড়ে আছে কত কত জমি। কোনো ফসল নেই। আবাদ নেই। যেই না দুটো ধানের চারা রুয়েছ তুমি অমনি সামন্তের পাইক এসে হাজির হবে ঘাড়ের উপর। তাও না হয় ভালো যদি ফসলের একটা অংশ নিয়ে বিদেয় হতো। বাকিটা দিয়ে একপেট-আধপেট খেয়ে টিকে থাকতে পারত ওরা। কিন্তু পারলে জমিনের খরকুটোগুলোও উপড়ে নিয়ে যায় লেঠেলরা। জঙ্গলের ফলপাকুড় গাছ থেকে ফলমূল পেকে নিচে ঝরে যায়। কেউ ছুঁয়েও দেখে না। নিজেদের ঘরবাড়ির আঙ্গিনায় একটা কলা গাছের চারা লাগিয়েছ তো অমনি এসে হাজির লেঠেলের দল। ভাগ দাও।

অভিনন্দের কাছ থেকে এসব শুনে গম্ভীর হয়ে বলে মুখিয়া–

'এক কাজ কর বুইঙ্গা ভেইয়া, তুরা সান্তাল হয়ি যা।'

এবার হাসার পালা অভিনন্দের। হো হো করে হেসে বলে–

'তু বড়ো ভালো বইলিছিস মুখিয়া। সান্তাল হতি হামগির কুনো সমিস্যি নিই। কিন্তু জাতের কী হবি নি?'

'হামগির কুনো জাতপিত নিই। হামি মুখিয়া যি, হামগির ব্যাবাকহি সি।'

'তুদের উটি হামরা জানি নে মুখিয়া।'

'তুবে শুন, বুইঙ্গা ভেইয়া, হামি মুখিয়া যি যি খায়, হামগির সুমাজের ব্যাবাকে সি সি খায়। হামার মিয়েমনুষ লি হামি যি করে আইত্যে, ব্যাবাক জুয়ান মরদ সি সি করে। বছর গিলে হামার মিয়েমনুষ একটে ছাওল বিয়োয়, ওগিলের মিয়েমনুষগুলিনও একটেই বিয়োয়। হামরা বুড়া হতি হতি যি কটি বিয়োয় সি থিকে বাঁচিমরি একদুইটি থিকি যায়। হিরা আবার সি সি করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার হাসে মুখিয়া। অভিনন্দের মুখে হাসি ফোটে না। গভীর বিষাদে ছেয়ে আছে ওর অন্তর। এভাবে তো জীবন চলে না। সূর্য মাথার উপর উঠে এলে নদীতীরের ছায়াটা মিলিয়ে যায়। রোদের তাপে তখনো তপ্ত হয়ে উঠেনি জায়গাটা। নদী থেকে ভেসে আসা বাতাস শীতল করে রেখেছে। আবার বলে মুখিয়া–

'জঙ্গুল কাটিস নি রে তুরা, বুইঙ্গা ভেইয়া। মানু বাঁইচে রাখে হেই জঙ্গুল।'

অভিনন্দ বুঝতে পারে না যে কীভাবে বোঝাবে মুখিয়াকে যে ওরা নদীমাতৃক মানুষ। জঙ্গলে বাস করে না। ওদেরকে বাঁচিয়ে রাখে নদী, জঙ্গল নয়। গ্রীষ্মে, খরা মওসুমে যখন নদীনালা শুকিয়ে ওঠে, ওরাও বিপদে পড়ে। আবার বর্ষার পর, শীতে আসে ওদের ফসলের সমারোহ। বসন্ত ঋতুতে সুখের শেষ থাকে না ওদের। প্রকৃতি তেমন কোনো সমস্যা নয় ওদের জন্য। হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতির স্নেহছায়ায়, আবার কখনো রুদ্ররোষের বিপক্ষে ওরা টিকিয়ে রেখেছে ওদের জীবনধারা। শত্রু হচ্ছে ওদের মানুষ। এই রাজারা, রাজার লাঠিয়ালেরা।

অভিনন্দের এসব শুনে মুখিয়া বলে–

'হামগিরে কুনো আজা নেই। লাইঠ্যেল নেই। হামরা সব্‌বে আজা।'

হাসি ছাড়া যেন কোনো কথা নেই ওর। আবার ফেটে পড়ে হাসিতে।

দাদুর মুখে অনেক গল্প শুনেছে অভিনন্দ। এখন ভাবে ওগুলো। সেই এক কাল আমাদেরও ছিল। ছিল না কোনো রাজা। ছিল না কোনো প্রজা। প্রকৃতির অশেষ দান দু'হাত পেতে নিত ওরা। উপভোগ করত সবাই খুশি মনে। ভাগাভাগি করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এত অফুরন্ত ছিল সেসব। কোন কুক্ষণে যে মানুষ নিজের ভেতর আবিষ্কার করেছিল এক অসীম ক্ষমতা! ঐ ক্ষমতা প্রদর্শন করতে যেয়ে হাতাহাতি, মারামারি নিজেদের ভেতর। তারপর ভাগাভাগি। তারপর সবকিছু নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখার দুর্বার তৃষ্ণা। মানুষে মানুষে বিভাজন। শক্তিমানেরা নিজেদের পূজ্য করে তোলে। আর দুর্বলদের করে ফেলে পূজারী। এই চক্রে ডুবে আছে দূরে ও কাছের সকল মানুষ। হায় শক্তিমান ভগবান, কে আবিষ্কার করেছিল তোমাকে! কঠিন এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অভিনন্দের বুক চিরে। ওদের চেয়ে তো এই ভগবান-বিবর্জিত সান্তালেরাও অনেক ভালো। এত ভগবান থেকেও আমাদের কোনো রক্ষাকর্তা নেই। অথচ সান্তালরা নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে কোনো ভগবান ছাড়াই! অভাবনীয় এক অন্তর্জ্বালার ভেতর তলিয়ে যায় অভিনন্দের সকল ভাবনা।

তিন ভাইয়ে মিলে পরামর্শ করতে বসে একদিন। এভাবে তো চলে না। সামন্তের অত্যাচার এমন চরমে পৌঁছেছে যে কোনো গাঁয়েই টিকে থাকা সম্ভব

না। বড়দাদার তিন মেয়ের দুটোই সেয়ানা হয়ে উঠেছে। ওদের নিরাপত্তা দেয়া এখন অনেক বড়ো ভাবনা। যে কোনোদিন উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে সামন্তের পাইকেরা। খেতের ফসল, বাগানের ফলমূল, বাথানের গরুমোষ না হয় দিয়ে দেয়া যায় দাঁতে দাঁত চেপে। কিন্তু ঘরের মেয়েদের তো জীবন থাকতে দিয়ে দেয়া যায় না। এ ধরনের অত্যাচার যে নতুনভাবে শুরু হয়েছে, তাও না। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এসব দেখে আসছে অভিনন্দরা। কেউ কেউ অসহায়ভাবে মেনে নিয়েছে। আবার অনেকে আত্মাহুতি দিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেয়। বিদ্রোহ করেও প্রাণ হারায় দু'একজন।

এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে যেয়েও রক্ষা নেই। সব সামন্ত একই চরিত্রের। অত্যাচারী, লম্পট, পরস্ব-অপহরণকারী। এদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কেউ নেই এ পৃথিবীতে। শুধু যে নিজেদের সীমানার ভেতর প্রজাপীড়ন করছে এরা, তাই না। প্রতিবেশী সামন্তদের সঙ্গে সারাক্ষণ যুদ্ধে মেতে রয়েছে। ছোটো ছোটো এসব স্বঘোষিত রাজাদের যুদ্ধের মাশুল দিতে হয় নিরীহ জনসাধারণের। উলুখাগড়ার মতো এরাই মিশে যায় মাটির সঙ্গে। ক্ষত্রিয়েরা সরাসরি ভোগ করে যুদ্ধের ফসল। বামুনেরা তন্ত্র-মন্ত্র বাণিজ্য করে যা পারে হাতিয়ে নেয় ওদের কাছ থেকে। ঐ সব রাজারাজরা ও ওদের স্যাঙাতদের চাহিদা ও সরবরাহটা ঠিক রেখে বৈশ্যেরা নিজেদের জীবন-নির্বাহ চালিয়ে নেয় ভালোভাবে। নিগ্রহের শিকার শুধু এই খেটে-খাওয়া আমজনতা। হালুয়া, জালুয়া, তাঁতি, কর্মকার, ধাঙর, চামার প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষেরা। পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হওয়ার অধিকারও নেই। উপরের দিকে থাকা শ্রেণি তিনটার পায়ের নিচে পিষ্ট হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই ওদের।

জন্মসূত্রে পাওয়া এই পেশা চালিয়ে নিতে কোনো অনিচ্ছা নেই ওদের। কিন্তু এই মানুষগুলোর জীবনের স্বাভাবিক নিরাপত্তাটুকু তো দিতে হবে! কেউ ভাবে না এ নিয়ে। সমাজের কেউ কাউকে মানে না। এমনকি ছোটো একটা গ্রামের লাঠিয়াল সর্দারও কখনো কখনো সামন্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। নিজেকে নতুন সামন্ত ঘোষণা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় বুক চিতিয়ে। আবার কোনো সামন্তের ক্ষমতা একটু বেড়ে গেলে নিজেকে রাজা ঘোষণা দিয়ে বসে থাকে।

শশাঙ্ক রাজার মৃত্যুর পর থেকে এরকম অরাজকতা চলে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, রাঢ় বঙ্গ সমতট এসব অঞ্চলে কোনো রাজা নেই, কোনো শাসন নেই, শৃঙ্খলা নেই। যার বাহুতে সামান্য শক্তি আছে সেই রাজা। কিন্তু প্রজারা তো আজীবন-আমৃত্যু প্রজাই থেকে যায়। বিবিধ নিষ্পেষণের মধ্যে থেকে দিশে হারিয়ে ফেলে ওরা। দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার পর ওদেরই এগিয়ে আসতে হয় এক সময়। সামন্তরাজাদের কাছে দাবি জানায় ওরা। তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী সে একটা বড়ো রাজ্য গড়ে তোলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যেরা তার অধীনে থেকে যার যার রাজ্য শাসন কর। রাজ্যের জনগণকে নিরাপত্তা দাও প্রত্যেকে। নিজেদের সামন্তরাজাদের অত্যাচারেই যেখানে বাঁচি না সেখানে অন্য সামন্তের আগ্রাসনের মুখে কীভাবে টিকে থাকি আমরা! জনগণের এই দাবির ঢেউ গঙ্গা যমুনা ব্রহ্মপুত্র নদীগুলোর উভয় তীরের জনপদগুলোয় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষজন লোকালয় ছেড়ে বনে-জঙ্গলে পালাতে শুরু করে। হালুয়া যদি ফসল না ফলায়, জালুয়া যদি মাছ না ধরে, গোপালকেরা যদি দুধের যোগান না দেয় তাহলে অভিজাত শ্রেণি ও ওদের টিকিয়ে রাখা লেঠেলদের তো প্রমাদ গোনতেই হয়। নড়েচড়ে বসে সামন্তরাজারা। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় শতাধিক বছর ধরে এমনটাই চলে এসেছে। জনসাধারণ এভাবে বেঁকে বসতে পারে এটা কারো ধারণায়ই ছিল না। যোগাযোগ শুরু করতে হয় সামন্তদের মধ্যে। ঝগড়াবিবাদ সরিয়ে রেখে এখন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্ন। প্রজা না থাকলে রাজার অস্তিত্ব কোথায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে রাজা কে হবে? চুনোপুঁটি এক রাজাও নিজেকে মহারাজ ভাবে। অন্যকে মেনে নিতে কেউ রাজি না। এভাবে কেটে যায় বছরের পর বছর। প্রজাদের মতো রাজাদেরও যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন গোপালদেব নামে এক শক্তিশালী মহাসামন্তের অধীনে নিজেদের ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। সবারই মনে মনে বাসনা যে রাজ্যের প্রজারা ফিরে আসুক, আবার প্রাচুর্য আসুক, তখন গোপালকে সরানো আর এমন কী?

কিন্তু গোপালদেব ছিলেন ক্ষত্রিয়কুলজাত, অসমসাহসী বীর যোদ্ধা। তাঁর সামন্তরাজ্যটি ছিল অন্যদের তুলনায় অনেক বড়। প্রজারা ছিল তুলনামূলকভাবে সুখী। প্রজাবৎসল সামন্ত হিসেবে ছিল তাঁর সুখ্যাতি। ফলে অন্য রাজাদের অন্তরগত বাসনাটি ফলবতী হতে পারেনি। রাজা নির্বাচিত হওয়ার পর কঠিন হাতে অত্যাচারী রাজাদের দমন করেন তিনি। রাঢ়-বাংলায় শান্তি অনেকটা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। বাংলার ইতিহাসে গণতান্ত্রিকভাবে সর্বপ্রথম রাজা বলে মেনে নেয়া হয় তাঁকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

প্রতি মুহূর্তে রং বদলায় যে আকাশ কেবল ওটাই রয়ে গেছে প্রায় একই রকম। শৈশব ও কৈশোরের খুব বেশি স্মৃতি এখন আর মনে নেই অভিনন্দের। ভেবে অবাক হয় এখন জীবনের কী এক সময় ছিল ওটা! শুধু পালিয়ে বেড়ানো। এখান থেকে ওখানে। আবার অন্য কোনোখানে। কোনো রাজা নেই। রাজ্য নেই। সীমান্ত নেই। নদীর ভাঙনের মতো ভেঙে পড়ছিল লোকালয়গুলো। কেবল ভেঙে পড়ছিল। গড়ে উঠতে পারছিল না কোথাও। তারপর রাজা গোপালদেব এসে উদ্ধার করে তলিয়ে যেতে থাকা মানুষগুলোকে। তারপর ঐ অবস্থাটাকে আরও সুদৃঢ় করে পরবর্তী রাজা, গোপালদেবের উত্তরাধিকারী, সুযোগ্য পুত্র ধর্মপাল। তাঁকে সর্বোতভাবে সাহায্য করে তাঁর অনুজ বাকপাল। বঙ্গ, সমতট, উৎকল প্রভৃতি রাজ্য জয় করে, আগ্রাসী প্রাগজ্যোতিষরাজকে হটিয়ে প্রজাদের শান্তির ছত্রছায়ায় নিয়ে আসেন তিনি। অগ্রজ ধর্মপালের জন্য বাকপালের অবদান মনে রেখেছিল বাংলার মানুষ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র জয়পাল মহারাজ দেবপালের মহাসেনাপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল মগধ বাংলা ও সমতটের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েছিলেন।

এখন এই টঙ্গন নদীটার তীরে বসে ঘোরলাগা অতীতের ঐ সব ইতিহাস শোনায় অভিনন্দ ওর দৌহিত্র ধীমানের কাছে। এই ছেলেটির স্বভাব অনেকটা অভিনন্দের মতো। এ জগতের সব কিছুতেই যেন ওর আগ্রহ অশেষ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকিছু জানা চাই ওর ঠাকুর্দার কাছ থেকে। অভিনন্দেরও ক্লান্তি নেই ওর জিজ্ঞাসা সব মেটাতে। এই জানিবার ইচ্ছা– জিজ্ঞাসাটা যার ভেতর নেই তাকে কখনো পূর্ণ মানুষ মনে করে না অভিনন্দ। চুল-দাড়ি পাকিয়ে এখনও নিজের এই জিজ্ঞাসাটা ফুরোয়নি অভিনন্দের। মানুষের ভেতর এই জিজ্ঞাসাটা আছে বলেই হয়তো বংশপরম্পরা রেখে যেতে পারে ওদের অভিজ্ঞতাগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীমান একদিন জিজ্ঞেস করে অভিনন্দকে–

'নদীর ওপারে তোমাদের ঐ কাশবনটায় নিয়ে যাবে ঠাকুর্দা?'

'কোনটায় রে?'

'ঐ যে, যেটায় পালিয়েছিলে তোমরা।'

ফ্যাসফেসে গলায় হেসে ওঠে অভিনন্দ।

'ওটা কী এখন আর আছে রে ধীমান?'

'কোথায় গেছে?'

'এত বছরে এই নদী কতবার তীর ভেঙেছে আর গড়েছে তার কী হিসাব আছে দাদু?'

'না ঠাকুর্দা, ওটা আছে। ঐ যে নদীর ওপারে, দেখা যায়।'

হাত দিয়ে কপাল ছেয়ে চোখ পিটপিট করে নদীর ওপারে তাকায় অভিনন্দ। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে ওর। দূরের জিনিস খুব স্পষ্ট দেখতে পায় না। নদীর ওপারে সত্যি একটা কাশবন দেখা যায়। ধীমানকে নিবৃত্ত করতে চেয়ে বলে–

'ওটা কাশবন না রে, আকাশের মেঘ। দেখছিস না কেমন ধবধবে সাদা?'

নদীর ওপারে আবার তাকায় ধীমান। স্পষ্ট দেখতে পায় সে কাশবনটা। উপরের আকাশ যদিও ছেয়ে আছে কাশফুলের মতো সাদা মেঘে। কিন্তু মেঘ ও কাশবনের মধ্যে নীল এক ফালি আকাশ দুটোর ভেতর একটা পার্থক্য তৈরি করেছে। যেটা হয়তো অভিনন্দ দেখেও দেখেনি। ধীমান বলে–

'মেঘের নিচে দেখ আকাশ রয়েছে ঠাকুর্দা। তারপর কাশবন।'

'দূর বোকা, মেঘের নিচে আকাশ থাকে না কখনো। মেঘ ভেসে থাকে আকাশের উপর।'

অভিনন্দের সঙ্গে কথায় পেরে উঠবে কেমন করে ধীমান। বাকযুদ্ধে রণে ভঙ্গ দিয়ে বলে–

'না ঠাকুর্দা, নিয়ে যাবে।'

অভিনন্দ বুঝতে পারে যে এ বালকটির হাত থেকে ছাড়া পাওয়া সহজ হবে না। বলে–

'ঠিক আছে দাদু, নিয়ে যাব।'

'এখন চল।'

'এখন?'

'হ্যাঁ, এখন।'

'নদী পেরোবি কী করে?'

'সাঁতরে।'

'সাঁতার জানিস?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি শিখিয়ে দেবে।'

'বাহ্, আমি সাঁতার শিখিয়ে দেব আর তুমি নদী পেরিয়ে ওপারে যাবে। খুব বুদ্ধিমানের মতো কথাই বটে!'

চুপ করে থাকে দু'জনে। শরতে বাংলার আকাশ এত সুন্দর! ঘোলা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে অভিনন্দ। খয়েরি ও সাদা রঙ মেশানো শত শত চিল চক্কর দিয়ে উড়ে চলেছে আকাশের অনেক উঁচুতে। নিচে থেকে কালো দেখায় ওদের। নীলের মধ্যে অবিরাম কালো বৃত্ত এঁকে মুহুর্মুহু বদলে দেয় আকাশের ঐ ছবিটা। মাঝে মাঝে দু'একটা চিল সাঁই করে নিচে নেমে এসে নদীতে ঝাঁপ দেয়। পানির উপরিতলে ভেসে থাকা কোনো একটা মাছ নখে বিঁধে আবার উড়াল দেয় আকাশে। কখনো কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী আরেকটা চিল চিহিহি চিৎকার করে পিছু ধাওয়া করে। কালো কুচকুচে ফিঙে ঝাঁকও আকাশে উড়ে বেড়ায় ওদের সঙ্গে। চিলগুলোর কোনো আগ্রহ নেই ওদের প্রতি। কোনো কোনো ফিঙে এমনভাবে এক-দু'টা চিলের পেছনে ছুটে চলে যে দেখে মনে হয় ওদের ধাওয়া করে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা! আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে যায় অভিনন্দের।

টঙ্গন নদীর তীর ধরে যত দূর চোখ যায় আখ চাষ করেছে কৃষকেরা। হাঁটু-সমান উঁচু হয়ে উঠেছে গাছগুলো। সবুজ একটা সমুদ্র মনে হয় নদীর তীর জুড়ে। এপারে আর কোনো গরুমোষ নেই এখন। বর্ষার জল কমার সঙ্গে সঙ্গে নদীর অগভীর অংশ দিয়ে সাঁতরে গরুমোষ সব ওপারে চড়াতে নিয়ে গেছে রাখালের দল। এই ক'মাস ওরাও থেকে যাবে ওপারে। বাঁশ ও শণ দিয়ে অস্থায়ী ঘর বেঁধে নিয়েছে। এপার থেকে পরিবারের অন্য সদস্যরা খাবার নিয়ে যায় প্রতিদিন। মাঝে মাঝে ওরাও আসে। পালাবদল করে কিছুদিন পরপর। শীতের শুরুতে পোক্ত হয়ে যাবে আখগুলো। খেতের ধারে বসে যাবে শত শত আখমাড়াইয়ের কল ও গুড় বানানোর জ্বালাঘর। মাটির হাড়িতে জমানো গুড় বণিকদের মাধ্যমে চলে যাবে দূরদূরান্তের অনেক দেশে। বণিকের সিন্দুকে জমবে সোনার মোহর। কৃষকেরাও খেয়ে-পড়ে সুখে কাটাবে কিছুকাল।

যৌবনের শুরুর দিনগুলো মনে করে এখনও শিউরে ওঠে অভিনন্দ। শুধু যে সাধারণ মানুষেরাই অসুখী ছিল, তাই না। রাজা বা প্রজা, সুখের কোনো বালাই ছিল না কারো মনে। রাজ্যের প্রজারা সুখী না থাকলে রাজারা সুখী হয় কীভাবে! অরাজকতার ঐ সময়টায় যার যখন খুশি সামর্থ্য অনুসারে নিজেকে রাজা বানিয়ে নিত। এমনকি একজন বিত্তশালী বণিকও কিছু সৈন্য নিয়োগ দিয়ে নিজেকে রাজা ঘোষণা করে দিত। ওর চেয়ে শক্তিশালী কেউ আবার হয়তো পরদিন ওর মাথা কেটে ধুলোয় লুটিয়ে নিজেকে রাজা ঘোষণা করত। এভাবে আজ যে রাজা, রাত পোহালে সে যে কী, বা কোথায়, প্রজারা বুঝতেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারত না অনেক সময়। নতুন রাজা হয়তো তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে নরকের প্রহরী হিসেবে। নয়তো পালিয়ে বেঁচেছে সে। এই সব ভূস্বামী, সামন্ত বা রাজাদের অত্যাচারে জনগণের সংখ্যা কমে যেতে থাকে। আর বাড়তে থাকে নরকের প্রহরী-সংখ্যা।

খুব সকালে একদিন ঘুম থেকে উঠে নদী পেরোনোর জন্য ধীমানকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোয় অভিনন্দ। পথে খাওয়ার জন্য সঙ্গে বেঁধে নেয় কিছু শুকনো খাবার। কখন ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। যৌবনকালে রাতারাতি আসা-যাওয়া করতে পারত ওখান থেকে। কিন্তু এখন পা দুটো দুর্বল। নদী পেরোনোর জন্য অনেকটা এগিয়ে ঘাট-পারাপারের নৌকো ধরতে হয়।

নদীটা পেরিয়ে অভিনন্দের মনে হয় এক অচেনা জায়গায় উঠে এসেছে। অনেকদিন আসেনি সে এদিকে। ভূদৃশ্য পাল্টে গেছে। আপন মনে এসব করে চলেছে প্রকৃতি। এখনও এদিকে বসতি গড়ে তোলেনি মানুষজন। নদী এত বেশি ভাঙে এদিকে যে বসতি গড়ে তোলা যায় না। চাষাবাদের জন্য যথেষ্ট নাবাল জমি পাওয়া যায় না। প্রান্তর জুড়ে শুধু গরুমোষের বাথান। রাজ্যের ধুলো বাতাসে।

নদীর তীর ধরে একটু এগোনোর পর মনে হয় এদিকেই ছিল সান্তালদের গ্রাম। মুখিয়ার কথা খুব মনে পড়ে। কী দারুণ এক মানুষই না ছিল সে। ঐ চরম দুর্দিনে নিজ গোত্রের কারো কাছ থেকে কোনো সাহায্য পায়নি অভিনন্দরা। সাহায্য করার মতো অবস্থা অবশ্য ছিল না কারো। নিজেদের রক্ষা করার মতো সামর্থ্যই ছিল না ওদের। অভিনন্দই বা কাকে সাহায্য করতে পারত। দুর্দশাগ্রস্ত ঐ সময়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সান্তালেরা। হাসতে হাসতে বলা মুখিয়ার কত কথাই না মনে পড়ে এখন। ওদের জঙ্গলটা নিয়ে সব সময় বলত যে ওরা প্রকৃতির সন্তান। ওদের সৃষ্টি করেছে এই প্রকৃতি। কোনো ভগবান-টগবান নেই ওদের। বনজঙ্গলের গাছপালার মতোই এখানে জন্মেছে ওরা। এই জঙ্গলই বাঁচিয়ে রাখে ওদের। তাই ওরাও রক্ষা করে এই জঙ্গল। কখনো ক্ষতি করে না এর। ওর ভাষায় বুইঙ্গারা, মানে সমতলের মানুষেরা বন কেটে যখন আবাদি জমি বের করে তখন খুব কষ্ট হয় ওদের। কিন্তু বাধা দিতে পারে না। ওদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে যে এসব নিয়ে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে প্রতিবেশীদের সঙ্গে। সংখ্যাল্পতার কারণে শেষ পর্যন্ত হেরে যায় ওরা। বুইঙ্গারা পঙ্গপালের মতো। যেদিকে যায় ছেয়ে ফেলে সেদিকটা। মুখিয়া বলত ওদের বনটা হচ্ছে ধনুকের মতো। কখনো বাড়ে আবার কখনো কমে। বুইঙ্গারা যখন চেপে ধরে তখন ছিলায় টান দিয়ে বনের বৃত্তটাকে ছোটো করে আনে ওরা। আবার বুইঙ্গারা উৎখাত হয়ে গেলে টান ছেড়ে দেয়। বনের বৃত্তটা বড় হয়ে ওঠে তখন। বুইঙ্গাদের সঙ্গে আর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিবাদ করতে হয় না এখন। নিজেরাই মারামারি কাটাকাটি করে একদল অন্যদলকে উৎখাত করে। জঙ্গলে বাস করা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনজাতিগুলোর নিজেদের ভেতর ওরকম খেয়োখেয়ি নেই।

নদীর তীর ছেড়ে কিছুটা পিছিয়ে আসে ওরা আবার। ডান দিকে একটা বন দেখা যায়। অভিনন্দ বুঝতে পারে না যে এখন ছোটো না বড় বৃত্ত হয়ে আছে ওটা। ছোটো বৃত্ত হয়ে থাকলে আশপাশে সমতল মানুষের কোনো না কোনো বসতি থাকার কথা। কিন্তু ওরকম কিছু চোখে পড়ে না। হেঁটে এগিয়ে যায় বনের দিকে। বনের ভেতরটা কালো ও অন্ধকার। গাছগুলোর গায়ে ছ্যাতলা পড়ে আছে। মাটিতে কোনো মানুষের পায়ের চিহ্ন বা চলাচলের ছাপ দেখা যায় না। বনের ভেতর কিছুটা ঢুকে গা ছমছম করে। তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরে আসে অভিনন্দ। এ বনের ধারে কাছে কোনো জনমানুষের বসতি থাকতে পারে না। মুখিয়ারা হয়তো বনের আরও গভীরে চলে গেছে অথবা অন্য দিকটায়। অথবা ঐ বনই নয় এটা। এমন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। জঙ্গল ছেড়ে যেতে চায় না ওরা। বংশপরম্পরা একই জায়গায় থেকে যায়। সমতলের মানুষদের যেমন নদী বা প্রকৃতি কখনো কখনো এদিক থেকে ঠেলে ওদিকে সরিয়ে দেয়, ওদের ক্ষেত্রে তা ঘটে না সাধারণত। শুধু যে প্রকৃতি, তাই না, শক্তিধর মানুষেরাও তাড়িয়ে বেড়ায় ওদের। এক ভূস্বামীর অত্যাচার থেকে বাঁচতে অন্য ভূস্বামীর অধীনে প্রায়শ ন্যস্ত করতে হয় নিজেদের।

বনের ধার থেকে সরে এসে আবার নদীতীরের পথ ধরে হাঁটে ওরা ঐ কাশবনের আনুমানিক অবস্থানটা খুঁজে পাওয়ার জন্য। ওটা খুঁজে না পেলে ওদের পুরোনো আবাসের পথটাও ভুল হয়ে যেতে পারে।

নদী ভেঙেচুরে তীরের দৃশ্য এত পাল্টে ফেলেছে যে পুরোনো কোনো জায়গা দেখলে মনে হয় ওটাই হয়তো। শেষ পর্যন্ত সামনের একটা কাশবন দেখিয়ে বলে ধীমানকে–

'এই যে এটা ধীমান, এখানে আমরা লুকিয়ে ছিলাম এক পক্ষকাল।'

কাশফুলগুলো দু'হাতে নেড়েচেড়ে বলে ধীমান–

'তোমাদের ঘরবাড়ি কই?'

হাসে অভিনন্দ।

'ঘরবাড়ি দেখতে হলে তো আরও ক্রোশখানেক হাঁটতে হবে। এক প্রহরের পথ। হাঁটবি?'

'হ্যাঁ ঠাকুর্দা।'

'তাড়াতাড়ি চল তাহলে।'

অভিনন্দ বুঝতে পারে যে ঐ গ্রামটা খুঁজে বের করতে হবে ওকে আজ। অনুমানের উপর নির্ভর করে ধূ ধূ প্রান্তর পেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাঁটতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুপুরের আগে পৌঁছে যায় ওখানে। গ্রামের সীমানায় ঢুকে আবেগে কেঁপে ওঠে ওর অন্তর।

এত বছর পর প্রায় সবই যে আগের মতো! একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ভাবে অভিনন্দ। গৃহস্থালি গাছের এলোমেলো অবস্থান, বাড়ির সীমানা ঘিরে জবাফুল গাছের সারি, প্রবেশমুখে একদু'টা কামিনী, হাস্নাহেনা, গন্ধরাজের পাগলকরা সুগন্ধ, কুল, কামরাঙ্গা, করমচা গাছের সবুজ বিস্তার, ছনে ছাওয়া ছোটো ছোটো কুটিরের এক একটা থোকা, নিকোনো আঙ্গিনা, মাথার উপর ফিরোজা রঙের আকাশে গৃহবাসী পোষাপাখিদের ওড়াউড়ি, মাচার উপর সবুজ লাউকুমড়ো পাতার ফাঁকে সাদা ও হলুদ ফুলের হাসি, মেয়েদের শরীর পেঁচিয়ে থাকা শাড়ির মতো ঘরের পাশ জড়িয়ে ফুটে থাকা মাধবীলতা, সবই তো দেখি একই রকম!

একটু পরে মনে হয়, না, মানুষগুলো ভিন্ন, গাছগুলোর উচ্চতা বেড়েছে, আরও পুরোনো হয়েছে বসতিটা। বাড়ি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় না অভিনন্দের। পুরোনো ঐসব ঘরগুলোই রয়ে গেছে। কী করে সম্ভব এটা! এমন হতে পারে যে ঘরগুলো তুলে নিয়েছে আবার? ভিটে সরায়নি নতুন মানুষেরা। পুরোনো গাছ প্রায় সবগুলো আছে। অনেক ক'টা আবার ওর হাতে লাগানো। অভিনন্দের চোখে কখন জল জমেছে বুঝতে পারেনি। ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'কাঁদছ কেন ঠাকুর্দা?'

চোখ মুছে বলে অভিনন্দ–

'কাঁদছি নারে দাদু, বুড়ো মানুষের চোখে এমনিতেই জল আসে।'

জীবনের কত স্মৃতি! জীবন মানেই তো স্মৃতি। মুহূর্তেই অতীত হয়ে যায় বর্তমান। এখন, এই সকরুণ মুহূর্তটাও আগামী কোনোদিন হয়তো স্মৃতি হয়ে দেখা দেবে আবার। তখন হয়তো চোখে জল থাকবে না।

ওদের সাড়া পেয়ে এক কোনার একটা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এক কিশোরী। লম্বাটে মুখ, গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম। অকস্মাৎ চমকে উঠে অভিনন্দের চোখ দুটো। ঠিক যেন কিশোরী সুধাময়ী। ওর সেই ছোটো দিদি। কলেরায় গত হয়েছিল। তাও তো এক কুড়ি বছর পেরিয়েছে। মেয়েটার পরনে হালকা সবুজ রঙের পোশাক। দু'গাছি বিনুনী বাঁধা চুলের প্রান্ত দুটো ওর ছোট্ট মাথাটি ঘিরে দু'পাশে বাঁধা। এক পাশে একটা গোলাপি জবা ফুল। মুখের গড়ন, চোখের গোলাকার ধনুক ও পোশাক পরার ধরন দেখে মনে হয় হেঁদু ঘরের মেয়ে। গ্রামটা কী তাহলে এখন হিন্দুদের! কী বোঝে মেয়েটি কে জানে, দ্রুত পায়ে চলে যায় বাড়ির পেছন দিকে।

একটু পরে এক আধবুড়ো ধুতির খুঁটে হাতমুখ মুছতে মুছতে সামনে এসে দাঁড়ায়। অভিনন্দের পাকা চুল ও দাড়িগোঁফ দেখে একটু সমীহ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নমস্কার মহাশয়, কাউকে খুঁজছেন কি আপনারা?'

'নমস্কার। না, কাউকে খুঁজছি না।'

'তবে কি. ?'

অভিনন্দ বুঝতে পারে না এ প্রশ্নের অর্থ কি। ফলে কোনো জবাবও দিতে পারে না। লোকটা ইতস্তত করছে দেখে বলে–

'আমরা আগন্তুক, মহাশয়। এই ছেলেটা ঘুরেফিরে একটু দেশবিদেশ দেখার সাধ করেছে। তাই বেরিয়েছি ওকে নিয়ে।'

'ভালো তো, ভালো, ভালো। তা মহাশয়ের নিবাস?'

'নদীর ওপারে। অনেকটা দূরেই বলতে পারেন।'

'কী সব্বোনাশ, এতটা হেঁটে এসেছেন ছোট্ট এই বাচ্চাটাকে নিয়ে! অভাজনের গৃহে কী একটু বিশ্রাম নেবেন মহাশয়?'

'আমাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। তবে আমরা কিনা বৌদ্ধ, মহাশয়।'

খিক খিক করে হেসে ওঠে লোকটা। হাসিটা তাচ্ছিল্যের না আনন্দের ধরতে পারে না অভিনন্দ। বেশ মজার এক ধরন আছে হাসিটার। হঠাৎ শুরু হয়েছিল, আবার হঠাৎ থেমে গেছে। স্বাভাবিক স্বরে সে বলে–

'ভাববেন না মহাশয়, আপনাদের তো কোনো জাত নেই। আর আমরা হলাম গিয়ে কায়েত। ছুলেটুলে আমাদের জাত যায় না। বড় কঠিন জাত!'

আবার হাসতে থাকে খিকখিক করে। হাসি থামলে বলে–

'মহাশয়দের কী গাছতলে মাদুর পেতে দেব?'

'দিন মহাশয়।'

'তাই ভালো। শীতল বাতাসে শান্তি পাবেন। ক্লান্তিও ঘুঁচবে।'

গাছতলায় বসে কিছুক্ষণের জন্য অভিনন্দ হারিয়ে যায় অতীতের গর্ভে। অবর্ণনীয় ঐ অনাচারের দিনগুলোয় গড়ে উঠেছিল ওর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রথম দিনগুলো। রঙিন বলা যায় না ওগুলোকে। এখন তো বরং কিছুটা ধূসরই মনে হয় সেসব। তারপরও কৈশোর বলে কথা। মানুষজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ভয়ডর বলে তো কিছু ছিল না। সবকিছু মনে হতো একটা অভিযান। পালিয়ে বেড়ানো, অত্যাচার সয়ে যাওয়া, শত প্রতিকূলতার মধ্যে টিকে থাকা, এসবকেও মনে হত একটা অভিযানের অংশ। জীবনের কামনা-বাসনাগুলো, উত্তেজনাগুলো এত কাছ থেকে, এত ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে এখন এই ধীমান ছেলেটার জীবনের শুরুটাকে অনেক পানসে মনে হয়।

অভিনন্দের ছোটো দিদির মতো দেখতে মেয়েটা দুটো থালা সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। চিড়ে, মুড়ি, নারকেল, তিল, এসবের নাড়ু ও এক পাশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খইয়ের উপর কোঁড়ানো নারকেল। ঝকঝকে কাঁসার পাত্রে জল। খাবার দেখে মনে হয় বেশ ক্ষুধা পেয়েছে। মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে–

'কী নাম গো তোমার, দিদিমণি?'

লাজুক হেসে বলে মেয়েটি–

'সৌদামিনী।'

'বাহ্।'

একটু যেন চমকেও ওঠে অভিনন্দ। কত মিল মানুষ দুটোর মাঝে। ওর দিদির নাম ছিল সুধাময়ী।

ওদের খাওয়া শেষ হলে সুধাময়ী বা সৌদামিনী মিষ্টি হেসে উঠিয়ে নিয়ে যায় থালা ও ঘটিগুলো। ওর চলার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে অভিনন্দ। এই মুহূর্তগুলোও স্মৃতি হয়ে গেল। হা জীবন!

এতক্ষণ পর লোকটা জিজ্ঞেস করে–

'মহাশয়ের নাম যে জানা হল না?'

'ও হ্যাঁ, আমার নাম অভিনন্দ। এই ছেলেটি আমার দৌহিত্র। ওর নাম ধীমান।'

'বাহ্।'

'মহাশয়ের নাম?'

'আজ্ঞে আমার নাম পিতৃদেব রেখেছিলেন শশীভূষণ কর্মকার।'

মাথা দুলিয়ে হাসে অভিনন্দ।

'এখনও নিশ্চয় ওটাই আছে।'

'ভগবানের কৃপায়।'

'ভালো। তবে এ নিয়ে ভাববেন না মহাশয়, আমার নামও আমার পিতৃদেবই রেখেছিলেন।'

জলযোগের পর বিশ্রাম নিতে পেরে অনেকটা হালকা হয় অভিনন্দ। শশীভূষণের সঙ্গে জমে ওঠে ওদের সুখদুঃখের কথা বলা। ওর কাছ থেকে অভিনন্দ জানতে পারে যে গোপালদেব রাজা হওয়ার আগে এই গ্রামটা ছিল বৌদ্ধদের। তার অনেক আগে থেকে বৌদ্ধদের উপর কিছুটা অবিচার-অত্যাচার চলছিল। গোপালদেব রাজা হওয়ার আগেই এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায় বৌদ্ধরা। তারপর অনেক বছর পতিত ছিল। ঘরবাড়ি সব ভেঙে মিশে গেছিল মাটির সঙ্গে। জঙ্গলে ছেয়ে গেছিল সবকিছু। এরপর নতুন ভূস্বামী এসে এ গ্রামটা আবার পত্তন করে নতুনভাবে। গোপালদেবের তিরোধানের পর ধর্মপালদেব রাজা হলে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখা ও পার্শ্ববর্তী দুষ্ট রাজাদের দমন করে ঐ সব রাজ্য ধর্মপালের আজ্ঞাধীন রাখার জন্য অনেক সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই কর্মকারদের এই গ্রামটি বসানো হয় এখানে। গ্রামের উত্তরে জঙ্গলের পাশ ঘেঁষে একটা খাল আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওটার তীরে গড়ে উঠেছে লৌহ-কর্মকারদের কর্মশালা। দিনমান লোহা পেটানোর ঠুকঠাক শব্দ পাওয়া যায় ওখানে। দিনের প্রথমভাগে কাজ করতে পারে না শশীভূষণ। হাঁপানির টান আছে ওর। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক প্রহর কাজ করে। হাপরের গরম বাতাস সহ্য হয় না ওর।

খুব বেশিক্ষণ বসে থাকার সুযোগ নেই এখানে। প্রায় দুপুর হয়ে এসেছে। মনে মনে অবাক হয় অভিনন্দ। পিতৃপুরুষের এই ভিটেটা বিগত প্রায় দু'কুড়ি বছরে একবারও দেখতে আসেনি কেন! এখন এই ধীমান ছেলেটির বায়না মেটাতে এসে আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছে। মাত্র তো এক বেলার হাঁটাপথ। ইচ্ছে হলে শত শতবার আসতে পারত। তারপর মনে হয়, অথবা নিজেই মনোবিশ্লেষণ করে, জন্মভিটা হতে উৎখাত হওয়ার বেদনায় অভিমান, ক্রোধ, হতাশা, এসবের মিলিত প্রতিক্রিয়া ওকে বিরত রেখেছে এতদিন। এটা যেন অনেকটা মা হারানোর মতো। মা হারানোর পর ওকে আর মনে রাখতে চায় না কেউ কেউ। কারণ ঐ অবস্থাটা এত হৃদয়বিদারক যে অনেকের পক্ষে সয়ে যাওয়া সত্যি কঠিন। তাই চেষ্টা করে স্মরণে না আনতে। এলেও দ্রুত মুছে ফেলার চেষ্টা করে। ওর এই জন্মমাটির আকর্ষণটাকেও এভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছিল এতদিন।

শশীভূষণকে জিজ্ঞেস করে–

'গ্রামটা একবার ঘুরে দেখতে পারি শশীভূষণ কর্মকার মহাশয়?'

খিক করে হেসে উঠে আবার শশীভূষণ। বলে–

'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচিটা বের করে দেখাতে হবে না মহাশয়। শশী নামে ডাকলেই হয়। বয়সে আমার চেয়ে বড় হবেন আপনি, আজ্ঞে।'

রগড় করে অভিনন্দ–

'নামটা যে আজ্ঞে আপনার পিতৃদেব প্রদত্ত ছিল!'

'তিনি এখন স্বর্গ অবস্থানে আছেন, আজ্ঞে। ঐ সম্মানটা আপাতত না দেখালেও চলবে।'

'ঠিক আছে শশীভূষণ, গ্রামটা একটু ঘুরে দেখি?'

'এজন্য কারো অনুমতি লাগে না মহাশয়। আমিও আজ্ঞে যেতে পারতাম আপনার সঙ্গে। তবে কিনা দু'মুঠো শাকান্ন মুখে দেয়ার সময় এখন আমার।'

'ঠিক আছে শশীভূষণ, আমরা উঠি। আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।'

'আসুন মহাশয়।'

একটু থেমে বলে–

'খালের ধারে কামারশালায় যদি যান হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে আবার। একটু পরে ওখানেই যাব আমি।'

'ঠিক আছে মহাশয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীমানের হাত ধরে গ্রামের পথে উঠে আসে অভিনন্দ। এত চেনা সবকিছু! নিজের হাতের রেখাগুলোও এত চেনে না অভিনন্দ। পুরোনো পোশাক পাল্টে নতুনভাবে সেজেছে গ্রামটা। কোনো জৌলুস নেই, উৎসবের আমেজ নেই, শুধুই অন্য পোশাক। পথঘাট, ডোবা ও পুকুর, বনবাঁদার, ঘরবাড়ি, চৌহদ্দি প্রায় সবই আগের মতো। শুধু নেই ঐ মানুষগুলোর কোনো চিহ্ন, কোনো স্মৃতি। সব নতুন মানুষ, নতুন জীবন, অন্য সুর, ভিন্ন ছন্দ।

খালের ধারে এসে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করে অভিনন্দ। আরও চওড়া হয়েছে যেন খালটা। নদীর অন্য দিকে চর জেগে এদিকটায় হয়তো নাব্যতা বেড়েছে। ফলে স্রোতের চাপ বেশি। খালেও জল আসে বেশি। এভাবে প্রশস্ততা বাড়তে থাকলে তো একদিন কোনো নদীর রূপ নেবে এটা। খালের ধারে অনেক ক'টা কামারশালা। লোহা পেটানোর ঠুংঠাং শব্দ বেশ ভালোভাবেই শোনা যায়। কামারশালাগুলো ধীমানকে মনে হয় খুব আকর্ষণ করেছে। অবাক চোখে তাকিয়ে দেখে ওদের হাতুড়ি পেটানো। অভিনন্দকে জিজ্ঞেস করে যে কাছে যেয়ে দেখতে পারে কিনা। একটা কামারশালার সামনে যেয়ে দাঁড়ায় ওরা। ঐ কর্মকার ভাবে যে কোনো কিছু কিনতে এসেছে। জিজ্ঞেস করে–

'মহাশয়দের লাগবে কিছু?'

'সঙ্গে সঙ্গে বলে অভিনন্দ–

'নাহে, লাগবে না কিছু, এই ছেলেটা কাজ দেখতে চাইল।'

'তা দেখুন মশায়।'

হাপর টেনে চুলোয় বাতাস দিয়ে আবার হাতুড়ি পেটাতে শুরু করে সে। গনগনে কয়লার ভেতর থেকে লাল তপ্ত লোহার পাত পিটিয়ে একটা দা বানাচ্ছে ওরা। শক্ত লোহা পিটিয়ে কীভাবে অন্য আকার দেয় তা বোঝার চেষ্টা করে ধীমান। আগুন থেকে লোহাটা বের করে সঙ্গে সঙ্গে হাতুড়ি পেটানোয় ওটার গা থেকে ছিটকে বেরোনো আগুনের ফুলকি, পাশে রাখা পানির পাত্রে ভিজানোর সঙ্গে সঙ্গে ফুঁস করে বাষ্প ওঠা, লোহা ঘষে ঘষে ধার তোলা ও চকচকে করা, এসব দেখে সে মুগ্ধ হয়ে। এই প্রথম একটা কামারশালা দেখতে পেয়েছে সে। বিস্ময়ের শেষ নেই ওর নতুন চোখে। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত হয় শশীভূষণ। ওদের দেখে বলে–

'এখনও আছেন মহাশয়েরা। চলুন আমার ওখানে। আরেকটু দেখে যাবেন।'

ধীমানকে নিয়ে ওর কর্মশালায় যায় অভিনন্দ। ওকে দেখে তরুণ কর্মকারটি হাপর টানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। হাপরের পেছনে যেয়ে বসে শশীভূষণ। ছেলেটিকে দেখিয়ে বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার পুত্র বটে, ফণীভূষণ।'

চোখ তুলে দেখে ছেলেটা। হাপর টেনে নিজেই বোধ হয় হাঁপিয়ে উঠেছে। শরীরে ক্লান্তির ছাপ। অভিনন্দ বলে–

'তা বটে শশীভূষণ। আপনার পুত্রই বটে, ফণীভূষণ।'

ফণীভূষণ বেরিয়ে যায় কামারশালা থেকে। ওর এখন ছুটি। সন্ধ্যে পর্যন্ত হাপর টানবে শশীভূষণ। ওরা বোধ হয় একটা রামদা বানাচ্ছিল। বিশাল একটা লোহার পাতের মাথাটা পিটিয়ে বাঁকা করে তোলা হয়েছে। ওটার পাশে পড়ে ছিল ছোট্ট এক টুকরো লোহা। ওটা আগুনে দিয়ে তাতিয়ে ও পিটিয়ে সামান্য একটু সময়ের মধ্যে একটা ছুরি বানিয়ে ফেলে শশীভূষণ। ওটা দেখিয়ে বলে–

'এটা ধীমান মহাশয়ের জন্য।'

'ওহে শশীভূষণ, ওটা দিয়ে ও করবে কী? তুমি কী আমার দৌহিত্রকে ডাকাত বানাতে চাও?'

'না মহাশয়, এই ছেলে ডাকাত হবে না, এই ছেলে আপনার বংশের পিদিম হবে। ওর ললাটে তাই লিখা যে।'

'তুমি কী আবার জ্যোতিষও নাকি হে?'

'না মহাশয়, জ্যোতিষরা কিছু জানে নাকি, সব জোচ্চোর, মানুষ ঠকিয়ে খায়।'

'এভাবে বলা ঠিক না। আমরা এখন যাই শশীভূষণ। বেলাবেলি নদী পেরোতে হবে।'

ছুরিটাকে তাড়াতাড়ি ঘষে ধার উঠিয়ে চকচকে করে তোলে। শুকনো দড়ির মতো কয়েকটা কলাপাতা পেচিয়ে ওটা ধীমানের হাতে তুলে দেয়।

'এই নিন মহাশয়। দরিদ্রজনের উপহার। আম কেটে খাবেন। কাঠে নক্সা তুলবেন। নানারকম শিল্প গড়ে তুলবেন। কাঠের বাঁট লাগিয়ে দেয়ার সময় তো আপনার ঠাকুর্দা দিলেন না। তিনি লাগিয়ে দেবেন আশা করি।'

হাত পেতে ওটা নেয় ধীমান। ওর হাত থেকে নিয়ে নেয় অভিনন্দ। তারপর বলে–

'ঠিক আছে শশীভূষণ কর্মকার। বেঁচে থাকলে দেখা হবে আবার।'

'আমি না থাকলে ফণীভূষণ থাকবে, ফণীভূষণের পর অন্য কোনো ভূষণ থাকবে।'

'এত নিশ্চিত হলে কীভাবে?'

রামদা দেখিয়ে বলে–

'এটার দরকার আছে যদ্দিন।'

হেসে চলে আসে ওখান থেকে অভিনন্দ। শশীভূষণের কথা ফুরোবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার পথে পা যেন আর চলতে চায় না। জন্মমাটি আঠার মতো ধরে থাকে পায়ের পাতা। গাছপালার ছায়াশীতল নিবিড়তা, আবাসনের গন্ধ, পুকুরের জলে হাঁসের ভেসে বেড়ানো, ঘরের চালে কবুতরের নির্বিকার বসে থাকা, পাতার ফাঁক থেকে ডেকে ওঠা কোনো এক পাখির কূজন, সব কিছু যেন দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রাখে অভিনন্দকে। ধীমানকে বলে–

'পা চালা ধীমান। অনেক দূর যেতে হবে।'

অথচ হাঁটতে পারছে না নিজেই। গ্রাম পেরিয়ে আবার ধূ ধূ মাঠ। শরতের রোদে ততটা আঁচ নেই। আশপাশে কোনো ফসল খেত বা সবুজের সমারোহ নেই। নিস্ফলা মাটি। হয়তো এটাই কারণ। বর্ষার জল জমা না থাকলে ফসল ফলবে কী দিয়ে। সেঁচের সুযোগ নেই। মাঝে মাঝে শেয়াকুল ও কাঁটাঝোপ জন্মেছে। ওগুলো পাশ কাটিয়ে দ্রুত এ প্রান্তর পেরিয়ে যেতে চায় অভিনন্দ। বুঝতে পারে না কেন মুখিয়াদের ঐ জঙ্গলটা খুঁজে পাচ্ছে না। জঙ্গল তো সরে যাওয়ার কথা না। সমতলের মানুষের চাপ এদিকে না থাকায় বরং জঙ্গল বেড়ে যাওয়ার কথা।

তেপান্তরের মাঠটা পেরিয়ে আবার নদীর ধারে কাশবনে পৌছে যায় ওরা। বন অনেক ঘন মনে হয় এখানে। একটু ভয় ভয় করে অভিনন্দের। বনের কিছুটা হালকা জায়গা দেখে ওটা পেরিয়ে নদীতীরে পৌছে মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। তীর ধরে উজিয়ে যাবে, না ভাটিতে নেমে পারাপারের নৌকোটা পাবে বুঝতে পারে না। জিরিয়ে নেয়ার জন্য একটু বসে ওরা। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে আবার হাঁটতে থাকে ভাটির দিকে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর দেখে নদী অনেক চওড়া হয়ে গেছে। কিন্তু জল প্রায় নেই। মাঝখানে বেশ লম্বা একটা বাঁশের সাঁকো। অভিনন্দ বুঝতে পারে যে ভুল করে বসেছে। উজানেই বেশি থাকে নদীর জল। পারাপারের খেয়াটা নিশ্চয় উজানে। একটু ভেবে ঠিক করে নদীটা তো পেরিয়ে যাই। তীর ছেড়ে নদীর বালুচর দিয়ে হাঁটতে থাকে সাঁকোটার দিকে। রোদের তাপে কিছুটা তপ্ত বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগে। নদীর জল ছুঁয়ে আসা বাতাস শরীরে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দেয়। ধীমানকে নিয়ে সাঁকোটা পেরোতে বেশ বেগ পেতে হয়। কখনো সাঁকো পেরোয়নি সে। ভয়ে সিঁটিয়ে থাকে। পা সরাতেই চায় না। অনেকটা সময় নিয়ে সাঁকো পেরোনোর পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে অভিনন্দ। এখন নদীর তীর ধরে উজিয়ে গেলে পৌছে যাবে ওদের গ্রামের কাছে। অনেক আখখেত এদিকেও। কোমর ছাড়িয়েছে এগুলোর উচ্চতা। হয়তো কিছুদিন আগে রুয়েছিল। পানি কিছুটা আগে শুকিয়ে যায় নদীর ভাটির দিকে।

কিছুক্ষণ উজানে হাঁটার পর পেয়ে যায় ওদের হাঁটু-সমান ঐ আখখেত। শঙ্কা কেটে যায় অভিনন্দের। ধীমানকে বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এসে গেছি রে ধীমান। আরেকটু জিরিয়ে নেই চল।'

'ক্ষুধা লেগেছে ঠাকুর্দা।

'তা বুঝতে পেরেছি, দাদু।'

পথের খোরাক যা এনেছিল তা বের করে দেয়। নিজেও মুখে দেয় দুটো নাড়ু। জল এনে খায় নদী থেকে। তারপর সবুজ ঘাসের উপর গা এলিয়ে দেয়। পশ্চিমে নেমে গেছে সূর্য। অন্ধকার হয়ে আসবে একটু পরে। দু'চোখ জড়িয়ে ধরেছে ক্লান্তির ঘুম।

একটু পর একদল শেয়াল ডেকে ওঠায় তাড়াতাড়ি উঠে বসে।

'হা ভগবান, অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।'

কাঁধে থলে ঝুলিয়ে লাঠিটা হাতে তুলে নেয়। আখখেতের ধারে পড়ে থাকা গাছের একটা ডাল পেয়ে ধীমানের হাতে তুলে দেয়।

'ধর দাদু।'

'কী করব এটা দিয়ে?'

'শেয়াল তাড়াবি।'

খুব একটা মজার কাজের ভার দেয়া হয়েছে ওকে ভেবে আগ্রহ নিয়ে হাতে নেয় ডালটা। তারপর দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে অভিনন্দের পিছনে।

ঘরে পৌঁছে ওরা। চরাচরে অন্ধকার নেমেছে। অবসান হয়েছে দীর্ঘ একটা দিনের। অতীতের ইতিহাস থেকে এভাবে ছোট্ট একটা সূত্র তুলে এনে অভিনন্দ রেখে যায় ধীমানের হাতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

অভিনন্দের শৈশব ও কৈশোরের অমূল্য যে দিনগুলো ইতিহাসের নৈরাজ্যময় অন্ধকারে পুরোপুরি অর্থহীনভাবে অপচয়িত হয়েছিল তার কিছুটা স্পর্শ পেতে চায় সে দৌহিত্র ধীমানের ভেতর দিয়ে। আঁধারকালের ঐ সব নিদারুণ বঞ্চনাগুলো, প্রকৃতি-বিরুদ্ধ অনাচারগুলো এ জগতের যত মধু থেকে, আনন্দ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল ওকে সেগুলো অনুভব করতে চায় ধীমানের এই নতুন দিনগুলোর মধ্য দিয়ে। ধীমানের প্রতিটা সদর্থক ইচ্ছার প্রতি এক ধরনের তীব্র আকর্ষণ রয়েছে ওর। যথাযথ মূল্য দেয় সে ওগুলোকে। অভিনন্দের কন্যা ও জামাতাও ধীমানকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে ওর নিয়ন্ত্রণে। সেও যেন এক শিশু হয়ে উঠেছে বালক ধীমানের সঙ্গে।

ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে জন্মেছিল অভিনন্দ। শৈশব ও কৈশোর কালের অন্ধকারে হারিয়ে গেলেও যৌবন পরবর্তী দিনগুলোয় শান্তিতেই ছিল সে। ওর পূর্বপুরুষেরা পায়নি ওটা। নদীর এপারে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করেছিল ওরা। নিজেদের সংসার পেতেছিল। রাজা গোপালদেবের রাজ্যে অনেক শান্তিতে ছিল ওরা। এখন আরও দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা এসেছে বর্তমান রাজা ধর্মপালের রাজ্যে। মানুষের মুখের হাসিটুকু ফিরে এসেছে। জনজীবনের স্বাভাবিক প্রবাহটা ফিরে এসেছে।

এপারের বৌদ্ধপাড়াটার পত্তন ঘটিয়েছিল ওরা তিন ভাই। ওদের সংসার বেড়েছে। গ্রামের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এখন ওদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী। আরও বেশ ক'টা বৌদ্ধ পরিবার এসেছিল ওদের সমসময়ে। সবাই মিলে এখন একটা সমৃদ্ধ গ্রামের রূপ নিয়েছে লোকালয়টি। গ্রামের একদিকে ছোটো নদী। তিন দিকে বিস্তীর্ণ ফসলখেত। ভূস্বামীদের কাছ থেকে পত্তনী নিয়ে চাষবাস করে ওরা। প্রচুর ফসল ফলে। বিক্রি করে প্রয়োজন-অতিরিক্ত অর্থ জমা হয় ওদের সঞ্চয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা শশাঙ্কের যোগ্য উত্তরসূরি না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পর তাম্রলিপ্তি, রাঢ়, বাংলা, সমতট প্রভৃতি অঞ্চলে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর উপর্যুপরি আক্রমণে যে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছিল, ওটার প্রায় পুরোপুরি অবসান ঘটিয়েছিলেন রাজা গোপালদেব। এখন তাঁর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, পুত্র ধর্মপাল মহাবিক্রমে রাজ্যের সম্প্রসারণ করে চলেছেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যলোলুপ রাজাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছেন। রাজ্যের অসংখ্য যুবক রাজার সৈন্যদলে যোগ দিয়ে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন ও রাজশক্তির সুনাম বয়ে আনতে সক্ষম হচ্ছে। অভিনন্দের জামাতা মধুমথন কাজ করে রাজা ধর্মপালের সৈন্যদলে। সাহস ও কৃতকার্যতা গুণে সে সেনাপতিদের সুনজরে রয়েছে। মধুমথনের সূত্র ধরে অভিনন্দের পুরো পরিবার হালুড়ে শ্রেণি থেকে অভিজাত শ্রেণির দিকে এগিয়ে চলেছে। অর্থকড়ি সঞ্চিত হয়ে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকায় বিভিন্ন সেবামূলক কাজে অংশ নিতে পারে। বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে দান-দক্ষিণা করতেও সমর্থ হয়।

মধুমথনের সাত বছর বয়সের এই ছেলে, ধীমানের মেধা মাঝে মাঝে অভিভূত করে অভিনন্দকে। ওর কল্পনাশক্তি মোহিত করে। একদিন অভিনন্দকে জিজ্ঞেস করে সে যে পাঠশালায় যেতে পারে কিনা? অবাক হয় অভিনন্দ। ও ভেবেছিল এক সৈনিকের পুত্র আরেকজন সৈনিকই হবে। হয়তো আরও উঁচুদরের। খুব বেশি সাফল্য পেলে ছোটোখাটো সামন্ত হবে। কিন্তু বিদ্যার্জনের মোহ ওর ভেতরে সৃষ্টি হবে এটা ভাবতে পারেনি অভিনন্দ। বুঝে উঠতে না পেরে জিজ্ঞেস করে–

'কী পাঠ নেবে তুমি, ধীমান মহাশয়?'

'দিব্যদার মতো অনেক কিছু জানতে চাই।'

'তোমার দিব্যদা কী অনেক জানে?'

'হ্যাঁ ঠাকুর্দা, আমিও ওসব জানতে চাই।'

'সবই জানতে চাও, বাহ্। কিন্তু দাদু, আমাদের গ্রামে যে কোনো বিহার নেই। কোথায় শিক্ষা নেবে?'

'দিব্যদা নবগ্রামে যেয়ে টোলে পাঠ নেয়।'

'ওটা ব্রাহ্মণদের টোল, আমরা যে বৌদ্ধ দাদু।'

'আমরা ব্রাহ্মণ হই না কেন ঠাকুর্দা?'

'ব্রাহ্মণ কেউ হতে পারে না ধীমান। ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মাতে হয়।'

'কেন?'

'সবাই বাবামায়ের ঘরে যার যার মতো জন্মায়। শূদ্র বা ক্ষত্রিয়রাও ওদের নিজেদের গোত্রে জন্মায়। ওদের অনেক জাতভেদ আছে, ধীমান। এখন বুঝবে না তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমাদের জাত নেই ঠাকুর্দা?'

'না, নেই ধীমান।'

দুর্ভাবনায় পড়ে সে। অভিনন্দকেও স্পর্শ করে ওটা। এই বালকটার পাঠতৃষ্ণা বা এই জীবনজিজ্ঞাসাটা কীভাবে মেটানো যায়। হাঁটতে হাঁটতে নদীর তীরে এসে দাঁড়ায় দু'জনে। প্রকৃতির মাঝে বড় এক শিক্ষক এই নদী। সম্ভবত সবচেয়ে বড় শিক্ষক। দৃশ্যমান ভৌত পদার্থের মধ্যে জলই সব চেয়ে বেশি গতিশীল এবং অবস্থা বিশেষে পরিবর্তনশীল। পৃথিবীর প্রতি স্তরে বিরাজ করতে পারে জল। নদী ও সমুদ্র, স্থল ও আকাশ, সবখানেই এর বিচরণ। নদীর মূল সত্তা হচ্ছে এই জল। এর প্রবহমানতা জীবনের বৈশিষ্ট্য। মানুষই নয় শুধু, প্রাণীজগতের সবটাই গড়ে উঠেছে এই নদীকে ভিত্তি করে। মানুষকে ফসল ফলানোর প্রয়োজনীয় জলই শুধু দেয় না, সীমানা সৃষ্টি করে রক্ষাও করে। মনে পড়ে অনেকদিন আগে কীভাবে ওদের টঙ্গন নদীটা পেরিয়েছিল ওরা। নদীর এপার ছিল তখন সুনসান, পরিত্যক্ত এক জলাভূমি। মাঝে মাঝে কিছু উঁচু জায়গায় ছোটো ছোটো ঝোপজঙ্গল গড়ে উঠেছিল। মানুষের আবাস না থাকায় বুনো প্রাণীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিল জায়গাটা। ওপারে গরুমহিষের পাল দেখে এলাকার ভূস্বামী টের পেয়ে গেছিল যে ওদের রক্ষকও আছে। মুখিয়ার পরামর্শে এক রাতে পালিয়ে আসে ওরা। একটু উঁচু জঙ্গল দেখে দা ও কাস্তে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। তারপর মাঝখানটা ফাঁকা করে বসতি গড়ে তোলে। ধরা পড়ার ভয়ে গরুমোষগুলো এপারে নিয়ে আসেনি আর। ভোরে যেয়ে লুকিয়ে দুধ দুইয়ে মুখিয়াদের গ্রামে বিক্রি করে চলে আসত। কিছুদিন পরে অবস্থার উন্নতি হলে বাথানটাকে এপারে নিয়ে আসে। উপহার হিসেবে মুখিয়াকে একটা দুধেল গাই দিয়ে এসেছিল। কে জানে এখনও জীবিত আছে কিনা ঐ রসিক মুখিয়া। নিজের জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে অভিনন্দ। কী এক জীবন ছিল ওটা! এখন এক দুঃসহ অতীত। যে নিশ্বাসটা এখনও সে ধরে আছে মনে হয় না তার খুব বেশি কোনো অর্থ আছে। নদীর ধারে এই যে পারিজাত ফুলের গাছটা, বসন্ত এলে সেও তার শাখায় লাল রঙের ফুল ফোটাবে। ওর কাঁটাফোটানো শাখায় বসে ভালোবাসার গান গাইবে পাখিরা। মধুলোভী পতঙ্গেরা ঘুরে বেড়াবে ঝাঁক বেঁধে। অভিনন্দের জীবনে আর কখনো কোনো বসন্ত আসবে না। জীর্ণতার করাল গ্রাসে সে এগিয়ে চলেছে চিতার আগুনের দিকে। এই বালকটির সামনে রয়েছে পুরোটা জীবন। অনেক বসন্ত আসবে ওর জীবনে, অনেক ফুল ফুটবে, জীবনের অনেক মধু আহরণ রয়েছে ওর বাকি। ওকে একটা সুপথের সন্ধান দিতেই হবে অভিনন্দের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন এই ভাবনার ভেতর ডুবে রয়েছে সে তখন ধীমান যেন কিছু একটা আবিষ্কার করে। বলে–

'আচ্ছা ঠাকুর্দা, দিব্যদা কী ব্রাহ্মণ?'

'না, ও বৌদ্ধ।'

'তাহলে ও পাঠশালে পড়ে কী করে?'

'হুঁ, প্রশ্নই বটে। শোন তাহলে, ওর মা হচ্ছে ব্রাহ্মণী। সেই সূত্রে সে পাঠশালে যেতে পেরেছে। বেদমন্ত্র থেকে শুরু করে অনেককিছুই সে শেখে মায়ের কাছ থেকে। তারপর পাঠশালে যেয়ে আরও অনেক কিছু শেখে। তবে খুব বেশি কিছু না।'

'তাহলে আমার মা ব্রাহ্মণী হয় না কেন?'

'আরে, আমি যে বৌদ্ধ, তোর মা তো আমার কন্যা, সে ব্রাহ্মণী হবে কেমন করে।'

'তাহলে বাবা ব্রাহ্মণী বিয়ে করল না কেন?'

'ওটা তোর বাবাকে শুধাস।'

'বাবাকে বলব একটা ব্রাহ্মণী বিয়ে করতে।'

'লাভ হবে কী তাহলে? তুই তো আবার ব্রাহ্মণীর ঘরে জন্মাতে পারবি না।'

'তাহলে আমি ব্রাহ্মণী বিয়ে করব।'

'তা হতে পারে। তা কখন করবি?'

'এখন।'

'এখনই? ঠিক আছে তাহলে চল নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করে আসি।'

'বিয়ের আগে স্নান করতে হয়?'

'হ্যাঁ, হয়, চল।'

নদীতে সাঁতরে ও জল নিয়ে খেলে দুই শিশু জীবন ও জগতের সবকিছু ভুলে যায়। এমনকি একটু আগে বলা কথাগুলোও। নদী ওদের চিত্তকে পরিপূর্ণরূপে বিশুদ্ধ করে তোলে। কোমর জলে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে ধুতি ধুয়ে নেয় অভিনন্দ। ওটার জল নিংড়ে হাতের ইশারায় ধীমানকে বলে অন্য দিকে ঘুরে থাকতে। তারপর তীরে উঠে ধুতিটা পরে নেয়। ধীমানকেও বলে ওভাবে ধুতি পরিষ্কার করে তারপর জল নিংড়ে তীরে উঠে ওটা পরে নিতে। কিছুক্ষণ পর শরীরের তাপে ও রোদের আঁচে শুকিয়ে যায় পরিধয়েটা।

নদী থেকে বেশ অনেকটা দূরে ছিল একটা অশ্বত্থ গাছ। নদীর এদিকের তীর ভেঙে ওটাকে প্রায় স্পর্শ করেছে। বিশাল ঐ গাছটার ছায়া নদীর জলে পড়ে জলকে কালো বর্ণের করে তুলেছে। প্রাচীন ঐ গাছটাকে সমীহ করে নদী বোধ হয় আর এগোয়নি। গাছটার নিচে এসে বসে অভিনন্দ। ধীমানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করে, খাবি কিছু? ধীমান মাথা দোলালে উঠে যায় অভিনন্দ। নদীর ধারে বালুমাটিতে মেটে আলু জন্মেছে। আবাদ করতে হয় না ওগুলো। ফি-বছর এমনিতেই জন্মায়। দু'হাতে বালু সরিয়ে অনেক ক'টা আলু তুলে নদীর জলে ধুয়ে নেয়। গাছতলে বসে খায় দু'জনে। আলুগুলোর পাতলা ত্বকের নিচে সাদা রসালো শাঁস শুধু যে ক্ষুধা মেটায় তা না, তৃষ্ণাও চলে যায়।

পাঠশালায় যাওয়ার বিষয়টা কোনোভাবে ধীমানের মাথা থেকে খুব বেশি দূরে সরে যেতে পারছে না মনে হয়। আবার জিজ্ঞেস করে–

'ঠাকুর্দা, দিব্যদার বাবাও কী বৌদ্ধ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ব্রাহ্মণী বিয়ে করল কীভাবে? তুমি না বলেছিলে ওরা অন্য জাতে বিয়ে দেয় না। বৌদ্ধদের তো জাত নেই।'

'দিব্যকের বাবা অনেক বড় সেনাপতি এখন। রাজা, সামন্ত, মন্ত্রী, সেনাপতি এদের জন্য মনে হয় কোনো নিয়ম নেই, অথবা শিথিল, ওরা যে কোনো জাতে বিয়ে করতে পারে।'

'নিয়ম শুধু আমাদের জন্য ঠাকুর্দা?'

'তাই তো মনে হয়, ধীমান।'

'সেনাপতি হতে পারব আমি?'

রেশমের মতো ওর নরম চুলগুলো নেড়ে বলে অভিনন্দ–

'কেন রে, ব্রাহ্মণী বিয়ে করার জন্য?'

একটু যেন ভাবনায় পড়ে ধীমান। তারপর বলে–

'না ঠাকুর্দা, আমি পাঠশালে যাব।'

'ঠিক আছে, তোর পিতাজি আসুক। ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে তো।'

'পিতাজি কবে আসবে?'

'শুনেছি যুদ্ধে গেছে উত্তর দিকের কোনো রাজ্যে। আসবে হয়তো বর্ষা মওসুমের আগেই।'

বাংলা থেকে মাৎসান্যায়ের অরাজকতা দূর করেছিলেন রাজা গোপালদেব। রাজ্যে শান্তি ফিরে এসেছিল। মাৎসান্যায়ের অবসান ও গোপালদেবের রাজা মনোনয়ন এ ভূখণ্ডের ইতিহাসে আদি গণতন্ত্রের একটা খুব ভালো উদাহরণ। জনগণের চাপে স্থানীয় রাজারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বসম্মতভাবে গোপালদেবকে রাজা নির্বাচন করেছিল। দেবপালের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজা ধর্মপাল জনগণের ভালোবাসার এই মূল্য প্রতিদান দিয়ে চলেছেন অকুণ্ঠ চিত্তে। মাৎসান্যায়ের কালে ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাজারাও রাঢ় বাংলার জনগণকে একহাত দেখিয়ে দিত। ঐ সব রাজাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে চলেছেন ধর্মপালদেব। ভবিষ্যত-রাজ্য সংহত করা ও সম্প্রসারণ করে এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অঞ্চলে একটা শক্তিশালী রাজ্যের কাঠামো নির্মাণ শুরু করেছেন। তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা, অসমসাহসী বীর, সেনাধ্যক্ষ বাকপাল উত্তরের কামরূপ রাজ্যটাকে বশে আনার জন্য যুদ্ধাভিযানে রয়েছেন। এই কামরূপ রাজ্যটা অতীতে বাংলা আক্রমণ করে এর জনগণকে যথেষ্ট ভুগিয়েছে। বাকপালের সেনাদলে কর্মরত রয়েছে ধীমানের পিতা মধুমথন। একই সেনাদলের একটা বড় অংশের সেনাপতি দিব্যকের পিতা বাহুবল। সফল যুদ্ধাভিযান শেষ করে দু'জনেই গ্রামে ফিরে আসে একসঙ্গে। বেশ কিছুদিন অলস সময় কাটাতে পারবে এবার। পরিবারের সদস্যরা আনন্দ ও উল্লাসে কাটাতে পারবে কিছুদিন।

আকাশ ঝরানো এক বৃষ্টির বিকেলে ওদের গ্রামে এসে পৌঁছে মধুমথনেরা। শুরু থেকেই পালরাজাদের শক্তিমত্তা বেশি ছিল হাতিবাহিনীতে। এগারোটা হাতির সমন্বয়ে গড়া ছোট্ট একটা হাতিবাহিনীর অধিপতি মধুমথন। কিন্তু ওদের ছোট্ট এই গ্রামটার জন্য এগারোটা হাতির ভার বওয়া ছিল সত্যি কষ্টকর। উত্তরের কামরূপ রাজ্যের একটা বড় অংশ জয় করে রাজধানীতে ফিরে গেছেন মহারাজ ধর্মপাল। বর্ষাকালে আর কোনো অভিযান নেই। এই ক'টা মাস গ্রামে কাটাবে মধুমথন। ওদের জন্য কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু এগারোটা হাতির খোরাক জোটানোর মতো কলাগাছ এখানে নেই। হাতি চড়াতে আশপাশের গ্রামে যেতে হয় প্রতিদিন। আর এই সব রাজার হাতির খোরাক জোটাতে লোকালয়গুলো কেঁপে ওঠে। মধুমথন এখন সহস্র সৈন্যের সেনাপতি। সম্মানই আলাদা ওর। ফলে গ্রামের বাড়িতে ছুটি কাটাতে আসার সময়ও একা আসতে পারে না। ছোটো একটা সৈন্যদল নিয়ে আসতে হয়। ওর সৈন্যদলে হাতির সংখ্যাই পঞ্চাশটি। কম প্রশিক্ষিত ও ছোটো আকারের ঐ এগারোটি হাতি একসঙ্গে দেখে গ্রামের মানুষেরা মধুমথনকেই রাজা ভেবে বসে আছে। ওর ধারে কাছে ঘেঁষতেও সাহস পাচ্ছে না কেউ। পরিবারের সদস্যদেরও সময় দিতে পারে না সে। ছোটো সৈন্যদলটা যেমন ওর নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছে তেমনি ওদেরও দেখভাল ওকেই করতে হয়। ফলে প্রায় সারাদিন ঐ সৈন্যদলের সঙ্গেই কাটাতে হয়।

সমস্যা হয়েছে অভিনন্দের। ধীমানের বিষয়টা মধুমথনের কাছে ওঠানোর সুযোগই পাচ্ছে না। মহারাজ ধর্মপালের রাজ্যে প্রশাসনিক শৃঙ্খলাও ফিরে এসেছে। প্রশাসনিক এক ছোট্ট একক হিসেবে মধুমথনদের গ্রাম নগরহরা পাট্টক কেন্দ্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। আশপাশের অনেক ক'টা গ্রাম মিলিয়ে এই পাট্টক প্রশাসন গড়ে উঠেছে। পাট্টক প্রধান হিসেবে অভিনন্দের নিয়োগ আদেশ নিয়ে এসেছে মধুমথন। বয়সের কারণে শুরুতে কিছুটা আপত্তি জানালেও সবার চাপে শেষ পর্যন্ত বিষয়টা মেনে নেয় অভিনন্দ।

মধুমথনের নায়কবেশে গ্রামে আসা ও অভিনন্দের পাট্টক প্রধান হিসেবে অভিষেক ওদের এখানে একটা উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। হাতির খোরাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বাঁচিয়ে রাখা কলাগাছ দিয়ে তোড়ন নির্মাণ করা হয়েছে। বড় একটা মাঠে খেলাধূলা ও নাচগানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টিবাদলার দিন হওয়ায় সবকিছু চলে ঢিমেতালে। বৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে। আশপাশের অনেক গ্রামের গায়ক-বাদক দল এসে গানবাজনা করে। নাচের দল এসে নাচের অনুষ্ঠান করে। সব মিলিয়ে এবারের আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথীটা নগরহরার বৌদ্ধদের জন্য একটা স্মরণীয় রাত হয়ে থাকে।

পাড়াপড়শীদের আনন্দ-আতিশয্যের ঘনঘটা কিছুটা কমে এলে পরিবারে কিছুটা বেশি সময় দেয়া শুরু করে মধুমথন। সৈনিকের জীবনে আসলে কোনো ছুটি নেই। এই তিনমাসের মধ্যে মধুমথনের দলের ভেতর থেকে কয়েকশো অশ্বারোহী যোদ্ধা বাছাই করতে হবে। ওদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যেই যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করে তুলতে হবে ওদের। এ কাজে সহায়তা করার জন্য পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী যোদ্ধা ও প্রশিক্ষকের একটা দলও রয়েছে ওর সঙ্গে।

কিন্তু বরেন্দ্র অঞ্চলে যুদ্ধ-উপযোগী ভালো ঘোড়া পাওয়া যায় না। এখানের ঘোড়াগুলোর উচ্চতা মানুষের কোমর সমান। ভালোভাবে দৌড়াতেও পারে না। খাড়া পথ বেয়ে উপরে উঠতে বা ঢালু পথে নিচে নেমে যেতে পারে না। শুধু মাত্র ছোটোখাটো শস্য-থলে বা এমনকিছু মালামাল বওয়ানো যায় এদের দিয়ে।

ঘোড়া সংগ্রহের জন্য পশ্চিমে একটা দল পাঠাতে হয় মধুমথনকে। সুপ্রাচীন কাল হতে তিন-কোনা ভারতবর্ষের কোনা তিনটে থেকে যে যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে আসছে তাতে দেখা যায় যে উত্তরাবর্তের পশ্চিমাংশের গুর্জার-প্রতিহার রাজার সৈন্যদল শক্তিমত্তা ও পারদর্শিতায় সব সময়ই অশ্বারোহী বাহিনীর জন্য এগিয়ে থাকে। আর পুবদিকের রাজারা বিখ্যাত ওদের হাতিবাহিনীর জন্য। দক্ষিণের কালো মানুষেরা দুর্জয় ওদের পদাতিক সেনাবাহিনীর জন্য। অতি দ্রুত পিলপিল পায়ে এগিয়ে আসা ক্ষুদ্রাকৃতি এই কালো যোদ্ধারা হাতি-ঘোড়া কিছুই মানে না। পঙ্গপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে যেয়ে যুদ্ধক্ষেত্র তছনছ করে ফেলে। ওদের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা এত কুশলী যে প্রতিপক্ষকে ক্লান্ত ও শ্রান্ত করে যুদ্ধের মোড় ওদের অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হয়। ওদের বর্শা, খর্গ ও মুদ্গর প্রভৃতির ব্যবহার অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতির। হাতির পিঠে বসে প্রতিপক্ষের যুদ্ধ করতে হয় দীর্ঘ বর্শা নিয়ে। ক্ষিপ্রগতিতে চালানো কঠিন ওটা। কিন্তু ওদের ছোটো আকারের বর্শাগুলো ততক্ষণে দু'চারজনকে ঘায়েল করে ফেলতে পারে। আবার ঘোড়ার পিঠে বসে যুদ্ধ করার সময় শুধু একটা দিক সামলানো যায়। কিন্তু এই পদাতিক সৈন্যরা ঘূর্ণিবায়ুর মতো মুহূর্তের ভেতর ঘুরে চারদিকে আক্রমণ করতে পারে। ঢাল ঘুরিয়ে আবার প্রতিরক্ষাও করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে। ফলে মহারাজ ধর্মপাল একটা শক্তিশালী অশ্বারোহী যোদ্ধাদল গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যেন পদাতিক সৈন্য ও হাতিবাহিনীকে যথেষ্ট সহায়তা দিতে পারে ওরা। দাক্ষিণাত্যের চোলরাজাদের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের অনুকূলে রাখার জন্য এটার গুরুত্ব অপরিসীম।

ভারতবর্ষের এই তিনটে কোনার রাজারা যদি খেয়োখেয়ি না করে নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলতে পারত তাহলে পৃথিবীর কোনো শক্তিরই সামর্থ্য ছিল না প্রাচীন এই জনপদটিকে পদানত করে রাখে। অথচ নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে নিজেরাই পায়ের নিচে পিষ্ট হতে চলেছে পশ্চিম এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় বিভিন্ন আগ্রাসী শক্তি দ্বারা।

অশ্বারোহী যোদ্ধাদের জন্য ঘোড়া কেনার উদ্দেশ্যে মধুমথনের অশ্বযোদ্ধা দলটাকে কম্বোজের পথে এগিয়ে দেয় সে। একটা মাত্র হাতি রেখে বাকি দশটাকে কোনো একটা জঙ্গুলে জায়গায় পাঠিয়ে দেয় যার আশপাশে কোনো লোকালয় নেই। বর্ষার জল নেমে গেলে চাষাবাদ শুরু করবে কৃষকেরা। হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে ফসলখেত নষ্ট করা যাবে না কোনো অবস্থায়। অবশিষ্ট পদাতিক সৈন্যদের মধ্যে যাদের বাড়িঘর একদু'দিনের দূরত্বে তাদেরও ছেড়ে দেয় মধুমথন। নিজের সহায়তার জন্য পঞ্চাশজনের ছোট্ট একটা দল রেখে দেয় মধুমথন। এদের পাঁচজন চৌকশ অশ্বারোহী সৈন্য। যে-কোনো জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে এদের। রাজাদেশ অনুযায়ী এই তিনমাসের মধ্যে স্থানীয় সামন্তরাজার কাছ থেকেও সৈন্য বাছাই করতে হবে রাজকীয় বাহিনীর জন্য। এসবের ভেতর অবসর কখন আসবে মধুমথন নিজেও জানে না। অপেক্ষায় থাকে অভিনন্দ।

সবকিছু গুছিয়ে অবশেষে কিছুটা অবসর আসে মধুমথনের। এখানের বৃষ্টিবাদলেরও আবার মাসভিত্তিক চরিত্র আছে কিছুটা। এসব নিয়ে গ্রামের মানুষজনের ভেতর অনেক রকম ছড়া, প্রবাদ ও প্রবচনের জন্ম হয়। ওসবের অনেকাংশ প্রায় ঠিক ঠিক মিলে যায়। শ্রাবণের বৃষ্টি শুরুর বার নিয়েও প্রবচন রয়েছে। সপ্তাহের কী বারে শুরু হলে কী বারে শেষ হবে তাও হিসেব করে মানুষেরা। এমন এক হিসেবে অভিনন্দ দেখে যে আগামী বৃহস্পতিবার বৃষ্টি থাকবে না। বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানায় সে মধুমথনকে। এ সুযোগে হয়তো কথাটা তোলা যাবে।

শ্রাবণের এ সময়টায় এদিকের কৃষকেরা আগামী শীত মওসুমের ফসলের জন্য জমিতে হাল দেয়া শুরু করে। বাতাস বৃষ্টিভেজা থাকায় সূর্যের উত্তাপ প্রচণ্ড হলেও ততটা অনুভূত হয় না। শক্ত বেলেমাটিতে বাঁধা গ্রামের পথগুলো। নিয়মিত বলদটানা গাড়ি চলাচল করায় পাশাপাশি দু'জোড়া চাকার সমান্তরাল চারটে গভীর দাগ চোখে পড়ে একেবারে রাস্তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। রাস্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে গাড়ির চাকা ওঠে না সেখানটা সবুজ ঘাসে ঢাকা। মানুষের চলাচলে অনেক জায়গা এবরোথেবরো। সাধারণত রাস্তার দু'দিক ঘেঁষে হাঁটে মানুষেরা। ওখানে কাদা থাকে কম। ঘোড়ার ব্যবহার খুব একটা নেই এ সময়ে। হাটবার ছাড়া মানুষজনের মালপত্র বয়ে নিতে হয় না। বেশির ভাগ মানুষ মাথায় ঝাঁকা নিয়ে অথবা বাঁকে করে ফলমূল বা অন্যান্য সামগ্রী হাটে নিয়ে যায়। গাড়ি চলাচলের চাকার জায়গাগুলোয় থিকথিকে কাদা জমে আছে। কোনো কোনো জায়গা কিছুটা নিচু। জল জমে আছে। বর্ষার ব্যাঙগুলো বসে ঘরকন্যে সেরে নেয় ওখানে। বাঁধানো সড়কের সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন পাড়াগাঁ থেকে আসা মেঠোপথ। ওরকম একটা পথ ধরে এগিয়ে যায় মধুমথনের দল। ছোট্ট একটা বসতির কাছাকাছি পৌঁছে কামারশালার হাতুড়ির ঠকঠক শব্দ শুনে মনে মনে খুশি হয় মধুমথন। আগামী যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তৈরির আদেশ দিয়েছেন মহারাজ। কামারশালাগুলোর কোনোটারই এখন সামান্য বিশ্রাম নেই। ক'দিন আগে ঘোড়ার নালের কিছু নমুনা দেয়া হয়েছিল দক্ষ ক'টা কামারশালায়। ওগুলোর বানানো দেখে মুগ্ধ হয় মধুমথন। নিখুঁতভাবে নালগুলো তৈরি করেছে ওরা। ঘোড়ার খুরে ক্ষত তৈরি করার কোনো সম্ভাবনাই নেই ওগুলো দিয়ে। যথেষ্ট পারিশ্রমিক দেয় ওদের মধুমথন। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানায় ওরা। ওদের কারিগরিতে সন্তুষ্ট হয়ে হাজারখানেক বর্শার ফলা তৈরির আদেশ দেয় সে। এগুলো বানানোর জন্য লোহা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ওর সৈন্যদলের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দেয় সিংভূমের পথে। দু'হপ্তার মধ্যে লোহার এক বড় চালান নিয়ে ফিরে আসে ওরা। কামারশালায় দিনরাত চলতে থাকে বর্শার ফলা তৈরির কাজ। বংশপরম্পরা অর্জিত অভিজ্ঞতায় নিপুণ হাতে পেটানো লোহার বর্শাফলক দেখে খুব খুশি হয় মধুমথন। এসব বর্শাফলার বিশেষত্ব হল লোহার যে অংশটা বাঁটের হাতলের ভেতর ঢুকে যাবে তার প্রায় অর্ধেকটা থাকবে লোহার নলের ভেতর ঢোকানো। ফলে তলোয়ারের কোপে বর্শাটা কেটে ফেলা সম্ভব হবে না। মহারাজও নিশ্চয় এসব দেখে খুশি হবেন। এসব বর্শার হাতলের জন্য লোহাকাঠ সংগ্রহের জন্য আরেকদল সৈন্যকে পাঠানো হয় উড়িষ্যার বিন্দঝারের জঙ্গল এলাকায়। প্রচুর লোহাকাঠ জন্মায় ওখানে। বর্শার হাতল হিসেবে যদিও খুব ভারি ওটা, কিন্তু এত শক্ত যে তরবারির আঘাতেও ভেঙে যায় না। পদাতিক সৈন্যের জন্য ছোটো হাতলের এই বর্শাগুলো খুব উপযোগী। এই বর্শার ফলার নিচে আরও অনেকটা জুড়ে থাকে ছোটো ছোটো নল। ফলে তরবারির আঘাত সহজেই পিছলে যায়। ঢাল ঘুরিয়ে নিজেদের চারদিক রক্ষা ও বর্শা দিয়ে যে কোনো দিকে আক্রমণ করে শত্রুকে বিদ্ধ করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষায় যাতায়াত কিছুটা দুর্গম হওয়ায় বেশ অনেকদিন লেগে যায় কাঠ নিয়ে সৈন্যদলের ফিরে আসতে। ওটা পুষিয়ে দেয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের ছুতোরেরা। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে খুব দ্রুত হাতলগুলো বানিয়ে দেয় ওরা। তারপর কামারেরা যখন ওগুলোয় বর্শা গেঁথে পুরোপুরি প্রস্তুত করে দেয় মধুমথনের সৈন্যদল তা দেখে খুশিতে ফেটে পড়ে। সবাই একটা করে পেতে চায় এগুলো। ওদেরকে সন্তুষ্ট করে মধুমথন। নিজের এলাকার কামারদের নৈপুণ্যে মুগ্ধ হয়ে ঢাল বানানোর আদেশও মহারাজের কাছ থেকে সংগ্রহ করে দেয় সে। ধীরে ধীরে ঐ কামারশালাটি এক বিশাল অস্ত্রনির্মাণ কারখানা এলাকার রূপ পায়। গ্রামের সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মধুমথনের কাছে। কামারপাড়া ও ছুতোরপাড়া দুটোই হিন্দু সম্প্রদায়ের। ওদের পুজো-পার্বণের জন্যও দু'হাতে সহায়তা দেয় মধুমথন।

ঘোড়া ও অস্ত্র সংগ্রহ, ঘোড়সওয়ার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কাজে কীভাবে যে তিনটা মাস কেটে গেছে তা অভিনন্দ বা মধুমথন, কারো মাথায়ই আসে না। এ বয়সে পাট্টক প্রধানের গুরুদায়িত্ব অভিনন্দের কাঁধে এসে পড়ায় সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে না ঘুমানো পর্যন্ত ওর অবসর নেই। ফলে ধীমানের সঙ্গে এরিমধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হতে শুরু করেছে।

এসবের ফাঁকে কোনো একদিন মধুমথনের কাছে ধীমানের ইচ্ছেটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল অভিনন্দ। কিন্তু মধুমথনের ইচ্ছে রাজকীয় অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সেনাপতি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলুক ধীমান। অভিনন্দ ওকে বুঝিয়েছে যে সেটা পাঠশালার পড়াশোনা শেষ করার পরেও সম্ভব। বরং সেক্ষেত্রে ওর অর্জিত শিক্ষা ওকে আরও উঁচু পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে। শেষ পর্যন্ত অভিনন্দের প্রস্তাবে সায় জানায় মধুমথন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪

মানুষজীবনের কৈশোরকালটা কোনোভাবেই একাকিত্বের নয়। শৈশব পেরোনোর পর ঠাকুর্দা অভিনন্দকে পেয়ে এসেছে ধীমান বুড়ো-বয়সী এক বন্ধু রূপে। কিন্তু প্রশাসনিক কাজকর্মে জড়িয়ে অভিনন্দ ব্যস্ত হয়ে উঠলে ওর শূন্যস্থান পূরণ করে পাড়ার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা যাদের খুব শীঘ্র পাট্রক প্রধান হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। ঠাকুর্দার স্নেহের ছায়াতল থেকে বেরিয়ে এক বাঁধাবন্ধনহীন বল্গাছাড়া জগতে এসে পড়ে ধীমান। অনেক বন্ধু জুটে যায় এবং খেলাধুলারও অঢেল উপকরণ পেয়ে যায় প্রকৃতির মাঝে। পাঠশিক্ষা নেয়ার যে অধীরতা ফুটে উঠেছিল ওর ভেতর সহসা যেন কোথায় হারিয়ে যায় ওটা। বর্ষা-শেষের নরম কাদামাটি ছেনে ছোটো ছোটো গুলি, মাটির পুতুল, হাতি-ঘোড়া, এসব বানিয়ে আবার ওগুলো রোদে শুকিয়ে চুলোয় পুড়িয়ে নিজেদের জগতের ছোটো ছোটো সংগ্রহশালা গড়ে তোলে প্রত্যেকে।

শরতে মাঠ ঘাট শুকিয়ে বনজঙ্গল ঘন হয়ে এলে পোড়া মাটির গুলি দিয়ে সান্তালপাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে পাখি শিকারে বেরোয়। কিন্তু কাজটা করতে হয় গোপনে। ওদের ধর্মে তো আবার প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ। সান্তাল বন্ধুরা বাঁশের চোঙে খাঁজ কেটে, বাঁশের বাতা ধনুকের মতো বাঁকিয়ে এক ধরনের অস্ত্র তৈরি করে দিয়েছে ওকে। চোঙের ভেতর গুলি রেখে পাখি তাক করে ধনুকের একটা প্রান্ত মুক্ত করে দিলে বিদ্যুৎ বেগে ওটা ছুটে যেয়ে গুলিটাকে অনেক দূরে ছুঁড়ে দেয়। অস্ত্রটা ওর খেলার সামগ্রী হিসেবে রয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত একটা পাখিও শিকার করতে পারেনি ওটা দিয়ে। ওর প্রচেষ্টা যদিও রয়েছে ক্লান্তিহীন ও খুব আনন্দ-দেয়া।

মাটির গুলি, পুতুল, এসব তৈরি করে যখন ওদের মজুদ অনেক বেশি হয়ে যায় তখন মাটির প্লেট তৈরি করে ওখানে নক্সা আঁকা শেখে ওরা। অনেক ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুল পাখি ও মাছের নক্সা ফুটিয়ে তোলে ওরা। কিন্তু ওসব চুলোয় পোড়ানো যায় না। এজন্য যেতে হয় কুমোরপাড়ায়। কুমোর ছেলেমেয়েদের মধ্যেও অনেক বন্ধু হয়ে গেছে এখন ওর। ওদের পুজো-পার্বণগুলো আবার ভিন্নরকম। পুজোর সময় ওদের সঙ্গে সেও মেতে ওঠে আনন্দে। সমস্যা হয় বামুনগুলো নিয়ে। ওদের ছেলেমেয়েরা ধীমানকে ততটা অবহেলা না করলেও কামারকুমোরদের হেয় মনে করে এড়িয়ে চলে। এটা একদম ভালো লাগে না ওর।

কুমোরপাড়ায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করে ওর এক বন্ধুর বোন সুভদ্রার সঙ্গে ভাব হয়ে যায় ধীমানের। ওটার মূল কারণ ওর বানানো মাটির শ্লেটগুলো যত্ন করে পুড়িয়ে দেয় ঐ মেয়েটা। শুধু তাই না, শ্লেটে নতুন নতুন নক্সা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার কায়দাকানুনও শিখিয়ে দেয়। বেশ অনেকদিন থেকে পাখি শিকার বা মাছ ধরতে না যেয়ে মাটির এই টেরাকোটা শিল্পের প্রতি গভীরভাবে ঝুঁকে পড়ে ধীমান। সুভদ্রার হাত ধরে এক নিপুণ টেরাকোটা শিল্পী হয়ে উঠতে থাকে সে। নতুন এক শিল্পবাসনা রোপিত হয় ওর ভেতর। ওটা আর থেমে থাকে না। চারদিকে ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। মাটির শ্লেট বানানো থেকে সরে এসে এখন ওটা পোড়ামাটির মূর্তি বানানোর দিকে ঝুঁকে পড়ে। অসাধারণ সুন্দর সব প্রতিমা নির্মাণ করতে থাকে ধীমান।

পাঠশালায় যাওয়ার বিষয়টা ওর মাথা থেকে দূর হয়ে গেলে অভিনন্দ একদিন জিজ্ঞেস করে যে কী হলো ওটার। সে জানিয়ে দেয় যে আর পাঠশালায় যেতে চায় না। প্রতিমা নির্মাণশিল্পী হিসেবে জীবন শুরু করতে চায়। দু'বছর পর আরও অনেক বড় দলের সেনাপতি হয়ে মধুমথন যখন গ্রামে ফিরে আসে কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা রেখেছে ধীমান। শরীরের কাঠামো গড়ে উঠেছে পিতার মতো চৌকশ ও বিশালদেহী। মনে মনে খুশি হয় মধুমথন। অশ্বারোহী সৈনিক হিসেবে এমন ছেলেই চাই ওর। বয়সকালে নিশ্চয় একটা বড় দলের সেনাপতি হয়ে উঠতে পারবে সে। ধীমানের কাছে অভিনন্দ ওর বাবার ইচ্ছের কথা জানালে বেঁকে বসে সে। গ্রাম ছেড়ে এখন কোথাও যেতে চায় না। এবং প্রতিমা নির্মাণশিল্পী ছাড়া অন্য কিছু হতেও চায় না।

প্রকৃতপক্ষে, সুভদ্রার সঙ্গে ওর সখ্যতা এ দু'বছরে গভীর প্রেমে পরিবর্তিত হয়েছে। ওকে ছেড়ে যেতে চায় না সে। শিল্প ও নারী, দুটোর প্রতিই ওর ভালোবাসা প্রগাঢ় রূপ পেয়েছে। এ দুটোর বাঁধন কেটে বেরোনো এখন একেবারে অসম্ভব ওর পক্ষে। কিন্তু মধুমথনও নির্দেশ ফিরিয়ে নেবে না। বিষয়টা আবার অভিনন্দের কাঁধে এসে পড়ে।

পাট্টক প্রধান অভিনন্দ এখন বয়স ও অভিজ্ঞতায় অনেক কুশলী। ধীমানকে প্রস্তাব দেয় সে কোনো একদিন ওর শিল্পকর্ম দেখাতে নিয়ে যেতে। সানন্দে সম্মত হয় ধীমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমোরপাড়ায় পৌঁছে একটা বড় ঘরের ভেতর স্তূপ করে রাখা টেরাকোটার বিভিন্ন শ্লেট দেখে বিস্মিত হয় অভিনন্দ। অসংখ্য মাটির প্রতিমা দেখে অভিভূত সে। অনেক উঁচুদরের এক শিল্পীর কাজ এগুলো। তখুনি ওকে প্রস্তাব দেয় মাটির এই ভঙ্গুর কাজ আপাতত থামিয়ে রেখে কষ্টিপাথরের প্রতিমা নির্মাণে হাত দিতে। ধীমান জানায় যে এখানে কষ্টিপাথর পাবে কোথায়, আর এসবের কদর এখানে বুঝবে কে, মূল্যই বা পাবে কী? অভিনন্দ বলে বিক্রমশীলায় ব্যবস্থা করে দেবে সে। মহাবিহারের সম্প্রসারণ কাজ চলছে ওখানে। অনেক জ্ঞানীগুণিজনের এক মহাযজ্ঞ সেখানে। প্রকৃত শিল্পীর সমাদর পাবে সে ওখানে। তখুনি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছায় না ধীমান। সুভদ্রার সঙ্গে পরামর্শ করবে সে এ বিষয়ে। সুভদ্রা যদি যেতে চায় তাহলেই হয়তো এটা সম্ভব। ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না সে। কুমোরপাড়া ছেড়ে ফিরে আসে ওরা।

সুযোগ বুঝে সুভদ্রার সঙ্গে একদিন কথা ওঠায় ধীমান–

'ক'দিন থেকে একটা কথা বলার চেষ্টা করছি তোমাকে, শুভ।'

'আমারও তাই মনে হয়েছে।'

'কেন?'

কোনো জবাব দেয় না সুভদ্রা। ধীমান বলে–

'বুঝে উঠতে পারছি না কীভাবে শুরু করব।'

'অনেকটা অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তোমাকে ক'দিন থেকে। খুব বেশি ভাবনায় পড়েছ ধীমান?'

'বিষয়টা ভাবনারই বটে, শুভ।'

পোড়ামাটির একটা মূর্তির বাহ্যিক গড়ন ঠিক করার কাজ নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এখন ধীমান। নরুণ দিয়ে চেঁছে ও তন্ত্র দিয়ে ঘসে ওটার চোখমুখের আদল নিখুঁত ও চকচকে করে তোলার চেষ্টা করে। প্রায় প্রস্তুত হয়ে গেছে ওটা। গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজটা করে সে। সুভদ্রার কাছে কথাটা কীভাবে বলবে এখন ঐ ভাবনায় ভেতরে ভেতরে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে সে। যতবার মূর্তিটার সূক্ষ্ম কাজগুলো শেষ করে ফেলেছে বলে মনে হয় ততবারই দেখে যে, না আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। এভাবে অনেকটা সময় কাটানোর পর দেখে মূর্তিটার ঠোঁটে আশ্চর্য এক হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। এবং চোখেও কৌতুকের ছটা। অবাক হয় ধীমান। চোখ তুলে তাকায় সুভদ্রার দিকে। আরও অবাক হয়। সুভদ্রার ঠোঁটেও হাসির দ্যুতি ও চোখে কৌতুকের ঝিলিক। আবার তাকায় মূর্তিটার দিকে। এটা কীভাবে সম্ভব! সুভদ্রাকে বলে–

'মূর্তিটা যে হাসছে সুভদ্রা, দেখ, দেখ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওটার দিকে না তাকিয়েই বলে সুভদ্রা–

'আমি জানি।'

কিছু বুঝে উঠতে পারে না ধীমান। জিজ্ঞেস করে–

'কীভাবে জানো শুভ?'

'ও হাসবেই তো, ওটাই যে আমি।'

একটু খটকায় পড়ে ধীমান। অচেনা এক সুরে, অনেক দূরের কোনো এক বনের পাখির কণ্ঠে ডেকে ওঠে–

'শুভ!'

একটু পর আবার ডাকে–

'শুভ! সুভদ্রা!'

চমকে উঠে সুভদ্রা। দু'পা কাছে এগিয়ে আসে। বলে–

'বল।'

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ধীমান। কিছু বলতে পারে না। চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওটা কী মানুষের চোখ! ও কী সুভদ্রা? না ওর মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া মাটির ঐ প্রতিমাটি? চোখে এক আশ্চর্য, অজাগতিক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সুভদ্রা। কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা, অথবা কোনো জিজ্ঞাসা, কিছুই ফুটে উঠে না ঐ চোখ দুটোয়। ধীমান কিছু বলছে না দেখে আরও দু'পা এগিয়ে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায় সুভদ্রা। বলে–

'বল, ধীমান।'

তবুও চুপ করে থাকে ধীমান। নিঃশ্বাস ভারি হয় দু'জনের এক অজানা আকর্ষণে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। ধীমানের কাছ থেকে কিছু একটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকা সুভদ্রার কান দুটো মনে হয় অনেক অনেক কাল পর হারিয়ে যায় কোনো এক অপূর্ণ নৈঃশব্দের অতল গহ্বরে। অথচ ধীমানের চোখ দুটো তখনও সুভদ্রার চোখে খুঁজে চলেছে অন্য এক জগতের আলো। প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে অতঃপর সুভদ্রার চোখদুটো ধীমানের হাতে গড়া প্রতিমার মতোই আবেগ-অনুভূতিহীন এক প্রতিরূপে পরিবর্তিত হয়। কোনোকিছুতে আর সাড়া দিতে পারে না ওদুটো। এমন এক ভ্রান্তির অনুষঙ্গে জড়িয়ে রণে ভঙ্গ দেয় দু'জনে। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুভদ্রা। স্থাণুর মতো আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ধীমান। তারপর ফিরে আসে, বিহ্বল ও একা, অন্য এক মানুষ। নিজেদের নিভৃত গ্রামের এক প্রান্তে এসে হারিয়ে যায় কৈশোরের অচেনা আনন্দ-শিহরণে।

তার পরের দিন দুটো কেটে যায় ধীমানের এক অভূতপূর্ব ঘোরের ভেতর। ঠাকুর্দা অভিনন্দ পাট্টক প্রধান হওয়ার পর এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে ওর সঙ্গে পরামর্শ করা দূরে থাক, কথা বলার সময়ই পাওয়া যায় না। নয়তো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কাউকে বলতে না পারলেও ঠাকুর্দার কাছে অন্তত একথাটা বলা যেত। ভেতরে ভেতরে গুমরে মরে ধীমান।

বিষয়টা হয়তো লক্ষ্য করেছে অভিনন্দ। যে ধীমানের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না সারা দিনমান তাকেই দেখে সে বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করতে। খটকা লাগে ওর মনে। সময় পেয়ে একদিন ডেকে পাঠায় ওকে।

একটু অবাক হয় ওকে দেখে অভিনন্দ। পরিপক্বতার একটা ছাপ ওর চোখেমুখে। দুশ্চিন্তার ছায়াও যেন। পরিণত না হলে সাধারণত কারো চোখেমুখে চিন্তার ছায়া পড়ে না। ভাবার চেষ্টা করে একটু অভিনন্দ। কী কারণ থাকতে পারে এটার। ভেবে পায় না কোনো কিছু। অবশেষে জিজ্ঞেস করে ওকে–

'কী বিষয় ধীমান মহাশয়, মনে হয় নামের আগে শ্রীযুক্ত লাগিয়ে ধীমান মহাশয় ডাকতে হবে! আজকাল যে দেখাই মেলে না।'

'তুমিই তো ব্যস্ত হয়ে পড়েছ ঠাকুর্দা। তোমার নাগাল পায় কে? তুমি এখন নগরহরার পাট্টক প্রধান।'

'তা বটে, তা বটে।'

'ডেকেছ কেন ঠাকুর্দা, বল তো?'

'মহাশয়ের কোনো তাড়া আছে? কেউ অপেক্ষা করে আছে কোথাও?'

ফিক করে হেসে ফেলে ধীমান। ঠাকুর্দার চোখ ফাঁকি দেয়ার কোনো জো নেই। শুধু যে বয়সই বেড়েছে তাঁর, তা না, জীবনের এত দিকে এত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা এক জনমে কম মানুষেরই ভাগ্যে বা দুর্ভাগ্যে জোটে। ওর শরীর ও চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না যে এতটা বয়স হয়েছে। নিজেকে অনেকটা ভাগ্যবান মনে করে ধীমান। সুযোগ্য পিতার সান্নিধ্য না পেলেও ঠাকুর্দার মতো এমন একজন সুহৃদ মানুষের ছায়াতলে বেড়ে উঠেছে সে। মনে মনে ভাবে ঠাকুর্দার কাছে সব কিছু খুলে বলবে। জীবনের এমন এক বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে সে যে কোন দিকে আর এগোবে বুঝতে পারে না। পথ হারিয়ে ফেলার মতো অবস্থা অনেকটা। বিষয়টা হয়তো আঁচ করতে পারে অভিনন্দ। কোনো একটা মানসিক সঙ্কটে পড়েছে ধীমান। তাই সরাসরি জিজ্ঞেস করে–

'কোনো সঙ্কটে পড়েছ ধীমান?'

'সঙ্কট ঠিক না, ঠাকুর্দা। একটা দোলাচলে পড়েছি। একটা কাজ করতে চাই আমি। অথচ বলতে পারছি না যে এ কাজটা করতে চাই।'

'খুব কঠিন কাজ নাকি হে?'

'আসলে হয়তো খুব সহজ। কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হয় খুব কঠিন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু চুপ করে থাকে অভিনন্দ। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার জন্য সময় দেয় ওকে। একজন ভৃত্য ডেকে ভাঁড়ার থেকে কিছু সন্দেশ ও নাড়ু আনতে বলে। ঝকঝকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে খাবার ও দু'ঘড়া ঘোলের সরবত এনে ওদের সামনে রাখে ভৃত্য। বেশ রসিয়ে রসিয়ে দু'জনে মিলে খায় ওগুলো। ধীমান কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এলে অভিনন্দ বলে–

'কাজটা যখন সোজা তখন ওটা করে ফেলাই তো ভালো ধীমান।'

'করে ফেলব?'

'হ্যাঁ ধীমান। করে ফেল।'

মনে মনে প্রস্তুতি নেয় ধীমান। কীভাবে কথাটা উপস্থাপন করবে তা ভাবে। একটু পেছনের ঘটনা হঠাৎ মাথায় এসে যাওয়ায় অভিনন্দকে জিজ্ঞেস করে–

'তোমার মনে আছে ঠাকুর্দা, অনেক বছর আগে একটা বামুনি বিয়ে করাতে চেয়েছিলে আমাকে?'

'হ্যাঁ, কথাটা মনে আছে ধীমান। কিন্তু সেটা তো আমি চাইনি। তুই চেয়েছিলি। আমি সম্মত হয়েছিলাম।'

'ঐ ধর, এখন ওরকমই একটা কিছু।

ভাবনার একটা ছায়া দেখা দেয় অভিনন্দের চোখেমুখে। ধীমান কী তাহলে অন্য কিছু ব্যবস্থা করে বসে আছে আবার? ওর বাবার কাছে কথা দিয়ে রেখেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নগরকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেবে ওকে অভিনন্দ।

'তা এখন বামুনি বিয়ে করতে হচ্ছে কেন তোমাকে, ধীমান? তোমার বিয়ের জন্য আমরা কেউই প্রস্তুত নই এখন।'

নিজের উপর রাগ হয় ধীমানের। ঠাকুর্দাকেও কথাটা বোঝাতে পারেনি সে।

ধীমানের ধাতটাই এ রকম। হয়তো এক জাত-শিল্পী সে। বাস করে অন্য এক কল্পজগতে। আর বাস্তব বিষয়গুলোর প্রকাশও ঘটায় সে এক অবোধ্যতার ভেতর দিয়ে। কাউকে বোঝাতে পারে না ওর মনের কথাগুলো। একটু ভেবে কথাগুলো গুছিয়ে নিয়ে বলে–

'না ঠাকুর্দা, বামুনি বিয়ে করা না। আর বিষয়টা বিয়ে করারও না।'

একটু যেন আশ্বস্ত হয় অভিনন্দ। উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে–

'তবে কী?'

'কথাটা হচ্ছে... বিয়ের কথাটা কাউকে বলার... কাউকে বলতে পারার বিষয় নিয়ে... '

হাসি সামলাতে পারে না অভিনন্দ। বলে–

'ঠিক আছে, ঠিক আছে ধীমান, আমাকে বল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীমান ভাবে ঠাকুর্দা রসিকতা করছে। কিছুটা রাগের সুরে বলে–

'তোমাকে বলে লাভ? তোমাকে বিয়ে করব আমি?'

'ও বুঝেছি। তাহলে বল, তোর হয়ে আমি তোর বাবামাকে বলি।'

'ওহ্ ঠাকুর্দা, বাবামাকে বলা না। তুমি খুব প্যাচাচ্ছ।

অভিনন্দ এখন সত্যি বুঝতে পারে না ধীমানকে। বলে–

'তাহলে বল তো ধীমান, তোর বিয়ের কথাটা আমাকেও বলবি না, তোর বাবামাকেও বলবি না, তো কাকে বলবি?'

'যাকে বিয়ে করতে চাই তাকে বলতে পারছি না কথাটা, ঠাকুর্দা।'

গলা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠে অভিনন্দ। ধীমানের বুকের ভেতর থেকেও যেন একটা পাথরচাপা ভার নেমে যায়। ওর আশা হয়েছে যে ঠাকুর্দা হয়তো এটার একটা সমাধানের পথ বের করে দেবে। একটু পরে জিজ্ঞেস করে অভিনন্দ–

'আর কিছু খাবি ধীমান?'

'না ঠাকুর্দা।'

একটু ভেবে বলে অভিনন্দ–

'তুই যখন কথাটা ওকে বলতে পারছিস না তা হলে বল আমিই যেয়ে বলি, অসুবিধা কী?'

'না ঠাকুর্দা। কথাটা আমাকেই বলতে হবে। এবং আমিই বলব।'

'তাহলে তো ঠিকই আছে। তা কনেটি কে হে ধীমান মহাশয়?'

এবার একটু বিপাকে পড়ে ধীমান। অভিনন্দকে অবশ্যই বলতে হবে। ওর সাহায্য ছাড়া কোনোভাবে এটা সম্ভব না। বলে–

'সুভদ্রা।'

'কুমারপাড়ার সুভদ্রা?'

'হ্যাঁ, ঠাকুর্দা।'

একটা কালো ছায়া নেমে আসে অভিনন্দের চোখেমুখে। কী করে সম্ভব! মধুমথন তো কোনো অবস্থায় মেনে নেবে না এটা। এমনকি নিজেও মেনে নিতে পারছে না সে। বড় রকমের এক দুঃশ্চিন্তার গভীর ফাঁদে পড়ে যায় অভিনন্দ। ধীমানকেও বলতে পারে না কিছু। ওর এই দৌহিত্রটিকে যতটা ভালোবাসে অভিনন্দ সম্ভবত ওর কন্যা সুতপাকেও এতটা ভালোবাসেনি সে। বিষয়টা নিয়ে আজ আর কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করছে না ওর। অভিনন্দ বলে যে অন্য কোনোদিন কথা বলবে এ নিয়ে। তারপর যার যার ঘরে ঢুকে পড়ে ওরা।

শরতের শুরুতে উরু-উরু হয়ে ওঠে বরেন্দ্রর প্রকৃতি। নদীতীরগুলো ছেয়ে যায় সাদা কাশফুলে। আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা মেঘের অসংখ্য ভেলা।

দেবপাল-৪ দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজ মাঠ জুড়ে কৃষকেরা ব্যস্ত থাকে ফসল ফলানোর আয়োজনে। সবুজের সমারোহে মনের ভেতরও দেখা দেয় দুরু দুরু ভাব। অস্থির হয়ে উঠে চিত্ত। কখনো আনন্দ অবগাহনে ভেসে যেতে ইচ্ছে হয় দূর হতে আরও দূরে। আবার কখনো অকারণে মনের ভেতর নেমে আসে পাথর-ভার। ঠিক যেন রোদছায়ার লুকোচুরি। গোনে গোনে হপ্তার প্রতিটা দিন অতিক্রম করে ধীমান। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় আজ পঞ্চম দিন। ঠাকুর্দা কী আমার চিত্তধৈর্য পরীক্ষা নিচ্ছে! নাকি ভুলেই গেছে। কিছুই বলছে না এখনও!

সনাতন ধর্মাবলম্বী পাড়াগুলোয় পুজোর আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। বছরের এ সময়টায় প্রকৃতি অনুকূল থাকায় মানুষের চলাচল বেড়ে যায়। আনন্দ উল্লাস, নাচগান, পূজা-পার্বণ প্রভৃতির ঘনঘটা দেখা দেয়। কুমারপাড়ায় শরতপুজোর প্রতিমা নির্মাণ করেছিল ধীমান গত বছর। সঙ্গে ছিল সুভদ্রা। প্রতিমার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিল সবাই। ওর ইচ্ছে এবার আরও সুন্দর প্রতিমা নির্মাণ করবে। কিন্তু সেদিনের আকস্মিক ঐ ঘটনার পর সুভদ্রার বাড়িতে যায়নি আর ধীমান। মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে ঠাকুর্দার সম্মতি পেলে যেভাবেই হোক কথাটা বলেই ফেলবে সুভদ্রাকে। কিন্তু এখনও মুখে কলপ এঁটে বসে আছে ঠাকুর্দা।

প্রাতরাশ সেরে ঘর থেকে বেরোয় ধীমান। ঘরের আঙ্গিনা পেরোতেই চোখের সামনে পড়ে একসারি রাধাচূড়া গাছ। ফুল ফুটে হলুদ হয়ে আছে। এত উজ্জ্বল হলুদ যে হঠাৎ মনে হয় পুরো আকাশ জুড়ে হাসছে সুভদ্রা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে। ঠাকুর্দার সঙ্গে কথাটা শেষ করবে আজ। ওর ঘরের সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ পর অভিনন্দ বেরিয়ে এলে দু'পা এগিয়ে যায় ধীমান। অভিনন্দ জিজ্ঞেস করে–

'নিশ্চয় কোনো শুভ সংবাদ আছে ধীমান মহাশয়ের কাছে। আজকের দিনটা তবে ভালো কাটবে আমার।'

'তোমার তো প্রতিটা দিনই ভালো ঠাকুর্দা।'

'তা বটে, তা বটে। তা তোমার দিকটা কী হে?'

'আমার দিকে কিছু নেই ঠাকুর্দা। তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি আমি।'

'হুম্, বিষয়টা দেখছি জটিলই বটে। চল দাদু, ঐ গাছতলায় যেয়ে বসি কিছুক্ষণ।'

'চল ঠাকুর্দা।'

যে গাছের নিচে এসে বসে ওরা ওটার বয়স অভিনন্দের চেয়ে বছর কুড়ি কম হবে। সেই কবে নদীর ধার থেকে মোটাসোটা দুটো ডাল কেটে এনে পুঁতেছিল সে বাড়ির প্রায় শেষ সীমানায় দুধেল গরুর বাছুরগুলো বেঁধে রাখার জন্য। পরের বর্ষায় ঐ ডাল দুটো থেকে সবুজ পাতার কুঁশি উঁকি দেয়। তারপর এই এত বছরে ডালপালা ছড়িয়ে ওদুটো কত বিশাল হয়ে উঠেছে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্চতায় যেন আকাশ ছুঁয়েছে। বর্ষা শেষে ফুল ফুটে আকাশটাকে লাল করে তোলে। আবার পরিবারের তুলোর প্রয়োজনও মেটায়। গাছ দুটো অভিনন্দের অনেক স্মৃতি-বিজড়িত। গাছের নিচে যদিও শীতল ছায়া নেই কিন্তু শরতের রোদের হালকা উত্তাপ কিছুটা সামলাতে পারে। ডালপালা ও পাতার আড়াল পেরিয়ে আসা রোদ ছায়ার নক্সা ফুটিয়ে তোলে বিরল ঘাসে ঢাকা মাটিতে। গাছ দুটোর নিচে ঘাস গজাতে পারে না তেমন। ফলে ঘাসে বসার সুযোগ নেই। কিন্তু গুঁড়ির বেড় এতটা বড়ো আর মাটির উপরে ভেসে থাকা শেকড়ের অংশগুলো এতটাই চওড়া যে দিব্যি ওগুলোর উপর বসা যায় গাছে হেলান দিয়ে। ওখানে এসে বসে ওরা। খয়েরি রঙের এক ঝাঁক শালিক উড়ে বেড়ায় ডাল থেকে ডালে। ওদের ডানা ঝাপটায় শিমুল ফুলের লাল পাপড়িগুলো মাটিতে ঝরে নিচের প্রায় পুরো জায়গাটা লাল চাদরে ছেয়ে দিয়েছে। জগতের এইসব আশ্চর্য আয়োজন চুপচাপ দেখে ধীমান। আর কান পেতে থাকে কখন কিছু বলবে অভিনন্দ। সরাসরি কথাটা ওঠায় সে–

'বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেছি ধীমান। তোমার মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছি। প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছি আমি যে তোমার পিতাজি এ বিয়েতে সম্মত হবে না।'

পাথরের মূর্তির মতো নির্বাক বসে থাকে ধীমান। সিদ্ধান্তটা যে এমনই হবে, তা যে সে ভাবেনি, তা নয়। কিন্তু বিষয়টা যখন সত্যি সত্যিই এমন হল তখন ওকে একটা বিপরীত অবস্থানে নেয়ার জন্য যে মানসিক শক্তি দরকার সেটার কোনো প্রস্তুতি ছিল না ধীমানের। ধাতস্থ হয়ে অভিনন্দকে জিজ্ঞেস করে–

'তোমার সিদ্ধান্তটা জানাও ঠাকুর্দা। আমার কাছে ওটাই সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

একটু বেকায়দায় পড়ে অভিনন্দ। মধুমথনের বিপক্ষে যেয়ে ধীমানকে সমর্থন দেয়া যেমন সম্ভব নয় তেমনি ওর সব চেয়ে প্রিয়জন ধীমানের বুকে শেল বর্ষণও অসম্ভব। ফলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধীমানও আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। সময় নেয় দু'জনেই। মানসিক একটা যুদ্ধ করে চলেছে দু'জনেই। শেষ পর্যন্ত অভিনন্দ বলে–

'আমার বিষয়টা ছেড়ে দাও ধীমান। তোমার ভালোবাসার অমর্যাদা যেমন করতে পারি না আমি তেমনি তোমার পিতামাতার সিদ্ধান্তের বিপরীতেও যেতে পারি না।'

আকাশ থেকে মেঘ সরে যেয়ে ঝকঝকে নীল রং ফুটে উঠেছে মাথার উপরের পুরো গোলার্ধে। শিমুল গাছের লালফুলের বিস্তার ছাড়িয়ে মাথার উপর চমৎকার এক আবহ সৃষ্টি করেছে ঐ নীল। শুকনো মাটির উপর ডালপালা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুলের হালকা ছায়া ও রোদের উজ্জ্বলতা অসাধারণ এক আল্পনা ফুটিয়ে তুলেছে। ধূসর মাটি ও লাল ফুল ছড়িয়ে রয়েছে জড়াজড়ি করে। একটু পরে এক খণ্ড মেঘ এসে ওটাকে আবার মুছে ফেলে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পায় শরীর। মনে হয় এক পশলা বৃষ্টি হবে। মাথা উঁচু করে মেঘ দেখে অভিনন্দ। গাঢ় ধূসর। এ মেঘ যদি মাথার উপর উঠে আসে তাহলে ক'ফোটা বৃষ্টি যে ঝরাবে তাতে সন্দেহ নেই। ভাবতে না ভাবতেই ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি নেমে আসে। অভিনন্দ বলে–

'চল উঠি ধীমান।'

'আরেকটু বসি ঠাকুর্দা?'

'বৃষ্টি এল যে?'

'হয়তো চলে যাবে এখনি।'

'আর কী বলতে চাও তুমি?'

'পিতাজির বিষয়টা জানতে পারি?'

'নিশ্চয় পার। এখনও বালক ভাবেন তিনি তোমাকে। তোমাকে নিয়ে ওর ইচ্ছেটা একটু অন্য রকম।'

'কী রকম?'

'মহারাজের অশ্বারোহী বাহিনীতে দেখতে চান তোমাকে তিনি। ওখানে বড় কোনো সৈন্যদলের সেনাপতি হিসেবে গড়ে তুলতে চান তোমাকে। এবং ভবিষ্যতে এ এলাকার সামন্তরাজা হিসেবে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনা রয়েছে ওর মনে। মহারাজ ধর্মপাল মনে প্রাণে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সমাজটার বিকাশ চান। তাঁর রাজ্যের সামন্ত মহাসামন্তদের পদগুলো বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রাখতে চান যেন ভবিষ্যতে একটা শক্তিশালী পাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। তুমি তো জানোই তাঁর পিতা গোপালদেব কিন্তু খুব সহজে এই পালরাজ্যটার ভিত্তি তৈরি করেননি। তাঁর আগে বেশ ক'জন রাজা নাগ-রানির খর্গাঘাতে রাত না পোহাতেই রাজ্য হারিয়েছিল। রাজ্য প্রাপ্তির পরদিনই ওদের মাথা মাটিতে লুটিয়েছিল। ঐ নাগ-রানিকে হত্যা করে রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন গোপালদেব। মাৎসান্যায়ের কালে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়া সব সামন্তরাজাদের বশে এনে রাজ্যটায় স্থিতাবস্থা ও শান্তি এনেছিলেন। এটা রক্ষা ও এর বিস্তৃতি ঘটানোর দায়িত্ব পড়েছে মহারাজ ধর্মপালের উপর। রাজ্যের প্রজাগণও মনপ্রাণ ঢেলে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। তোমার পিতাজি একটা রাজকার্যের মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছেন। ব্যক্তিগত অনেক ইচ্ছা ও অনিচ্ছার বিসর্জন দিতে হয় এসব কাজে। এই আমাকেই দেখ না, এ বয়সে পাট্টক প্রধানের এমন গুরুদায়িত্ব নেয়া কী সাজে আমার? ব্যক্তিগত সব আরাম-আয়াস, বিলাস-বাসনা বিসর্জন দিয়ে এখন রাজকার্যের অংশী হয়ে পড়েছি। আমি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়াতে পারছি না। আর ভবিষ্যত প্রজন্ম হিসেবে তুমি কীভাবে এড়িয়ে যাবে?'

কী জবাব দেবে ধীমান? কিছুই তো জানে না সে। একটা রাজ্যের ভবিষ্যত রাজা হওয়ার টোপ রেখেছে ওর সামনে অভিনন্দ। ছোটো বা বড়, যেমনই হোক, একটা সামন্তরাজা হওয়া মানে কামনা বাসনা, ভোগ বিলাস, ক্ষমতা, লিপ্সা, উচ্চাশা সব কিছু হাতের নাগালে! এর বিপরীতে সামান্য এক কুমারকন্যা সুভদ্রা! জীবনের এই প্রদোষকালে কী সিদ্ধান্ত নেবে ধীমান? জীবনে স্থৈর্য আসার বয়স তো হয়নি ওর। ভেবেচিন্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো পরিপক্বতা তৈরি হওয়ার কোনো কারণ নেই ওর ভেতর। জীবনের অঢেল অভিজ্ঞতালব্ধ এই প্রবীণ ও পরিপক্ব মানুষটা এক অর্বাচীন বালকের সামনে কীভাবে এমন একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার সুকঠিন ভার চাপিয়ে দিল?

এসব কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ধীমান। এমনকি এগুলোর কোনোটাই নেই ওর মাথায়। পাতা ও ফুলের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া বৃষ্টির ফোটাগুলো দ্রুত শুষে নিয়েছে গাছতলার শুকনো দোঁআশ মাটি। ফুলের লাল পাপড়িগুলোর উপর রয়েছে জলের চিহ্ন। রৌদ্রতাপের উষ্ণতা পেয়ে মাটিতে ধোঁয়ার মতো হালকা একটা স্তর তৈরি হয়েছে সামান্য সময়ের জন্য। একটা অস্বস্তিকর আর্দ্রতা বাতাসে। জায়গাটা ছেড়ে উঠে পড়তে ইচ্ছে হয় অভিনন্দের। ধীমানের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় ছেলেটার ভেতর দিয়ে উল্টোপাল্টা ঝড় বয়ে যাচ্ছে একটা। সহসা উঠে দাঁড়ায় সে। গড় হয়ে প্রণাম করে অভিনন্দকে। পদধূলি নিয়ে বলে–

'তুমি আশীর্বাদ করো ঠাকুর্দা। সুভদ্রার কাছে ও কথাটা বলতে যাচ্ছি আমি।'

ওর মাথায় হাত রাখে অভিনন্দ। মুখে কোনো কথা জোটে না। হঠাৎ বৃষ্টিটা আবার উধাও হয়ে গেছে। ঝকঝকে রোদের ভেতর গ্রাম ছেড়ে যায় ধীমান।

আকাশে শরত মেঘের অপরূপ কারুকাজ। প্রতি মুহূর্তে ঐ আকাশ অথবা শূন্যতার রূপ-বদল প্রাণভরে দেখে ধীমান। শীর্ণ হয়ে আসা নদীতীরে এসে বসে কিছুক্ষণের জন্য। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস ক্ষণিকের জন্য শরীর ও মন জুড়িয়ে দেয়। উঠে যেয়ে একটা কাশঝোপের ছাতার নিচে শুয়ে পড়ে। শত শত পাখির ঝাঁক আকাশে। মাঝে মাঝে দু'একটা চিল নেমে এসে নদী থেকে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে যায় একটা মাছ। চিলের নখে গেঁথে থাকা মাছের শরীরটা বেঁকে উঠে একদু'বার। তারপর নীরব হয়ে যায়।

এই তো প্রাণীর জীবন! মানুষের হয়তো আরও একটু দীর্ঘ। অদৃশ্য কোনো এক বাজের নখর এড়িয়ে যতদিন টিকে থাকা যায়। কী হবে এসব রাজ্যপাট ও বিলাস-ব্যসনের ভ্রান্তিজালে আটকে থেকে। শেষ পর্যন্ত তো ঐ মাছটার অমোঘ ও অলংঘ্য পরিণতিই নেমে আসবে জীবনে। এর আগে জলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতটুকু গভীরে সে জীবনের ক'টা দিন যাপন করেছিল তাতে কী আসে যায়? টুক করে উঠে যায় ধীমান। হনহন করে হেঁটে যায় কুমোরপাড়া। প্রতিমা নির্মাণঘরে যেয়ে প্রথমেই খোঁজ করে ঐ প্রতিমাটি। আশ্চর্য, কোথাও খুঁজে পায় না ওটা। থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মাঝখানে। একটু পর সুভদ্রা এসে দাঁড়ায় ঘরের দরোজায়। ওর মুখে সেই আশ্চর্য রহস্য হাসি! ওকে জিজ্ঞেস করে ধীমান–

'ঐ মূর্তিটা কোথায় শুভ?'

'এই যে।'

হেসে উঠে ধীমান। পুরো এই একটি হপ্তায় আবার যেন খানিকটা স্বাভাবিকতা ফিরে পেল ধীমান।

'হ্যাঁ, এটাকেই নিতে এসেছি শুভ। আসো।'

দু'হাত বাড়িয়ে দেয় ধীমান। একপাও এগোয় না সুভদ্রা। আবার বলে ধীমান–

'কই? এসো, শুভ!'

হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধীমান। সুভদ্রার ঐ হাসিটা অজানা এক রহস্যলোকে নিয়ে যায় ওকে। এই হাসিটা কী ওর জন্মগত! যেদিন ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ধীমানের সেদিনও কী এই হাসিটা ছিল ওর ঠোঁটে? হয়তো। নাহয় ওর হাতে গড়া ঐ মূর্তিটায় এ হাসি আসবে কোথা থেকে। ঐ মূর্তিটা নিশ্চয় ওর মনের ভেতর গেঁথে রয়েছে।

বাস্তবে ফিরে আসে ধীমান। হাত নামিয়ে নেয়। বলে–

'যে কথাটা সেদিন বলতে পারিনি শুভ, ওটাই বলতে এসেছি।'

চোখ নামিয়ে নেয় সুভদ্রা। কথাটা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। তারপর বলে–

'ওটা না বলাই থাক, ধীমান।'

প্রাজ্ঞ ঠাকুর্দার সংস্পর্শে থেকে নিজের ভেতরও কিছুটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ধীমান। এটার কী অর্থ হতে পারে বুঝে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নেয় নিজেকে। চমকে ওঠে। কেন, এভাবে প্রত্যাখ্যান করবে কেন সুভদ্রা? কী কারণ হতে পারে এটার? উচ্চকুলজাত হিন্দু কোনো বালিকা নয় তো সে যে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানাবে। সকল প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে সুভদ্রার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে। কল্পনা করেনি যে এমন একটা আঘাত আসতে পারে ওর কাছ থেকে। একেবারে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে সে। কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারে না কিছু। অবশেষে বলে–

'কারণটা জানতে পারি, শুভ?'

আবার একটু সময় নেয় সুভদ্রা। তারপর বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নিশ্চয় পার ধীমান। এ ক'টা দিন সময় দিয়ে ভালোই করেছ। ঝাঁপ দেয়ার জন্য হয়তো প্রস্তুত হয়েই ছিলাম আমি। তারপর যখন ঐ শুভক্ষণে দু'জনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম তখনই আমাদের জীবনের পথ দুটো ভিন্ন হয়ে গেছে। এবং এখন মনে হয় ভালোই হয়েছে। বাস্তবতাকে বুঝতে পারব আমরা। হয়তো কিছুদিন খুব কষ্ট হবে ধীমান। কিন্তু জীবনটা তো কিছুদিনের জন্য না। হয়তো ক্ষণিকের। আবার হয়তো বা অনেকদিনের।'

কথাগুলো একনাগাড়ে বলে একটু থামে সুভদ্রা। কিছুই বলতে পারে না ধীমান। ওর কথার সবই যুক্তিভরা। ধীমান বুঝতেই পারে না যে সামান্য এই কুমোরকন্যা জীবন নিয়ে এত গভীর ভাবনা পেল কোথায়? তারপর নিজেই জবাবটা তৈরি করে। জীবনই মানুষকে শেখায় সবকিছু। যে একটা হপ্তা সময় পেয়েছিল সুভদ্রা তার পুরোটা সময় ভেবেছে এ নিয়ে। তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভাবার ঐ সময়টা না পেলে বিষয়টা অন্য রকম হতে পারত।

'আমার দিক থেকে এগিয়ে না আসার কোনো কারণ নেই ধীমান। পরিবারের দিক থেকেও হয়তো না। ওরা মনে হয় খুশিই হবে। কিন্তু তোমার পরিবারের বিষয়টা ভেবে দেখ ধীমান।'

'তোমার জন্য পরিবার ছেড়ে আসতে পারি আমি শুভ।'

'না, তা পার না। তোমার আবেগ এ মুহূর্তে এ কাজটা করিয়ে নেবে তোমাকে দিয়ে। কিন্তু ভবিষ্যত তোমাকে নিপিষ্ট করবে প্রতি পদে।'

'আমার দিকটা বাদ দাও শুভ। তোমার সমস্যাটা কী?'

'আমার সমস্যা, আমি নিচু জাতে জন্মেছি।'

'ওটা তো তোমার ইচ্ছেয় নয়।'

'হ্যাঁ, এ নির্বাচনটা করেছে প্রকৃতি। এখানে আমার কোনো হাত নেই।'

'না, প্রকৃতি এ নির্বাচনটা করেনি। প্রকৃতির কাছে সব মানুষ সমান। এ জাতভেদ মানুষের গড়া। এটা অস্বীকার করে তোমার কাছে এসেছি আমি।'

'এটা অস্বীকার করার ক্ষমতা তোমার আছে। ঐ সামর্থ্য হয়তো অর্জন করেছ তুমি। কিন্তু ওটা আমার নেই। আমি পারি না। নিচু জাতের অক্ষমতাটা তুমি বুঝবে না ধীমান।'

'আমি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শুভ। আমরা জাতিভেদ প্রথা মানি না।'

'হ্যাঁ, পেশাগত জাতিভেদ প্রথা হয়তো মানো না তোমরা। কিন্তু সামাজিক অবস্থানগত বিভেদটা এড়িয়ে যেতে পার না। সমাজে তোমার অবস্থান উচ্চ শ্রেণিতে আমার অবস্থান নিচু শ্রেণিতে। উঁচু শ্রেণির মানুষেরা উঁচু শ্রেণিতেই সম্পর্ক গড়ে। রাজার পরিবার অন্য আরেক রাজপরিবার বা রাজাসম পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে। সামন্ত অন্য সামন্তের সঙ্গে, তেমনি নিচের শ্রেণিগুলোও নিচের শ্রেণিতেই থেকে যায়। এটা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ হয়তো নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে করো না যে এসব বুঝি না আমি শুভ। এ সব জেনে বুঝে স্থির হয়েই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

'আমি জানি ধীমান। এজন্যই এ ক'টা দিন সময় নিয়েছ। এবং আমাকেও দিয়েছ।'

'এই কী তোমার শেষ কথা শুভ?'

'শেষ কথা বলে কিছু নেই এ পৃথিবীতে।'

'শুরুর আছে?'

'তা নিশ্চয় আছে।'

'আমাদের ভুলটা কোথায় শুভ?'

'শুরুতে।'

আর কিছু বলে না ধীমান। কিছু বলার নেই। নীল আকাশে তখন আলোহীন সাদা একটা চাঁদ। ওটার দিকে তাকিয়ে নিজেকেও দ্যুতিহীন নিষ্প্রাণ এক বস্তুপিণ্ড মনে হয়। ধীরে ধীরে ওখান থেকে ফিরে আসে ধীমান। আরও ক'টা দিন কাটিয়ে দেয় নির্জীবের মতো। তারপর অভিনন্দের সঙ্গে কথা বলে। সব কিছু খুলে বলে। গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলে। কোনোভাবেই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না সে এখানে। অভিনন্দের সঙ্গে পরামর্শ করে বিক্রমশীলা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ওখানে মহারাজ ধর্মপাল বিক্রমশীলা মহাবিহারের সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের মহাযজ্ঞকর্ম শুরু করেছেন। ওখানে যেয়ে কষ্টিপাথরের মূর্তি নির্মাণশিল্পে নিজেকে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় ধীমান। অভিনন্দ বলে যে মধুমথনের মতো স্বনামধন্য এক সেনাপতির পুত্র হয়ে সাধারণ শ্রমিকের মতো জীবন শুরু করতে পারে না সে। বৌদ্ধবিহারে শুধু ভিক্ষুরাই বাস করতে পারে। আর পারে ওদের ভৃত্যকুল। সে তো কোনো কুলেরই না। অবশেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছে ওরা যে দু'জনেই যাবে বিক্রমশীলা। তারপর নিজেদের ও মধুমথনের পরিচয় ব্যবহার করে যাহোক একটা কিছু করা যাবে। দূর থেকে তো কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ওরা।

আরও ক'দিন পর মানসিক অবস্থা কিছুটা থিতিয়ে এলে সিদ্ধান্ত নেয় আরও একবার সুভদ্রার সঙ্গে দেখা করবে ধীমান। এক সকালে যেয়ে দাঁড়ায় ওদের ঘরের দাওয়ায়। অবাক হয় ধীমান! সুভদ্রাকে দেখে মনেই হয় না যে এমন একটা কাণ্ড ঘটেছে। জীবন ওলটপালট হয়ে যাওয়ার মতো একটা ঘটনা ঘটেছে ওদের ভেতর। ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'কেমন আছ সুভদ্রা?'

'ভালো, তুমি?'

'হ্যাঁ, আমিও ভালো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক'দিন আসোনি যে?'

কী জবাব দেবে ধীমান। কিছুক্ষণ থেমে থেকে বলে–

'বিক্রমশীলা চলে যাচ্ছি, সুভদ্রা।'

কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না সুভদ্রার ভেতর। বলে–

'বাহ্, ভালোই তো।'

কথা আর এগোয় না। অনেকক্ষণ নীরব হয়ে থাকে দু'জনে। তারপর ধীমান বলে–

'ঐ মূর্তিটা কই সুভদ্রা?'

'কেন?'

'ওটা নিয়ে যেতে এসেছি।'

চুপ করে থাকে সুভদ্রা। ধীমান লক্ষ্য করে ওর মুখের সেই আশ্চর্য হাসিটা আর নেই। কিছুটা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে ধীমান। বলে–

'দাও ওটা সুভদ্রা, আমি যাই।'

একটু দৃঢ়তা ফুটে ওঠে সুভদ্রার মুখের রেখায়। বলে–

'ওটা নেই।'

'নেই মানে?'

'ভেঙে ফেলেছি ওটা আমি।'

আঁতকে ওঠে ধীমান।

'ভেঙে ফেলেছ?'

দৃঢ় স্বরে বলে সুভদ্রা–

'হ্যাঁ, ভেঙে ফেলেছি। মাটির পুতুল ভঙ্গুর। বিক্রমশীলা যেয়ে পাথরে প্রতিমা গড়ো। ওগুলো ভাঙবে না। ওগুলো পুজো পাবে বিত্তবানদের মন্দিরে। আমাদের মতো মানুষেরা মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ে। আবার ওগুলো ভেঙেও ফেলে। এভাবে বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করো ধীমান। এটাই বাস্তবতা।'

'পাথরের প্রতিমার শক্তি বা গুণ কী মাটির প্রতিমা থেকে বেশি?'

হেসে উঠে সুভদ্রা। ওর চোখেমুখে এখন অন্য হাসির ঝিলিক।

'প্রতিমার কোনো ক্ষমতা নেই ধীমান। এমনকি ধাতুর প্রতিমারও না। রাজরাজরাদের ঘরে থাকে স্বর্ণের প্রতিমা। ওদের কী কোনো ক্ষমতা আছে? ক্ষমতা তো রাজার। প্রতিমার না, ধীমান।'

অবাক হয় ধীমান। এই কী সেই সুভদ্রা, যার সঙ্গে মাত্র ক'বছর আগে কোনো এক কাশবনে পরিচয় হয়েছিল! এবং যার সঙ্গে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল অব্যাখ্যাত এক অন্তরঙ্গতা? এই সুভদ্রা যেন এক পূর্ণ নারী, যার প্রতিটা চিন্তা, প্রতিটা সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ভাবনাজাত। কোনো খামখেয়ালি নেই। ঐ সুভদ্রা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতটা পূর্ণতা পেল কখন? এই ক'দিনে কী? খেলাটা ভেঙে যাওয়ার পর? এই খেলাটা হয়তো শুরু হতো না যদি না ঠাকুর্দা ওকে একা এক বিশ্বে ঠেলে দিত। আর কোনো কথা বলে না ধীমান। বেরিয়ে আসে। যাবার সময় বলে–

'ভালো থেকো সুভদ্রা। বিদায়।'

'বিদায় ধীমান, বিদায়।'

সরাসরি বাড়িতে ফিরে আসে ধীমান। বিক্রমশীলা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকে। চেষ্টা করে সবকিছু ভুলে থাকতে। ঠাকুর্দার হাত ধরে যে জীবন শুরু হয়েছিল তা ফিরে পেলে হয়তো সব চেয়ে ভালো হতো। ওটাই ছিল স্বাভাবিক, প্রকৃতি প্রদত্ত। ঠাকুর্দার এই পাট্টক প্রধান হওয়া, বা ওকে এটা চাপিয়ে দেয়া, মানুষের গড়া, কৃত্রিম। এই কৃত্রিমতাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। আজ যদি ধীমানেরা শ্রেণিগত দিক থেকে আগের অবস্থানে থাকত তাহলে সুভদ্রার সঙ্গে সম্পর্কটা গড়ে তোলায় কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকত না। এই শ্রেণিগত বিভেদটাই মানুষের সম্পর্কগুলোয় সীমারেখা টেনে দেয়।

এ নিয়ে আর ভাবতে চায় না ধীমান। অভিনন্দের সঙ্গে কথা বলে বিক্রমশীলা যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করে। মনের ভেতর বয়ে বেড়ায় এক পাষাণ-ভার। দুঃখ হয় ওর হাতে গড়া ঐ মূর্তিটার জন্য। সুভদ্রার স্মৃতি হয়ে আজীবন সঙ্গে থাকতে পারত ওটা। কেন ভেঙে ফেলল সুভদ্রা? মনে মনে ভাবে, সে হয়তো চায়নি যে ওর কোনো স্মৃতি থেকে যাক ধীমানের জীবনে। হয়তো ভালোই করেছে। এসব ভেবে মাথা ভারি হয়ে উঠে। গভীর রাতে ঢলে পড়ে ঘুমের কোলে।

ক'দিন পর এক সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে ওর ঘরের দাওয়ায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা ঐ মূর্তিটা। চমকে উঠে ধীমান। তারপর যত্ন করে উঠিয়ে ঘরে এনে রাখে ওটাকে। মূর্তিটার চোখেমুখে সেই অলৌকিক হাসি! ওটাকে সামলে রেখে দৌড়ে যায় সুভদ্রাদের বাড়ি। অনেক ডাকাডাকি করেও সুভদ্রাকে পায় না। বেরিয়ে আসে ওর ছোটোবোন। ধীমানকে বলে যে সুভদ্রা বাড়ি নেই। কিছু বুঝতে পারে না ধীমান। ধীর পায়ে বাড়ি ফিরে আসে আবার।

অনেকরকমভাবে বিষয়টার ব্যাখ্যা দাঁড় করায় ধীমান। মূর্তিটা পাঠিয়ে সুভদ্রা কী ওর সম্মতি প্রকাশ করল? না, তাও হয়তো না। সেক্ষেত্রে ওর সঙ্গে দেখা করত সুভদ্রা। মাথাটা বোধ হয় খারাপই হয়ে যাবে ধীমানের। আজকের রোদও উঠেছে আকাশ ফাটিয়ে। বাতাসে চৈত্রের হল্কা। একটু পরে ওকে ডেকে পাঠায় অভিনন্দ। ওখানে যেয়ে শোনে বিক্রমশীলার পথে বেরোতে হবে আজ দুপুরের পর। পথিমধ্যে এক আত্মীয়বাড়িতে রাত কাটিয়ে আগামী সকালে আবার যাত্রা শুরু। এখান থেকে নদীতীর পর্যন্ত যেতে হবে ঘোড়াটানা গাড়িতে। তারপর নদী পেরিয়ে আত্মীয়বাড়ি। এরপর আবার ঘোড়ার গাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরতে হবে বিক্রমশীলা যাওয়ার পথ। ধীমান প্রস্তুত রয়েছে জানিয়ে ঘরে ফিরে আসে। মাটির মূর্তিটাকে যত্ন করে সূতিবস্ত্রে পেঁচিয়ে সঙ্গে নেয় ওর। মূর্তিটার মুখের আশ্চর্য হাসিটা মনে হয় সুভদ্রারই। মূর্তিটার ঠোঁটে, চোখে ঠোঁট ছোঁয়ায় ধীমান। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে এ হাসির রহস্য একদিন উদঘাটন করবেই সে।

রাজা গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক বাংলা রাজ্যটি সুরক্ষার ভার স্বভাবতই মহারাজ ধর্মপালের হাতে এসে পড়েছে। জীবিতাবস্থায় গোপালদেব সমগ্র বাংলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছিলেন। কূটকৌশলেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগ্রাসন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেন তিনি। পুত্র ধর্মপালের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের কন্যা রন্নাদেবীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিক নিয়ে মনে হয় খুব বেশি চিন্তিত ছিলেন না গোপালদেব। কিন্তু দক্ষিণের চোলরাজাদের বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে যান পুত্র ধর্মপালকে। শতবর্ষব্যাপী মাৎস্যন্যায়ের অরাজকতার কালে বাংলার দক্ষিণের বৎসরাজ রক্তের গঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন এখানে। ধুলায় লুটিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার রাজছত্রগুলো। বৎসরাজের পদদলিত এই ভূখণ্ডটাকে আবার মাথা উঁচিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন গোপালদেব। দক্ষিণের রাজাদের গাত্রদাহের কারণ এখন এই পালরাজ্যের উদ্ভব। মহারাজ ধর্মপালের মাথার ভেতরও রয়েছে এ বিষয়টা। শুরুতে ওদিকটা ঘাঁটাতে ইচ্ছা করেন না তিনি। অপেক্ষাকৃত সহজ, উত্তর-পূর্ব দিকে এ বছর অভিযান চালিয়ে বাংলা ও বিহার অঞ্চলে একটা স্থায়ী শান্তি ও শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। তাঁর এই ইচ্ছাপূরণে বাংলা ও বিহারের একাধিক মন্ত্রী ও অমাত্যের অকৃপণ সহায়তা পেয়েছেন। একজন সফল নৃপতির জন্য খুব মূল্যবান এটা।

মহারাজ ধর্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই আবার উত্তরভারতের আধিপত্য নিয়ে দক্ষিণের রাষ্ট্রকূট ও পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার রাজাদের সঙ্গে পারস্পরিক সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলার এদিকটায় শক্তিশালী কোনো রাজা ছিল না দীর্ঘদিন। সেই সুযোগে পশ্চিম ও দক্ষিণদেশীয়রা এদেশের মাটি রক্তরঞ্জিত করেছে বারবার। এমনকি কাশ্মীররাজও এদেশটাকে কিছুদিনের জন্য হলেও পদানত করে রেখেছিলেন। যে শক্তিমত্তা নিয়ে এখন আবির্ভূত হয়েছেন মহারাজ ধর্মপাল, তাতে বাংলা নয়, উত্তরভারতে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম সামনে চলে এসেছে।

যথেষ্ট প্রস্তুতি না নিয়ে এ বছর মহারাজ ধর্মপাল উত্তরভারতের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চান না। পালরাজাদের বড় শক্তি হাতিবাহিনীর শক্তি বাড়ানোয় মনোনিবেশ করেন তিনি। উত্তর থেকে সরাসরি নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র যেখানে গঙ্গায় মিশে আবার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে নেমে গেছে তার পূর্ব দিকটা, ও উত্তরপূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিক থেকে নেমে আসা মেঘনাদের পশ্চিম দিক পর্যন্ত মিলিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরে যে একটা ত্রিভূজ তৈরি হয়েছে সেখানে সৈন্য সমাবেশের আদেশ দেন ধর্মপাল। ইতোমধ্যে একটা শক্তিশালী নৌসেনাদলও যুক্ত হয়েছে ধর্মপালের রণবহরে। গতবছর মধুমথনকে দিয়ে যে অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি করিয়েছিলেন মহারাজ তা সম্প্রসারিত হয়ে এখন বড় ধরনের একটা যুদ্ধে অংশ প্রহণ করার মতো সৈন্যবাহিনী হয়ে উঠেছে। রাজ্যের প্রতিরক্ষার জন্য দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী ও চৌকশ পদাতিক বাহিনীর প্রায় পুরোটা রাজধানীতে রেখে নৌবহর ও হাতিবাহিনীর একটা অংশ নিয়ে প্রাগজ্যোতিষ অভিমুখে রণযাত্রা শুরু করার আদেশ দিয়েছেন তিনি। প্রকৃতপক্ষে এটা ওরকম কোনো যুদ্ধযাত্রাও না। উত্তরভারতে আগামী বছরের জন্য পরিকল্পিত যুদ্ধযাত্রার একটা মহড়া বলা যেতে পারে। একই সঙ্গে প্রাগজ্যোতিষের রাজাকে একটু সাবধান করে দেয়া যেন সুযোগ বুঝে বাংলার মাটিতে পা রাখার সাহস আর কখনো না হয় ওদের। পিতাজি গোপালদেব পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে এই প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যটি বাংলার মানুষদের যথেষ্ট ভুগিয়েছে। বাংলার জনপদগুলো মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি এই রাজা মহাশয়। বাংলার ছোটো ছোটো সামন্তরাজাদের দুর্বলতার সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এটার পুনরাবৃত্তি না ঘটা নিশ্চিত করা মহারাজের উদ্দেশ্য। সৈন্যদলের শীতকালীন মহড়াটা দেখাও তাঁর জন্য বিশেষ জরুরি। নিজেদের শক্তিমত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে উত্তরভারতের সঙ্গে যুদ্ধটায় জড়াতে চান তিনি।

বাংলার পুবদিকে সৈন্য এগিয়ে নেয়া এক ঝকমারি। যত পুবে যাওয়া যায় তত খানাখন্দ, জলে ডোবা নিচু জমি, খালবিল জালের মতো ছড়িয়ে থাকা নদীনালা, বিশাল সব হ্রদ, যেগুলোর একূল-ওকূল দেখা যায় না, সমুদ্রের মতো জুড়ে থাকে পুরো দিগন্ত। শক্তিশালী একটা নৌবাহিনী প্রয়োজন এমন অঞ্চল বশে রাখার জন্য। তাছাড়া তাম্রলিপ্তি বন্দর দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্য নৌপথের সুরক্ষা দিতে হয়। বড় আকারের নৌবাহিনীর প্রয়োজন অনেকভাবে রয়েছে। পুবদেশের মাটি অবশ্য সোনায় মোড়ানো। বর্ষার জল নেমে গেলে শুকনো মওসুমে যে একটা ফসল ফলে তাতে সমগ্র উত্তরাবর্তের প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলা যায়।

দেশটার খুব বেশি পুবদিকে যাওয়া সম্ভব হয় না এখন। হ্রদগুলোর পানি শুকায়নি এখনও। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই ধর্মপালের। অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে মধুমথনকে আগেই উত্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রাগজ্যোতিষের দক্ষিণ ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিকে ত্রিকোণ অঞ্চলটায় একটা স্থায়ী হাতিবাহিনী নিয়োজিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ধর্মপাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধুমথনকে পরিকল্পিত এই সেনাদলের প্রধান সেনাপতি হিসেবে মনোনীত করেছেন তিনি।

রাজকীয় নৌবহর গঙ্গা পেরিয়ে রামাবতী পৌছালে দু'শ হাতির বিশাল বাহিনী নিয়ে মহারাজকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নদীতীরে এসে উপস্থিত হয়েছে মধুমথন। তাঁর অধীনে দশ হাজার সৈন্যের একটা পদাতিক বাহিনীও রয়েছে। গঙ্গা নদী পেরিয়ে এসে বিপুল সবুজের সমারোহ দেখে মোহিত হন মহারাজ ধর্মপাল। মধুমথনকে বলেন–

'আমার যে এখানেই রাজধানী গড়ে বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে মধুমথন।'

'মহারাজের আদেশের অপেক্ষা শুধু। বলুন কবে কখন থেকে এটা যাঞ্চা করেন।'

হেসে উঠে ধর্মপাল।

'জানি মধুমথন। আমার ইচ্ছাপূরণে যথাসাধ্য করবে তুমি। কত ইচ্ছাই তো হয় মানুষের, সবই কী পূর্ণ হয়। আমিও তো মানুষ, সেনাপতি।'

চুপ করে থাকে মথুমথন। চার ঘোড়ায় টানা রাজকীয় শকট প্রস্তুত রয়েছে মহারাজকে স্থানীয় সামন্তরাজের প্রাসাদে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সামন্তরাজ মহাদেব এসে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর দিকে তাকিয়ে বলেন ধর্মপাল–

'কী সমাচার রাজা মহাদেব?'

'মহারাজের কৃপায় সব ভালো।'

'রাজ্যের প্রজাগণ?'

'সবাই সুখে ও শান্তিতে আছে মহারাজ।'

'চমৎকার।'

'মহারাজের চরণে নিবেদন, এই অধীনের কুটিরে পদধূলি দিতে যদি কৃপা করেন. . .'

'কৃপা কেন রাজা মহাদেব, আপনার আতিথ্য সানন্দে গ্রহণ করছি আমি।'

'আজ্ঞা করুন মহারাজ।'

'চলুন রাজা মহাদেব।'

রাজকীয় শকটে উঠে বসেন মহারাজ ধর্মপাল। কিছুক্ষণের মধ্যে চোখে পড়ে সামন্ত রাজার প্রাসাদ। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণটি সত্যিই বিশাল। রাজকীয় বৈভব পুরোপুরি প্রকাশ করে মূল তোরণটি। ওটার ভেতরে ও বাইরে আরও অনেক ক'টা অস্থায়ী তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে একহাড়া গাছ, বাঁশ ও বিভিন্ন ফুল লতা পাতা সাজিয়ে। থেকে থেকে উলুধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায় মেয়েরা। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে শত শত নারীকণ্ঠের উলুধ্বনি ও মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি, ঢোলক ও কংস্যের সম্মিলিত অর্কেস্ট্রা মহারাজের আগমন অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে। প্রাসাদে প্রবেশের মুখে সুসজ্জিত দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারি পদাতিক সৈন্য, দুই সারি অশ্বারোহী সৈন্য ও ঝলমলে মস্তকাবরণে সজ্জিত দুটো ঐরাবত হাঁটু গেড়ে রাজপ্রণাম জানায়।

সব দেখেশুনে মুগ্ধ ধর্মপাল। পুবদেশের এই মানুষগুলো সত্যিই আতিথেয়তা জানে। অতিথির মর্যাদা দেয়া এদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। অথচ এই মানুষগুলোকেই ভিনদেশী বিভিন্ন রাজারা অত্যাচার করে বারবার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়!

মহারাজকে স্বাগত জানানোর সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে বিশ্রাম ও আহারের জন্য প্রাসাদের ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়। এই অভিযানপর্বে মহারাজ কিছু কিছু প্রশাসনিক কাজকর্মও সেরে নেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। একশো বছরেরও আগে রাজা শশাঙ্ক যে প্রশাসনিক কাঠামো এখানে নির্মাণ করেছিলেন মাৎসান্যায়ের কালে তা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল। পিতাজি গোপালদেব সেসবের কিছুটা সংস্কার করে মোটামুটি একটা প্রশাসনিক কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। তা দিয়ে হয়তো একটা রাজ্যের কাজ চালানো যেতে পারে। কিন্তু বাংলা মগধ ও উত্তরভারতের অন্যান্য রাজ্য নিয়ে একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার যে স্বপ্নে বিভোর মহারাজ ধর্মপাল তার জন্য যথোপযোগী প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে। সৈন্য ও অর্থবল যা রয়েছে তাঁর তাতে আশপাশের রাজ্যগুলো হয়তো দখলে নেয়া সম্ভব। কিন্তু একটা রাজ্য জয় করা যত কঠিন, তার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন এই জয়টাকে ধরে রাখা। এটার স্থায়ী রূপ দেয়া। এজন্য প্রয়োজন একটা শক্তিশালী প্রশাসনিক কাঠামো যেন অধীনস্ত রাজাদের শৃঙ্খলার ভেতর রাখা যায়। প্রজাগণকে যথাযথ নিরাপত্তা দেয়া ও ওদের সুখশান্তি নিশ্চিত করা যায়। এই যুদ্ধ মহড়ায় সৈন্যদল যেমন রয়েছে মহারাজের সঙ্গে তেমনি তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদও রয়েছে। রাজধানীর বাইরে অবস্থান করে কিছু নিভৃত সময় পাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। আলাপ-আলোচনা করে একটা প্রশাসনিক কাঠামোর স্থায়ী রূপ তৈরি করতে হবে। ধর্মপালের মাথায় রয়েছে গুপ্তরাজাদের প্রশাসনিক কাঠামোটি। ওটার কার্যকারিতা ঐ সময় ছিল লাগসই। ওটার অনুসরণ করে একটা অধিকতর কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করা ধর্মপালের লক্ষ্য।

আদর্শগত দিক থেকে মহারাজ ধর্মপাল রাজা শশাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গি শ্রদ্ধা করেন। মগধ ও বাংলা অঞ্চলটি ভারতবর্ষের মধ্যে অবশ্যই একটা স্বতন্ত্র অঞ্চল। এটার নিজস্ব প্রকৃতি রয়েছে। সংস্কৃতি ও ভিন্ন জীবনধারা রয়েছে। গুপ্তরাজবংশ যদিও কয়েকশো বছর এদেশে রাজত্ব করেছিল কিন্তু এদেশের স্বকীয়তা কখনো ক্ষুণ্ন হয়নি। একটা সুপ্রাচীন লৌকিক সংস্কৃতি রয়েছে এ অঞ্চলের। যার মূল সৌন্দর্য এর নমনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা। খুব সহজে ভিন্ন সংস্কৃতিকে আত্মীকরণ করে নিজস্বরূপে বদলে একটা অন্য মাত্রা সৃষ্টি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে এটা। মানুষের এই আশ্চর্য চরিত্রগুণটাকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে মহারাজ ধর্মপাল। এদেশের মানুষের রয়েছে শিল্পের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও মানবিক মহানুভবতা। এখানে শিক্ষার প্রসার ও শিল্পকর্মের সমৃদ্ধি খুব সহজে সম্ভব। গুপ্তরাজাদের সময়ে গড়ে ওঠা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার প্রতি যে অনুরাগ তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। এদের ভাস্কর্য, বিশেষ করে পোড়ামাটির শিল্প ও কষ্টিপাথরের স্থাপত্য ও মূর্তিনির্মাণ শৈলীর মধ্যে মানুষগুলোর অপরিমেয় মেধার সন্ধান পাওয়া যায়। এদের ধর্মীয় আদর্শও প্রশংসনীয়রকমভাবে নমনীয়। বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন, লৌকিক প্রভৃতি ধর্মের সহজ সহাবস্থান মানুষের এক উচ্চতর মনোভঙ্গির স্বাক্ষর রাখে। মানুষের এই সহনশীল মনোবৃত্তি সত্যিই প্রশংসনীয়। এই মানুষগুলোর সমন্বয়ে ভারতবর্ষে একটা স্বতন্ত্র রাজ্যপাট গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর ধর্মপাল। গুপ্তরাজাদের প্রশাসনিক কাঠামোটা খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ধর্মপাল। ওটার সংস্কার করে এই রাজ্যটাতে আরও উন্নততর প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করতে হবে ওদের। রাজা শশাঙ্কের সুশাসন ও যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যথাযথ উত্তরাধিকারী ও পরবর্তী রাজা বা শাসক তৈরি করতে না পারায় এ অঞ্চলটা ঐ একশো বছরে প্রকৃতপক্ষে হাজার বছর পিছিয়ে গেছে। এ অঞ্চলের যে চারটি রাজ্য মিলিয়ে রাজা শশাঙ্ক একটা স্বাধীন বাংলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা এই একশো বছরে হয়তো সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। রাজা শশাঙ্কের ঐ ভুলটা দ্বিতীয়বার করতে চায় না ধর্মপাল। রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো যদি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যায় এবং ওটা যদি হয় সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ও কার্যক্ষম তাহলে যে-কোনো পরিস্থিতি সামলে উঠা সম্ভব। মহারাজ ধর্মপালের সামনে এটা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আজকের দিনটা বিশ্রাম নেয়ার পর আগামী কাল থেকেই মন্ত্রী, সামন্ত ও মহাসামন্তদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন মহারাজ।

বছরের এ সময়ে বঙ্গ ও সমতটে সুমিষ্ট ফলমূলের এত প্রাচুর্য ঘটে যে মানুষেরা এসময়টাকে মধুঋতু বলে। জলবাতাসও থাকে নাতিশীতোষ্ণ। প্রাতরাশ সেরে মহারাজ ধর্মপাল রাজা মহাদেব সহ হাতির বহর নিয়ে বেরিয়ে পড়েন রাজ্যটা একটু ঘুরে দেখার জন্য। মহানন্দা নদীর তীরে অপরূপ এই রাজ্যটা যত দেখেন ততই মুগ্ধতায় মন ভরে উঠে তাঁর। মনে মনে ভাবেন অধীনস্ত রাজাদের হাতে আরও ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে ওদেরকে প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে দিলে প্রজারা যেমন সুখে থাকবে তেমনি রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটবে। শুধু যা প্রয়োজন, তা হলো রাজাদেরকে কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখা, আজ্ঞাবহ রাখা, বশ্যতা অস্বীকার করার মতো কোনো কারণ যেন না ঘটে তা লক্ষ্য রাখা। একজন রাজা সব সময় সব দিক দেখে রাখতে পারেন না। তাঁর চাই শত সহস্র বিশ্বস্ত অনুচর। রাজ্যগুলোয় বিশ্বস্ত রাজা নিয়োগ করতে পারলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের সমন্বয়ে একটা বড় আকারের সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়তো তেমন কঠিন কিছু না। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ধর্মপাল একজন যোগ্যতাসম্পন্ন মন্ত্রী নিয়োগ করার জন্য। ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজকার্য প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রবীণ গার্গ মহাশয় মহামন্ত্রী হিসেবে নিশ্চয় যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন। প্রাগজ্যোতিষের এই অভিযানে তাঁকেও সঙ্গী হিসেবে রাখা হয়েছে। দুপুরের আহারের পর একটা অধিবেশন ডাকার আদেশ দেন মহারাজ।

রাজা মহাদেবের আমন্ত্রণে আশপাশের ছোটোবড় সব সামন্তরাজারাও মহারাজের নিকট তাঁদের প্রণাম জানাবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর সামন্তরাজাদের একে একে জিজ্ঞেস করেন তাঁদের প্রজাসাধারণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা বিষয়ে। দক্ষিণ দেশের এক সামন্তরাজা তাঁর রাজ্যের অভাব অভিযোগের বিষয় তুলে ধরলে ধর্মপাল জিজ্ঞেস করেন–

'সামন্তরাজ মহাশয়, বাৎসরিক আয় কত আপনার?'

প্রশ্নটির সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যায় সে। আমতা আমতা করে বলে–

'প্রভু মহারাজ, রাজ্যের আয় প্রতি বছর একই রকম থাকে না। গত কয় বছর ধরে প্রতি বছর ফসলহানি হচ্ছে। প্রজা সাধারণ খাজনা দিতে পারে না। রাজ্যের আয় হবে কোথা থেকে। সৈন্যদের রসদ জোগানো সম্ভব হচ্ছে না। কোষাগার প্রায় শূন্য। পার্শ্ববর্তী সামন্তদের কাছ থেকে ঋণ করতে হচ্ছে মহারাজ।'

'বুঝলাম সামন্ত মহাশয়। অনেক সমস্যা রয়েছে আপনার। ফসল না পেলে প্রজারা বাঁচে কী খেয়ে?'

'ভীষণ অভাবে দিন কাটে ওদের। অনেক গ্রাম শূন্য হয়ে যায়। পরবর্তী ফসল মওসুমে চাষাবাদের জন্য রায়ত কৃষক খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।'

'তাহলে তো মহাশয় আপনার কোষাগার আর সৈন্যদের রসদ জোগানোর আগে ওদের বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার। আপনার প্রজারা সুখে-শান্তিতে না থাকলে আপনার সমৃদ্ধি আসবে কোথা থেকে?'

হাত কচলাতে থাকে ঐ সামন্তরাজা। আবার জিজ্ঞেস করেন ধর্মপাল–

'এ বিষয়ে আপনার কী কোনো ভাবনা আছে? সমস্যাটা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কী রাজা মহাশয়?'

'আজ্ঞে মহারাজ, এই অধীন এমনই এক নিস্ফলা রাজ্যের সামন্ত যে কোনোভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'আপনার রাজ্যে কী কোনো বছরই ভালো ফসল জন্মায় না?'

'তা নিশ্চয় জন্মায় মহারাজ।'

'তাহলে ঐ বৎসর খাদ্যশস্য মওজুদ করেন না কেন?'

'তা দিয়েই তো কোনোভাবে সৈন্যদলের রসদ জুগিয়ে যাই।'

'এ পরামর্শটা আপনার প্রজাদেরও দেন না কেন। যে বছর ফসল ভালো হয় সে বছর সব খেয়ে না ফেলে দুঃসময়ের জন্য কিছুটা সঞ্চয় যেন করে।'

'দুঃসময় এদেশে প্রতি বছরই আসে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে ঐ দুঃসময়টার জন্যই প্রস্তুতি রাখেন না কেন?'

'প্রজাসাধারণ নিতান্তই দরিদ্র মহারাজ। শক্তপোক্ত, শুকনো গোলাঘরও নেই ওদের। অতিরিক্ত ফসল বেশিদিন মওজুদ রাখতে পারে না। এখানের জলবাতাস খুব আর্দ্র। গেজিয়ে যায় ওগুলো। পরের বছর আবাদের জন্য বীজধান সংগ্রহে রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। খাবার ধান ওরা মজুদ রাখবে কীভাবে?'

'ধানগুলোকে চাল করে রাখলে তো মনে হয় গেজাবে না।'

'ফসল মওসুমে এত ধান চালে রূপান্তর করার মতো শ্রমশক্তি থাকে না প্রভু মহারাজ।'

একটু যেন ভাবনায় পড়েন মহারাজ। কিছুটা সময় নেন। তারপর বলেন–

'এদেশে যখন গুপ্তরাজাদের শাসন ছিল তখন ওরা অভাবের সময় খাদ্যশস্য ঋণ হিসেবে দিত প্রজাদের। তারপর ফসল উঠলে আবার ফিরিয়ে নিত। প্রজারা যখন খাদ্য মজুদ করতে সক্ষম হয় না, তখন আপনারাই ওটা করেন না কেন? আপনার রাজ্যে স্থায়ী খাদ্যগুদাম নির্মাণ করেন যেন যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুদ রাখা যায়। প্রজাদের প্রয়োজনে ঐসব ধার দিয়ে আপনিও কিছুটা সুবিধা নিতে পারেন।'

বিষয়টা সবার মনোপুত হয়। রাজকোষাগার থেকে ঐ সামন্তকে অর্থ বরাদ্দের জন্য আদেশ দেন মহারাজ। আগামী ফসল মওসুমের আগেই কোনো একটা উঁচু ও শুকনো জায়গায় স্থায়ী খাদ্যগুদাম নির্মাণের জন্য পরামর্শ দেন। পরবর্তী দুটি ফসলের পর অতিরিক্ত খাজনা হিসেবে গুদামের জন্য বরাদ্দ দেয়া এই ঋণ ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন। দু'বছর পর এটার ফলাফল মহারাজকে যেন অবহিত করা হয়। এই উদ্যোগ শুভ ফল এনে দিলে অন্যান্য রাজ্যেও এটা সম্প্রসারিত করা হবে বলে জানান মহারাজ ধর্মপাল।

এরপর অন্যান্য সামন্তদের অভাব অভিযোগ সব শোনেন। রাজ্যের হিন্দু সামন্তরাজাদের আবেদনক্রমে মন্দির নির্মাণের জন্য রাজকোষাগার হতে অর্থ বরাদ্দ করেন। রাজ্য প্রশাসনের সুবিধার্থে মহামন্ত্রী গার্গ মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে বিভিন্ন প্রশাসনিক অঞ্চল সৃষ্টি করার আদেশ দেন। প্রতিটা রাজ্যের উচ্চ স্তরের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে নিম্ন পর্যায়ক্রমে ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল, এই তিন ভাগে বিভক্ত করার নির্দেশ দেন। নিম্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে খণ্ডল, ভাগ, অবৃত্তি, চতুরক ও পাট্টক, এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। নিম্ন হতে উচ্চ, পর্যায়ক্রমে প্রতিটা প্রশাসনিক প্রধান উচ্চতর প্রশাসকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। রাজকীয় উচ্চ আদালত হতে শুরু করে মাটিলগ্ন নিম্নকক্ষ পর্যন্ত সবকিছুকে প্রশাসনের আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মহারাজ যেন ভবিষ্যতে কখনো কোনো রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিতে না পারে। রাজার অধীনস্ত ও অধীনস্তদের অধীনস্তরা পর্যায়ক্রমে সন্নিবিষ্ট

দেবপাল-৫দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। এসব বিষয়ে আলোচনা শেষ হওয়ার পর মহামন্ত্রী ও সেনাপতিদের নিয়ে একান্তে আলোচনায় বসেন মহারাজ ধর্মপাল। প্রথমেই জিজ্ঞেস করেন হাতিবাহিনীর প্রধান তারকানাথকে–

'সেনাপতি তারকানাথের হাতিবাহিনীর বিশদ বর্তমান জানাবেন, মহাশয়?'

'আজ্ঞে প্রভু, সবই শুভ সংবাদ।'

'বিলক্ষণ, তবে তো সব শুনতেই হয়।'

'মহারাজের হাতিবাহিনীতে আরও চারশো হাতি যোগ হয়েছে।'

'বাহ্।'

'প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই চারশো ছাড়াও আরও হাজারখানেক হাতি প্রশিক্ষণ পর্যায়ে রয়েছে যেগুলো খুব শীঘ্র হাতিবহরে যোগ দেবে।'

'এসব হাতি প্রশিক্ষণের রাহাখরচ কেমন হয়, সেনাপতি মহাশয়?'

'তা একটু বেশিই প্রভু মহারাজ।'

'আমার কাছে যে হিসেব আছে তা দিয়ে কম করে হলেও কয়েকশো সৈন্যের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব।'

'তা হয়তো সম্ভব মহারাজ। কিন্তু একটা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি কলাগাছ ছাড়া আর কিছু খায় না। মাসকাবারী তনখাও চায় না।'

সেনাপতির কথায় সবার ভেতর হাসির দমক ওঠে। মহারাজও যোগ দেন ঐ হাসিতে। কৌতুক করে বলেন–

'তা আপনার হাতিগুলো কী তীর ধনুক বর্শা চালাতে জানে সেনাপতি মহাশয়?'

আবার হাসির ফোয়ারা উঠে আসরে। মহারাজ ধর্মপালের রসবোধের প্রশংসা করে সবাই। আসর শান্ত হলে সেনাপতি বলে–

'আমার হাতিগুলোর তীর ধনুক ছোঁড়ার প্রয়োজন হয় না মহারাজ। বজ্রনিনাদ করে সামনের দিকে সোজাসুজি একটা দৌড় লাগালেই হয়। প্রতিপক্ষের সৈন্যেরা পর্বত এগিয়ে আসতে দেখে ভয়েই ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপর হাতির হাওদায় বসে থাকা সৈন্যেরা বর্শা দিয়ে ওদের গেঁথে ফেলে।'

'আচ্ছা বলুন তো সেনাপতি মহাশয়, শক্তির দিক থেকে একটা হাতি প্রতিপক্ষের কতজন সৈন্য ঘায়েল করতে পারে?'

'আমাদের হিসেব মতো দুশো। প্রতিপক্ষের কুড়ি হাজার সৈন্যদলকে আমাদের একশো হাতি ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারে। বাকি কাজটা পদাতিক সৈন্যেরা খুব দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। হাতিবাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে প্রতিপক্ষের সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়া, ওদেরকে আতঙ্কিত করে তোলা, ওদের ভেতর ত্রাসের সৃষ্টি করা, মহারাজ তো জানেনই সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিলে, ওদের ভেতর ভয় ঢুকে গেলে, যুদ্ধটা আর করতে পারে না ওরা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হয়তো জানি মহাশয়। কিন্তু আপনার হিসেবটার সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারলাম না। আপনি বরং প্রস্তুতি নিন প্রতিপক্ষের একশো সৈন্যের জন্য একটা হাতি হিসেবে। আমাদের হাতির সংখ্যা বাড়ানো দরকার। হাতিগুলোকে আরও ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। সব বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এগোতে চাই আমরা। আমাদের হাতিবাহিনীকে ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই, সেনাপতি মহাশয়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আমাদের হাতিগুলো কী ঢাল ব্যবহার করে সেনাপতি?'

'না মহারাজ। ওদের মস্তকাবরণ আছে।'

'সে-জন্যই জিজ্ঞেস করেছি সেনাপতি। ওটাকে যথেষ্ট মনে হয় না আমার। মস্তকাবরণটাকে আরও দীর্ঘ করার ব্যবস্থা করুন। এমনকি প্রস্থেও আরও বাড়ানো যায় কিনা দেখুন। কান দুটোর সুরক্ষাও প্রয়োজন। নিজে কামারশালায় যান। আরও উন্নতমানের লোহা ব্যবহার করা যায় কীনা পরীক্ষা করে দেখুন। ওটাকে আরেকটু হালকা করার পরও যদি প্রতিপক্ষের তীর ফেরাতে পারে তাহলে আরও হালকা করুন যেন হাতিগুলো ওটাকে বোঝা মনে না করে এবং সহজে দৌড়াতে পারে।'

'আজ্ঞে মহারাজ। সব ব্যবস্থা হবে।'

'প্রয়োজনে ভালো লোহা সংগ্রহের জন্য ব্যবস্থা নেবেন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আপনাদের প্রশিক্ষণ শিবিরে যেতে পারি একদিন সেনাপতি?'

'শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা মহারাজ। মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে দিন ঠিক করে নেব মহারাজ।'

'ঠিক আছে সেনাপতি।'

দীর্ঘ অধিবেশন শেষ করেন মহারাজ ধর্মপাল। মহারাজের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রাজা মহাদেবের ভোজপর্বের আয়োজন দেখে বিস্মিত হন তিনি। ভোগবিলাসের এত প্রাচুর্য দেখে মনে মনে ভাবেন, এদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ আগামী বছর বাড়িয়ে দিতে হবে। তারপরই আবার ভাবেন, না, ঐ চাপটা তাহলে বরং প্রজাদের কাঁধেই নামিয়ে দেবে সুচতুর এই সামন্তরাজাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫

যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় থেমে প্রায় হপ্তাখানেক পর বিক্রমশীলা পৌঁছায় অভিনন্দ ও ধীমান। জায়গাটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় ওরা। অভিনন্দকে জানিয়ে দেয় ধীমান যে এখানেই থেকে যাবে সে। মহারাজ ধর্মপালের আদেশে বিক্রমশীলা মহাবিহার নির্মাণের কাজ তখন এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। ধীমানকে কাজে লাগানো যায় এমন একটা সূত্র কোনোভাবেই খুঁজে বের করতে পারে না অভিনন্দ। এদিকে নিজ গ্রামে ফিরে যেতে হবে ওকে খুব শীঘ্র। শীত মওসুম আসতে শুরু করেছে। উত্তরাঞ্চলের শীত মোষের হাড়েও কাঁপন ধরায়।

শেষ পর্যন্ত ধীমান নিজেই খুঁজে পায় ওর কর্মসংস্থান। মগধের এক প্রতিমা নির্মাণশিল্পীর সহকারী গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাজ ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেখানে নিয়োগ পায় ধীমান। খুশি মনে ঘরে ফিরে যায় অভিনন্দ।

প্রায় একশো একর জমির উপর নির্মাণ করা হয়েছে বিক্রমশীলা মহাবিহার। অন্তিচকের চারপাশের সবগুলো গ্রাম জুড়ে এর নির্মাণশ্রমিক ও শিল্পীদের বসবাস। ধীমানের জন্য নতুন আবাস গড়ে দেন ওর গুরু তারানাথ। আবাসটি তারানাথের ঘরের লাগোয়া। বাড়িটার বিশাল প্রাঙ্গণের এক দিকে ওর শিল্পনির্মাণ ঘর। কষ্টিপাথরের মূর্তি গড়ার কারিগর সে। ধীমানের সঙ্গে নিয়ে আসা পোড়ামাটির মূর্তিটি দেখে সে খুব আগ্রহ নিয়ে। ইচ্ছে প্রকাশ করে কষ্টিপাথরে ওটার একটা প্রতিরূপ তৈরি করে ধীমান। টেরাকোটার কয়েকটা শ্লেটও বয়ে এনেছে ধীমান। ওগুলোর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ওর গুরু তারানাথ। মহাবিহারের দেয়াল অলঙ্করণের একটা অংশের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও রয়েছে তারানাথের। ধীমানকে জানায় যে সে যদি টেরাকোটার কাজ করতে চায় তাহলে ওকাজটা ওকে দিয়ে করিয়ে নেবে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সানন্দে সম্মতি জানায় ধীমান।

ধীমানের কাজের জন্য বিশাল একটা দোচালা ঘর নির্মাণ করে দেয় তারানাথ। তার সামনে, পূর্ব ও পশ্চিম, দুদিক খোলা বড়ো একটা আঙ্গিনা তৈরি করে দেয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্মাণ শ্রমিক নিয়োগ করে ওর অধীনে। টেরাকোটা শিল্পের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয় ধীমানের শিল্পনৈপুণ্যে। মহামতি বুদ্ধ ও তাঁর অনুসারীদের আদলই কেবল ফুটিয়ে তোলে না ধীমান, মাছ পাখি ও গ্রামীণ অন্যান্য অনুষঙ্গও ফুটিয়ে তোলে। ওর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ ধর্মপালের সুনজরে নিয়ে আসে ওকে তারানাথ। শিল্পকর্মে নিজেকে ডুবিয়ে রেখে সুভদ্রার কথা সারাদিন ভুলে থাকে ধীমান। কিন্তু রাত্রি এলে পিদিমের আলোয় মাটির ঐ মূর্তিটার সামনে স্থির হয়ে বসে থাকে। বুকের ভেতর চেপে থাকা দুঃখভার সরিয়ে রাখতে পারে না সে কোনোভাবে। কখনো কখনো মনে হয় গ্রামে ফিরে যেয়ে আরেকবার সুভদ্রার কাছে ওর ভালোবাসা ভিক্ষে চাইবে। কিন্তু নিজেকে অতটা তুচ্ছ করতেও মন সায় দেয় না।

চালচুলো না থাকায় ধীমানের আহারাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে ওর গুরুগৃহে। গুরু তারানাথ নিঃসন্তান। গুরুপত্নী সুলক্ষণা দেবী অপরূপ সুন্দরী। মায়ের মতো স্নেহ করে ধীমানকে। সুলক্ষণা দেবীর সুতন্বী নামে একটি পালক কন্যা রয়েছে। এই পালক কন্যাটির পিতা রাজশেখর ছিলেন তারানাথের গুরু। জাতিতে হিন্দু। আকস্মিক অসুস্থতায় গুরু রাজশেখর ও গুরুপত্নী দীপান্বিতা মৃত্যুবরণ করায় সুতন্বীর ভার দিয়ে যান ওরা পুত্ররূপ তারানাথের কাছে। তারানাথ দম্পতির কোনো সন্তান না থাকায় নিজ কন্যার মতো লালন করেছেন ওরা সুতন্বীকে।

সুতন্বীর ভেতর হঠাৎ কখনো সুভদ্রার ছায়া খুঁজে পায় ধীমান। কাজের ভেতর ডুবে থেকে সুভদ্রাকে ভুলে থাকতে চায় সে। কিন্তু টেরাকোটার সাঁচে বসানো নরম কাদামাটির ভেতর নক্সা ফুটিয়ে তোলার সময় সুভদ্রার কালো কোমল হাত দুটোকে বারবার মনে পড়ে। টেরাকোটার অনেক নক্সা হাতে ধরে শিখিয়েছিল ওকে সুভদ্রা। এসবের ভেতর নেই সুতন্বী। টেরাকোটার নক্সাই বা কেন, ওর বাবা যে এত বড় গুণী শিল্পী ছিলেন তার কোনো ছাপই নেই ওর ভেতর। তা অবশ্য না থাকারই কথা, বাবামায়ের চেহারাই মনে নেই ওর। ওদের কাজের কোনো স্মৃতি মনে থাকবে কী করে। পালক পিতা তারানাথও অনেক বড় শিল্পী। কিন্তু এসব শিল্পনির্মাণের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই সুতন্বীর। একেবারে সুভদ্রার বিপরীত। ধীমান এক মনে কাজ করার সময় ওর সামনে এসে চুপচাপ বসে থাকে মাঝে মাঝে। ওর হাতের কাজ দেখে। কোনো আগ্রহ নিয়ে কিনা বোঝা যায় না। হয়তো এমনি, কোনো ভালোবাসা-বোধ থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কোনো দিন হয়তো বলে–

'একটা পুতুল গড়ে দাও না ধীমানদা।'

প্রথম যেদিন এটা চেয়েছিল একটু চমকে উঠেছিল ধীমান। ওর সঙ্গে আনা মূর্তিটাকে এখন সুভদ্রা নামেই ডাকে সে। মনে মনে বিশ্বাসও করে যে ওটা সুভদ্রারই মূর্তি। সুভদ্রাও একদিন তাই বলেছিল। সুভদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর নারীমূর্তি আর গড়েনি সে। সুতন্বীকে একটা নৃত্যভঙ্গিমার পুতুল গড়ে দেয় সে। ওটা নিতে চায় না সুতন্বী। ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'কেন, এত সুন্দর পুতুলটা নেবে না কেন?'

'ওটা চাই না আমি।'

'সুন্দর হয়নি ওটা?'

'সুন্দর হয়েছে।'

'তাহলে?'

'তোমার ঐ পুতুলটার মতো একটা পুতুল গড়ে দাও ধীমানদা।'

'কোনটা?'

'তোমার ঘরে যেটা দেখেছি।'

চমকে ওঠে ধীমান। বলে কী মেয়েটা! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে–

'ওরকম পুতুল যে আর গড়তে পারব না সুতন্বী।'

'কেন ধীমানদা?'

আবার ভাবনায় পড়ে ধীমান। কী জবাব দেবে এই মেয়েটাকে। সুভদ্রার ঐ হাসিমুখটা সামনে এসে দাঁড়ায়। সুতন্বী তাকিয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ওকে সামলাতে চেয়ে বলে–

'ওটা মন থেকে গড়া সুতন্বী। ওরকম আর একটা এখন গড়া সম্ভব হবে না যে!'

'মন থেকেই গড়ো না হয়।'

কীভাবে বোঝাবে ওকে ধীমান যে ওর ঐ মনটাই আর নেই। বলে–

'তার চেয়ে বরং এক কাজ করি সুতন্বী। সামনে এসে বসো তুমি। তোমারই একটা মূর্তি গড়ে দেই।'

'আমার মূর্তি দিয়ে কী করব আমি?'

'তাহলে আমার মূর্তি গড়ে দেই একটা?'

হেসে উঠে সুতন্বী।

'থাক ধীমানদা, মূর্তি লাগবে না আমার।'

উঠে চলে যায় সুতন্বী। রাগে না অভিমানে, বোঝে না ধীমান। একেবারে সুভদ্রার বিপরীত মেয়েটা। ওর কোনো কিছুই বোঝে না ধীমান। এখন আর কাজে মন বসাতে পারবে না সে। বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীত এসে পড়ায় ছোটো হয়ে এসেছে দিনগুলো। কাজ করতে হয় দ্রুত হাতে। টেরাকোটার প্লেটগুলো দ্রুত শুকিয়ে নেয়া যায় এ সময়ে। আগামী বর্ষা ঋতু আসার আগ পর্যন্ত সময়ে ওগুলো ভাটায় পোড়ানোর কাজ চালিয়ে যেতে হয় দিনমান। নির্মাণ শ্রমিকদের সারাদিনের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে ধীমান।

সুতন্বীর জন্য বানানো নর্তকী মূর্তিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণ। সত্যি সুন্দর হয়েছে মূর্তিটা। এটাকে ভালোভাবে পুড়িয়ে সূক্ষ্মকাজগুলো ফুটিয়ে তুলে কোনো মন্দিরে দেয়ার কথা ভাবে সে। এই মূর্তিটার আদলে আরেকটা নর্তকী মূর্তি তৈরি করার কথাও ভাবে। চেষ্টা করবে ওটার মুখের ভাবটা সুতন্বীর মতো করে ফুটিয়ে তুলতে।

পরদিন ঐ মূর্তি গড়ায় হাত দেয় সে। দু'দিনের চেষ্টায় নৃত্যভঙ্গিমাটিকে ফুটিয়ে তোলে বেশ ভালোভাবে। নাচের মুদ্রাগুলো তৈরি করে নিখুঁতভাবে। কিন্তু চোখ ও মুখের অভিব্যক্তি দিতে যেয়ে আটকে যায় ধীমান। নাচের মুদ্রা ওখানে ফুটিয়ে তোলার পর সুতন্বীর অভিব্যক্তিহীন সাদাসিধে ভাবটা আর থাকে না। সুভদ্রার প্রাণচঞ্চল গড়নটা বরং এসে যায়।

মনে মনে ভাবে ধীমান, এটা কী নেবে সুতন্বী? পরদিন সুতন্বী এলে দেখায় মূর্তিটা। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সে। তারপর বলে–

'তোমার ঐ মূর্তিটাই দেখি নাচছে এখন!'

ভালোভাবে লক্ষ্য করে ধীমান। সত্যিই তো। শরীরের গড়ন, মুখের আদল তো ঐ মূর্তিটারই। খুব অবাক হয় ধীমান। এই প্রায় নির্বিকার বালিকাটি একটা শিল্পরূপের ভেতর থেকে এতটা আবিষ্কার করল কীভাবে! ওর শিল্পজ্ঞান সম্বলিত চোখ দুটোর সত্যি প্রশংসা করে মনে মনে। তারপর ভাবে, নিজে শিল্পনির্মাণের সঙ্গে জড়িত না হলেও জন্মের পর থেকে দেখে আসছে এই সব শিল্পকর্ম। হাতেনাতে কাজ না করলেও শিল্পটা বুঝতে পারে ঠিকই। ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'তোমার পছন্দ হয়েছে এটা?'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর এটা।'

'নেবে?'

'না।'

'কেন সুতন্বী?'

কোনো জবাব দেয় না সুতন্বী। একটু দ্বন্দ্বে পড়ে যায় ধীমান। আসলে চায় কী সুতন্বী? মেয়েরা হয়তো ছেলেদের অনেক কিছুই বোঝে। এজন্যই হয়তো অনেকে বলে ওরা ষষ্ঠেন্দ্রীয়। ধীমানের মৌনতা ও কখনো কখনো আনমনা হয়ে থাকায় সে ধরে নিয়েছে যে ওর জীবনে হয়তো কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমাস্পদ ছিল যাকে সে আপন করে পায়নি। ঐ বিরহ বয়ে বেরাচ্ছে সে। বিভিন্নভাবে ওটাই নিশ্চিত করে নিয়েছে নিজের কাছে।

শুরুতেই এবার মগধ রাজ্যে জাঁকিয়ে বসেছে শীত ঋতু। হু হু করে নেমে আসে উত্তরে বাতাস। কুয়াশাঢাকা থাকে এখন দিনের অনেকটা সময়। কোনো কাজ এগোয় না ধীমানের। ওদিকে বিক্রমশীলা মহাবিহারের নির্মাণ ও সম্প্রসারণ কাজ এগিয়ে চলেছে বিপুল গতিতে। ফলে ঘরের ভেতর আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হয়েছে ধীমানকে। পিদিমের আলোয় ও ঐ আগুনের আঁচে রাতের বেলায়ও চলে টেরাকোটা নির্মাণের কাজ। কোনো কোনো সময় নিজের ভেতর এত গভীরভাবে ডুবে থাকে ধীমান যে সুতন্বী কখন এসে ফিরে যায় বুঝতেও পারে না। সুভদ্রার স্মৃতিটাকে সে ভুলে থাকতে চায় কাজের ভেতর দিয়ে। এদিকে সুতন্বী যে সব কিছু বুঝেও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওর দিকে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে না সে।

এক রাতে কাজের শেষে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় বসে বিশ্রাম নিতে থাকে ধীমান। কেন যে সেদিন সুভদ্রার স্মৃতি উথলে উঠেছিল ধীমানের ভেতর! পিদিম জ্বালিয়ে ঐ মূর্তিটা বের করে সামনে রাখে। পিদিমের ঐ লালচে আলোয় মূর্তিটাকে মনে হয় সুভদ্রার ছোট্ট একটা সংস্করণ। এতই বুঁদ হয়ে ছিল ধীমান যে সুতন্বী কখন খাবার নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। ওর এই তন্ময় অবস্থা দেখে ফিরে যেতে উদ্যত হয় সুতন্বী। চুড়ির ঠুংঠাং শব্দ বেজে ওঠায় ওর ধ্যান ভাঙে। মাথা ঘুরিয়ে দেখে খাবার নিচে নামিয়ে রেখে ফিরে যাচ্ছে সুতন্বী। ওকে ডাকে ধীমান–

'সুতন্বী!'

ঘুরে দাঁড়ায় একটু সে। তারপর কিছু না বলে নতমুখে ফিরে যায়। ধীমানের মনে হয় সুতন্বী পুরোপুরি বুঝে ফেলেছে ধীমানের অন্তর্দহনের বিষয়টা।

পরের ক'দিন আর খুব বেশি কাছে ভিরে না সুতন্বী। ধীরে ধীরে বিষয়টা হয়তো স্বাভাবিক হয়ে যায়। কাজের ভেতর আবার ডুবে যায় ধীমান। গুরু তারানাথ সম্ভবত শিষ্যের ভবিষ্যত ভেবে নিজের ঘরের পাশে পাঁচ একর পতিত জমি ওর জন্য ব্যবস্থা করে দেন। তারানাথের বসতভিটার পাশে ওর নিজস্ব বসতবাড়ি তৈরি করে নেয়ার জন্য বলে ধীমানকে। ভিক্ষুসংঘের ঐ জমিতে প্রতি বছর চাষাবাদ করাতে হবে। ভিক্ষুদের চাষাবাদের বিষয়ে মহামুনি বুদ্ধের নিষেধ থাকায় ঐসব জমি ফসলের একটা অংশ দেয়ার বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয় অন্যদের। কিন্তু কৃষিকর্মে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই ধীমানের। তারানাথ ওকে পরামর্শ দেয় নিজেদের গ্রামে যেয়ে কোনো একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিবারকে এনে অর্থের বিনিময়ে ওখানে চাষাবাদ করাতে। প্রতিদিন প্রচুর সবজি পাঠাতে হয় মহাবিহারের রন্ধনশালায়। সবজি চাষ করেও কিছুটা আয় হয়। ধীমানের মাথায় ঢোকে না এসব। তারানাথ ওকে বলে নিজগ্রামে যেয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। ফেরার পথে ওর ঠাকুর্দা অভিনন্দকে যেন নিয়ে আসে। শীতের এ সময়টায় নতুন করে টেরাকোটা আর না বানালেও চলবে। বিশাল এক মজুদ প্রস্তুত রয়েছে। এগুলো পুড়িয়ে শেষ করতে শীত পেরিয়ে আগামী বর্ষা এসে যাবে। তখন আবার এটা বন্ধ রাখতে হবে কিছু সময়। ঘরের ভেতর বসে কাজ করতে পারবে তখন সে।

নিজেদের গ্রাম ও অভিনন্দের স্মৃতি জেগে ওঠায় রাজি হয়ে যায় ধীমান। অন্তিচকের পুবে উঁচু সমতলভূমিতে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ছোটো ছোটো টিলা। বিভিন্ন গাছগাছালির জঙ্গল। শীতের পাতা ঝরে গাছগুলোর নিচে পুরু একটা স্তর জমে রয়েছে। বিকেলের দিকে কীষাণ পরিবারগুলো পাতার স্তূপ জমিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুনের চারপাশ ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে-বসে থাকে। ওদের মধ্য থেকে চারপাঁচজন একত্র হয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে বৃত্ত তৈরি করে দোহার গায়। এসব গানের সুর মোহিত করে ধীমানকে। কখনো কখনো নিজেও যেয়ে গলা মেলায় ও নাচে ওদের সঙ্গে। বাড়ি ফেরার গান এখন ধীমানের মনের ভেতর। সুভদ্রাকে ভুলে থাকতে চেয়ে দীর্ঘ অনেকদিন ভুলে ছিল হয়তো নিজেরই অনেক কিছু। জীবন ভুলে থাকার জন্য না। নতুন এক চিত্তচাঞ্চল্য দেখা দেয় ধীমানের ভেতর।

বিশাল এক দোচালা ঘরের ভেতর কাঠের ছাঁচে নরম মাটির টেরাকোটা তৈরির কাজে দিনমান কাটিয়ে এক ভাবলেশহীন প্রাণীতে পরিণত হতে চলেছে ধীমান। সব কাজ ফেলে একদিন হাঁটতে হাঁটতে মহাবিহারের কাছে এসে বিস্মিত হয়। হা ভগবান, কী মহাযজ্ঞই না সাধন করতে চলেছেন মহারাজ ধর্মপাল! বিশাল এক ভবনের এক পাশে গাঁথা ধীমানের হাতে গড়া টেরাকোটার কাজ দেখে অবাক হয়ে যায় সে। বিশ্বাসই হতে চায় না যে এসব ওর হাতে গড়া। নির্মাণের সময় বিচ্ছিন্নভাবে দেখে সে এগুলো। কিন্তু এখন ভবনের দেয়ালে ওগুলোর বিচিত্র বিন্যাস এক অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। প্রতিটা টেরাকোটার অবস্থান ঠিক করা হয়েছে এক আশ্চর্য শিল্পরীতি অনুসরণ করে। দেয়ালের পুরো চিত্র টেরাকোটার সৌন্দর্য ছাড়িয়ে নতুন এক শিল্পসৌকর্য ফুটিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন দেয়ালের শিল্পবিন্যাস সারাদিন ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে ধীমান। এখানে না এলে হয়তো কোনোদিনও বুঝতে পারত না ধীমান যে ওর গুরু তারানাথ টেরাকোটার ভিন্ন ভিন্ন গড়ন কেন এঁকে দেখান ওকে। ওগুলোর সম্মিলিত রূপটা না দেখলে হয়তো অসম্পূর্ণ থেকে যেত ওর শিল্প-মেধা। মনের ভেতর পুলক বোধ করে সে। মহাবিহারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়াল অলঙ্করণের জন্য রাজশিল্পী হিসেবে কেন ওকে সোমপুর পাঠাতে চান মহারাজ তা কিছুটা বুঝতে পারে এখন ধীমান।

দিনের শেষে কিছুটা ক্লান্তি বোধ করে সে। আকাশে তখনও শেষ শীতের কোমল রোদ। বিহারের গায়ে ঐ রোদের ঝিলিক এক অভিনব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। নৃত্যরত দেহভঙ্গিমার একসারি প্রতিমা দেয়ালের গায়ে আলোছায়ার এক অপূর্ব বিন্যাস সৃষ্টি করেছে। ধীমানকে অনেকক্ষণ বিহ্বল করে রাখে ওটা। পরদিনই সে নিজগ্রামে যাওয়ার জন্য যাত্রা করে।

বাড়িতে পৌঁছে অভিনন্দের উষ্ণ আলিঙ্গনের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে ধীমান। শৈশব ও কৈশোরের পুরোনো সেই সব দিন যেন ফিরে পায় আবার। পরিবার-পরিজনের ভেতর এসে এক আনন্দলোকে ডুবে যায় ধীমান। রাতে ঘুমানোর সময় এলে অভিনন্দকে বলে–

'তোমার ঘরে আজ শোবো ঠাকুর্দা।'

'কেন রে ধীমান? তুই তো ঘুমোতে পারবি না। সারারাত কাশি আমি। তোর ঠাক্‌মাই থাকতে চায় না।'

হেসে উঠে ধীমান।

'অসুবিধে নেই ঠাকুর্দা। একটা রাত না হয় গল্প করে কাটিয়ে দেব।'

ধীমানের ঠাকুর্মা বলে–

'তাই ভালো বাপু। একটা রাত শান্তিতে ঘুমোই আমি।'

সবাই যোগ দেয় ওদের হাসিতে। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করতে বসে ওরা। মাটির হাড়িতে ধানের তুষ জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখে। গরমকালে মাটির ঘরের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা থাকে, আর শীতের সময় একবার গরম করে তুললে অনেকক্ষণ গরম থাকে। অভিনন্দ জিজ্ঞেস করে–

'তা বল ধীমান তোর বিক্রমশীলার গল্প।'

'সে তো এক মহাযজ্ঞ ঠাকুর্দা। গল্প বলার মতো না। নিজ চোখে যেয়ে দেখতে হবে।'

'এঘর-ওঘর করতে পারি না, আর তো বিক্রমশীলা। তারপর এই বুড়োকালে কিনা এক বোঝা চাপিয়েছে ঘাড়ে, বল তো দেখি কী কাণ্ড!'

'বোঝা না ঠাকুর্দা, এটা আছে বলেই বরং চলাফেরা করছ, নয়তো লাঠি ঠুকে ঠুকে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছে যেতে এতদিনে।'

খিলখিল করে হেসে উঠে অভিনন্দ।

'বা রে, অনেক কথা বলা শিখে গেছিস দেখি ধীমান। শহর-নগরে থেকে মানুষেরা খুব চালাক-চতুর হয়ে যায়। তুইও তো কম হসনি।'

'না দাদু। তোমার সঙ্গেই একটু চালাকি করি।'

প্রায় সারা রাত ধরে চলে ওদের বকবক। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে অনেকটা বেলা করে ওঠে ধীমান। মায়ের হাতে বানানো শীতের পিঠে খায়। ওর মা এবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনন্দকে ধরেছে ধীমানকে বিয়ে করানোর জন্য। মনে মনে নাকি পাত্রীও ঠিক করে রেখেছে। ধীমান এগিয়ে এলে ওর বাবা বাড়িতে আসার পর সব ব্যবস্থা করবে ওরা। ধীমানের দিক থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

বিকেলে সে বেড়াতে যায় সুভদ্রাদের বাড়ির দিকে। ওখানে যেয়ে শুনে সম্প্রতি সুভদ্রার বিয়ে হয়েছে ওদেরই পাড়ার এক মৃৎশিল্পীর সঙ্গে। ধীমান নিজেও বোঝে না এ সংবাদটায় সে খুশি হয়েছে না দুঃখ পেয়েছে। বাড়ি ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়ে নিজের ঘরে যেয়ে।

ঘুম আসতে চায় না। ধীমানের ভেতর একটা চিন্তাজগত তৈরি হয়েছে। বুঝতে চেষ্টা করে সে হঠাৎ কীসের আকর্ষণে দৌড়ে গ্রামে ফিরে এসেছে। আর কেনই বা এতদিন ভুলে ছিল এত সব কিছু। গুরু তারানাথের পরামর্শে সে ফিরে এসেছে, না জন্মভিটার টানে, নাড়ির টানে, নাকি ওর আত্মার পরমাত্মীয় ঠাকুর্দার টানে, অথবা এর কোনোটাই না, এসেছে সুভদ্রার গোপন আকর্ষণে, কিছুই বুঝে উঠতে পারে না ধীমান। যৌবন শুরুর এই লগ্নে এক মহাবিস্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে জীবনের দিনগুলো। এক রহস্যঘোরের ভেতর যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওর জীবনের অভাবিত আকর্ষণ। আর প্রতিদিনই যেন একটু একটু করে জটিল হয়ে উঠতে শুরু করেছে এসব। নিজের ভেতরই যে এত অজানা রয়েছে তা কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরে এক ধরনের উত্তেজনা তৈরি হয় ওর ভেতর। জীবনের এ রহস্যটা আসলে কী? এর কোনো কূলকিনারা করতে না পেরে আবার বিক্রমশীলা ফিরে আসে ধীমান। ডুবে যায় নিত্যদিনের কাজের ভেতর। হয়তো কাজ করে যাওয়াই জীবন। বাকিটা অমূলক।

ওর কাজ দেখতে প্রায়ই তারানাথ এসে বসে থাকে ওর কর্মশালায়। পুরোনো মূর্তিটার পাশে নৃত্যরত ভঙ্গিমার মূর্তি দুটোও চোখে পড়ে একদিন তারানাথের। ধীমানের মূর্তি-নির্মাণ পারদর্শিতায় বিস্মিত হন তারানাথ। কষ্টিপাথরের মূর্তি গড়ার প্রস্তাব দেয় সে। পাথর কাটা শেখাবে সে ওকে। ওর হাতের এই অসাধারণ কাজ ঠুনকো পোড়ামাটির ভেতর ধরে রাখার মতো না। এ রাজ্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত হবে এসব। মহারাজ ধর্মপালের কাছে সুপারিশ করে তারানাথ। মহারাজ ওকে সোমপুর বিহারের প্রধান প্রতিমা নির্মাণশিল্পী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পাঠানোর পরামর্শ দেন তারানাথকে।

মহারাজের এ আদেশে কিছুটা বিব্রত হয় তারানাথ। ধীমানের সঙ্গে একটা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এতদিনে। নিঃসন্তান এই দম্পতি ধীমানকে নিজপুত্ররূপে স্নেহ করেন। সুলক্ষণা দেবী তো কোনোভাবেই মেনে নিতে চায় না এটা। তারানাথকে বলে যেভাবেই হোক মন্ত্রীমহাশয়কে ধরে এ রাজাদেশ ফেরানোর ব্যবস্থা যেন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি রাতের মতো এক রাতে খাবার নিয়ে আসে সুতন্বী। বসে থাকে ধীমানের সামনে। খাবার শেষ হলে জিজ্ঞেস করে–

'ধীমানদা নাকি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?'

'আমি তো যেতে চাই না সুতন্বী।'

'সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি সুতন্বী।'

আর কিছু বলে না সুতন্বী। হয়তো বলতে চায় অনেক কিছু। বলতে পারে না। এটাই হয়তো ওর স্বভাব। ওর মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে ধীমান। কোনো ভাবলেশ নেই। ওর অন্তরের ভাঙা-গড়া, আবেগ-নিরাবেগ সবই বোধ হয় ভেতরে রয়ে যায়। ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ায় সুতন্বী। একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ ডাকে–

'ধীমানদা!'

চমকে উঠে ধীমান। এই স্বরে তো অন্য ধ্বনি। মনে করতে পারে ক'বছর আগে এমনি এক রাতে ওর বুকের ভেতর থেকে কে যেন ডেকে উঠেছিল, 'সুভদ্রা!' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল সে, 'বল'। মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ সুভদ্রা এক বুক ভরা আকুলতা নিয়ে। ঐ আকুলতার ভাষাটা হয়তো সেদিন বোঝেনি ধীমান। আজ যখন সুতন্বী এক অজানা সুরে ওকে ডাক দিয়েছে, সে জবাব দেয়, 'বল সুতন্বী।'

এগিয়ে আসে ধীমান। ওর কাঁধে হাত রাখে। সুভদ্রার ঐ মূর্তিটা যেন প্রাণ পেয়ে নেচে উঠে। দ্বিতীয়বার ঐ ভুলটা আর করে না সে। সুতন্বীকে নেয় ধীমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

উত্তর থেকে সোজাসুজি দক্ষিণে নেমে আসা ব্রহ্মপুত্র নদীর দু'তীরের ফসল তখনও কাটা হয়নি। ধর্মপাল সিদ্ধান্ত নেন স্থলপথে না যেয়ে নদীপথে উত্তরে উজিয়ে তারপর নদীর পুব তীরে নেমে যাবেন। ততদিনে কৃষকের ফসল কাটা শেষ হয়ে যাবে। সৈন্য চলাচলে ফসলহানির সম্ভাবনা থাকবে না। বঙ্গের এদিকটায় এত বেশি আবাদি জমি যে ফসল মওসুমে সৈন্য চলাচল কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের জরুরী প্রয়োজন ছাড়া ফসল মওসুমটা এড়িয়ে চলতে হয় রাজা-মহারাজাদের। স্থলপথে সৈন্য চলাচল এখানে সম্ভব হয় খুব সীমিত সময়ের জন্য। কোনো কোনো বছর একেবারেই সম্ভব হয় না। শীতের শুকনো মওসুম সংক্ষিপ্ত হয়ে যায় কোনো কোনো বছর। উত্তরের পর্বতমালা থেকে বৃষ্টি ও বরফ-গলা পানি এসে প্লাবনের সৃষ্টি করে। ফসল কেটে ঘরে তোলার আগেই বন্যায় তলিয়ে যায় সব। ব্রহ্মপুত্রের স্রোত ধরে প্রায় পক্ষকাল উজিয়ে আসার পর ধর্মপালের সৈন্যবাহিনী স্থলপথ নেয়। পথ বলতে স্থানীয় সৈন্যদের দেখিয়ে নেয়া সাময়িক চলাচলের রাস্তা। আরও দু'দিন উত্তরে এগিয়ে যাওয়ার পর দিগন্তে সরাসরি দেখা যায় সবুজ পাহাড়সারি। মহারাজকে স্বাগত জানানোর জন্য পঞ্চাশটি হাতি নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে ওখানের সামন্তরাজা শান্তরক্ষিত। মহারাজের হাতিবাহিনীতে প্রশিক্ষণের জন্য রাজস্ব হিসেবে দেয়া হবে ওগুলো। এসব হাতির আকার কিছুটা ছোটো। সিংভূম জঙ্গলের হাতি তুলনামূলকভাবে অনেক বড়।

কুশলাদি বিনিময়ের পর সামন্তরাজা শান্তরক্ষিতকে জিজ্ঞেস করেন ধর্মপাল–

'রাজামহাশয়ের রাজ্যে ফসলের ফলন দেখছি অঢেল। অথচ হাতিগুলো দেখে তা মনে হয় না। ওরা কী ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করে না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ্ঞে তা নয় মহারাজ। এটা হয়তো প্রাকৃতিক কারণ। শুধু হাতিই না, গরু, মহিষ ও অন্যান্য প্রাণীও এখানে ছোটো আকারের, মহারাজ।'

'মানুষও।'

চোখে কৌতুক ধরে রেখে বলেন ধর্মপাল। সঙ্গের সবাই হেসে ওঠে। সহসা কোনো জবাব দিতে পারে না শান্তরক্ষিত। ছোট্ট করে বলে–

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'বেশি খেলে বেশি বড় হওয়ার কথা না রাজা শান্তরক্ষিত?'

'ওরা হয়তো খায় বেশি মহারাজ, কিন্তু সংখ্যাটা একটা কারণ হতে পারে। সবকিছু এখানে বেশি ফলে। কীটপতঙ্গ, পশুপাখি, গাছপালা, সবকিছু জন্মায় অঢেল। মাঝে মাঝে উত্তর দিকের পাহাড় থেকে দল বেঁধে হাতির পাল নেমে আসে। অনেক সময় ফসলেরও প্রচুর ক্ষতি করে ওরা।'

কিছুটা দীর্ঘ যাত্রার পর দু'দিনের জন্য বিশ্রাম নেন ধর্মপাল। জায়গাটার সবুজ সৌন্দর্য মুগ্ধ করে তাঁকে। এখানের খাবার-দাবারের মানও অসাধারণ। চালের সুগন্ধি তো অতুলনীয়। ঘি, মাখন, মাছ, মাংস সবই সুস্বাদু। রান্নায় ঝাঁঝালো শর্ষের তেল ব্যবহার করে এরা যা ব্যঞ্জনে অতুলনীয় স্বাদ নিয়ে আসে। নদীর মাছগুলোও এত সুস্বাদু এদের যে এখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে হয় মহারাজের। খেজুরের রস জ্বাল দিয়ে সুগন্ধি সরু নতুন চাল ও ঘন দুধ দিয়ে যে পায়সান্ন তৈরি করে এরা তার স্বাদ অন্য কোনো রাজ্যে কখনো পায়নি ধর্মপাল। এদের পিঠেপুলি ও অন্যান্য মিষ্টান্ন সত্যি অপূর্ব। সব মিলিয়ে মহারাজের শীতকালীন মহড়াটা খুব উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

শীত ঋতুর অনেকটা সময় ধর্মপাল ঘুরে বেড়ান বঙ্গ ও সমতট রাজ্যের শুকনো জায়গাগুলোয়। প্রজাদের খুশি রাখার জন্য প্রতিটা সামন্তরাজাকে আদেশ দেন। আর্থিক অনটনে থাকা সামন্তরাজ্যগুলোকে রাজকোষাগার হতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গ ও সমতট রাজ্য দুটোর একটা বড় সমস্যা লক্ষ্য করেন ধর্মপাল। বছরের পুরো সময় জুড়ে স্থলপথে যাতায়াত সম্ভব হয় না। কিন্তু নদীগুলো আবার সারা বছর নাব্য থাকে। জালের মতো বিস্তৃত ওগুলো। বিভিন্ন রঙের পাল খাটিয়ে নদীর বুক জুড়ে ছুটে চলা নৌকার দৃশ্যও মনোমুগ্ধকর। কত রকম নৌকা যে তৈরি করে এখানের সুতোর ও কারিগরেরা! বিস্ময়কর। একটা শক্তিশালী নৌশক্তি গড়ে তোলার ভাবনা মাথায় চেপে বসেছে ধর্মপালের। দ্রুতগামী নৌকার ভেতর নিরাপদ অবস্থানে থেকে তীর ছুঁড়ে মারতে পারার উপযোগী নৌযান নির্মাণের পরামর্শ দেন তিনি। সেই সঙ্গে খুব দ্রুত সৈন্য, অস্ত্র ও রসদ পরিবহন উপযোগী নৌকা নির্মাণের আদেশও দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গ সমতট ঘুরে তাঁর শক্তিশালী হাতিবাহিনীকে বঙ্গরাজের অধীন সেনাপতি প্রণবভট্টের দায়িত্বে রেখে যান। এ রাজ্যটা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তায় থাকতে ইচ্ছুক নন তিনি।

আগামী যুদ্ধের জন্য বিপুল রসদ, সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন মহারাজ ধর্মপাল। মগধের ভূপ্রকৃতি বঙ্গের মতো জলজংলায় ভরা না হলেও সমগ্র রাজ্যটি অরণ্যবেষ্টিত। সিংভূম অরণ্যের অতিকায় হাতির সমন্বয়ে দ্রুত একটা শক্তিশালী হস্তিবাহিনী প্রস্তুত করেন ধর্মপাল। এবং অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তিও সেই সঙ্গে বাড়িয়ে নেন। রাজ্যটির শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেন। প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার করে এ রাজ্যটিকে তাঁর পুবদিকের রাজ্যগুলোর জন্য একটা প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে গড়ে তুলেন। পশ্চিম ও দক্ষিণ থেকে আসা চিরকালীন আক্রমণগুলো ঠেকাতে তাঁর সব চেয়ে শক্তিশালী বাহিনী এখানে সংগঠিত করেন। ভবিষ্যতের সব যুদ্ধযাত্রাও এখান থেকে পরিচালনা করার জন্য মনস্থির করেন।

পিতাজী গোপালদেবের সুশাসনের ফলে বঙ্গদেশে যে শান্তি ও সমৃদ্ধি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার সুফল হিসেবে রাজ্যটি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ফলে পশ্চিম ও দক্ষিণের দুই চিরকালীন শত্রুই আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। মাৎস্যন্যায়ের কালে বৎসরাজ বাংলায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিলেন তার স্মৃতি এখনও মানুষের মনে দগদগে ক্ষতের মতো টিকে রয়েছে। ভারতবর্ষের উত্তরাংশ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনটা বড় রাজশক্তির প্রতিটাই সচেষ্ট থাকে। প্রকৃতপক্ষে উত্তরভারতের আধিপত্য দেশটির অবশিষ্ট অংশ নিয়ন্ত্রণ করে। মহারাজ ধর্মপালের শক্তি বৃদ্ধিতে স্বভাবতই দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। এদিকে পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার রাজাও উত্তরভারতের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের করায়ত্বে রাখতে চান। এটার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে ধর্মপাল যেমন বঙ্গদেশের পশ্চিমের মগধ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান পুবদিকটা নিরাপদ রাখার উদ্দেশ্যে তেমনি পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার রাজারাও চান তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা। পুবদিকের অংশে কোনো রাজা শক্তিশালী হয়ে উঠলে তাদের রাজ্য সম্প্রসারণ ও দিগ্বিজয়ী হওয়ার বাসনা একমাত্র মেটাতে পারে উত্তর ভারত। কারণ দাক্ষিণাত্যের তিনদিক সমুদ্রবেষ্টিত। আর উত্তরদিকটা বিন্ধ্য পর্বতমালা দিয়ে সুরক্ষিত।

রাজা হয়ে ধর্মপাল একটু গুছিয়ে সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠে যুদ্ধের দামামা। তাঁর পূর্ণশক্তি সংগ্রহ করার আগেই তিন রাজবংশের চিরকালীন বিবাদ শুরু হয়ে যায়। নিজেদের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে মহারাজ ধর্মপাল কনৌজের নৃপতি ইন্দ্ররাজকে পরাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। এই রাজ্যটির অবস্থান উত্তরভারতের কেন্দ্রস্থলে। সিন্ধু নদী ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পাঁচটি শাখা নদী বিধৌত এ অঞ্চলটা সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই খুব সমৃদ্ধ ও সুখ্যাতিসম্পন্ন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বৃষ্টিভেজা মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ ধর্মপাল তাঁর বিপুল সেনাবাহিনী নিয়ে পুব দিক থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হন। কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হতে হতে তাঁর সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেয় মল্ল, কোশল, পঞ্চাল, কুরু, গান্ধারা প্রভৃতি রাজ্যের ছোটো ছোটো রাজারা। যারা সরাসরি যোগ দিতে সক্ষম হয়নি তারাও মহারাজকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। ধর্মপালের বিশাল সৈন্যবাহিনী এক অলংঘ্য পর্বতের মতো পশ্চিম দিকে ধেয়ে যেতে থাকে। এই অবিশ্বাস্য পর্বত এগিয়ে আসতে দেখে ইন্দ্ররাজ হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। ফলে মহারাজের সৈন্যদের কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি। প্রায় বিনাবাধায় কনৌজ অধিকার করেন মহারাজ। কিন্তু এখানে দীর্ঘদিন অবস্থান বা এটাকে স্থায়ী রাখার অবসর ধর্মপালের হাতে আসেনি। প্রতিহার বংশের বৎসরাজের সঙ্গে অচিরেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় তাঁকে। রাজা চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়ে পরবর্তী যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন ধর্মপাল।

বিজিত রাজ্য নিজ করায়ত্বে না রেখে চক্রায়ুধের কাছে হস্তান্তর করায় মদ্র, কুরু, যদু প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ ধর্মপালের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহারাজের এই সাফল্যে প্রথমে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন ভিল্লমলের রাজা নাগভট্ট। মাৎস্যান্যায়ের অরাজকতার সময় এই নাগভট্টের পিতা বৎসরাজ বঙ্গ আক্রমণ করে অসংখ্য জনপদ পর্যুদস্ত করে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিলেন এখানে। বাংলার দুটি রাজছত্র কেড়ে নিয়েছিলেন তিনি। তাঁর পিতা কর্তৃক দলিত ও পরাজিত রাজ্যটির বর্তমান রাজা ধর্মপালের এই আধিপত্য কোনোভাবে মেনে নিতে পারেননি নাগভট্ট। ধর্মপাল যদি সমগ্র পূর্ব ও উত্তর ভারতের অধিপতি হয়ে বসেন তাহলে নাগভট্টও যে ভবিষ্যতে তাঁর আগ্রাসনের বাইরে থাকবে না এটা নিশ্চিত মনে করেন তিনি। ধর্মপালকে থিতু হয়ে বসার সময় না দিয়ে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে এসে চক্রায়ুধকে পরাজিত করে কনৌজ নিজের দখলে নিয়ে নেন নাগভট্ট। তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা চক্রায়ুধের ছিল না। ধর্মপালের সৈন্যবাহিনীও নাগভট্টের প্রচণ্ড আক্রমণের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারেনি। চক্রায়ুধ পালিয়ে এসে ধর্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুদ্গাগিরি প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করেন মহারাজ ধর্মপাল। কিন্তু বৎসরাজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে কনৌজ নাগভট্টের হাতে ছেড়ে দিতে হয় ধর্মপালকে।

এবার কনৌজের আধিপত্য নিয়ে শুরু হয় ত্রিমুখী যুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ঝড়ের বেগে তাঁর বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রথমে পরাস্ত করেন বৎসরাজকে। তারপর পরাস্ত করেন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ধর্মপালের সেনাবাহিনীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মপালের এই বিপর্যস্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন তাঁর শ্বশুর মহারাজ গোবিন্দদেব। মহারাজ গোবিন্দের সৈন্যদল ছিল অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও চৌকষ। তাঁর আক্রমণে নাগভট্ট বিপন্ন হয়ে উত্তরভারতের আধিপত্য রক্ষার সংগ্রাম থেকে পিছু হটে যেতে বাধ্য হন। এদিকে দাক্ষিণাত্যের রাজা ধ্রুবও আবার নিজরাজ্যে ফিরে যান।

কিছুদিনের মধ্যে আবার ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, অবন্তি, গান্ধার, কীর প্রভৃতি রাজ্য নিজের করায়ত্বে এনে উত্তরভারতে নিজের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন ধর্মপাল। তাঁর এই বিজয়াভিযান নিরঙ্কুশ রাখার জন্য আরও উত্তরের পার্বত্যরাজ্য হিমালয় পর্যন্ত তাঁর সৈন্যবাহিনীকে বিস্তৃত করেন তিনি। এ নিয়ে তিব্বতরাজের সঙ্গেও ছোটোখাটো কয়েকটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় তাঁর সৈন্যবাহিনীকে।

রাজ্যশাসনের শুরুর দিকে জড়িয়ে পড়া যুদ্ধবিগ্রহের ঝঞ্ঝাট ও সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের নিয়ন্ত্রণ মহারাজ ধর্মপালের রাজ্যটাকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশতক ধরে তিনি পিতাজি গোপালদেবের প্রজাপ্রীতির অনুশাসন পুরোপুরি অনুসরণ করে চলেছিলেন। রাজ্যসমূহের সুখসমৃদ্ধি এক বিপুল সুখ্যাতি এনে দিয়েছিল তাঁকে। উত্তরসূরিদের জন্য এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সীমারেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী কয়েকশো বছর ধরে টিকে ছিল ওটা।

ধর্মপালের রাজত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা বছরও বাদ যায়নি যে-বছর কোনো না কোনো যুদ্ধের ডঙ্কা বেজে ওঠেনি। এটা অবশ্য প্রায় সব রাজ্যেরই বৈশিষ্ট্য। রাজরাজরাদের কাজই এই যুদ্ধটা করা। হয় দিগ্বিজয়ের জন্য, নয়তো অন্য কোনো দিগ্বিজয়ী রাজার জয়বাসনা হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। এরিমধ্যে কিছু কিছু বছর এসে যায় যেগুলোয় বড় কোনো যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিতে হয় না রাজাদের। সেনাপতি বা অধীনস্ত রাজারা বিষয়গুলো মিটিয়ে ফেলে।

কিছুটা নির্ঝঞ্ঝাট ঐ বছরগুলোয় সময় পেলেই মহারাজ ধর্মপাল শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও অনুশাসন প্রভৃতি বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। মহারাজের রাজ্যশাসনের মধ্যপর্যায়ে একটা প্রায়-শান্ত বছর এসে যায় তাঁর জীবনে। বয়সের ভারে অনেকটা নুয়ে পড়েছেন ধর্মপাল। সুযোগ্য পুত্র দেবপালকে গড়ে তুলছেন পালসাম্রাজ্যের ভবিষ্যত রাজা হিসেবে। যে সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেয়েছেন দেবপালের ভেতর তাতে আত্মতৃপ্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। অনেকটা নিশ্চিত মনে বৌদ্ধ আচার্যদের সঙ্গে কিছুদিন কাটানোর জন্য মনস্থির করেন তিনি।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের মহাসম্রাট অশোক অবিশ্বাস্য প্রাণসংহারী এক যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষ হত্যা ও দেড় লক্ষ মানুষকে

দেবপাল-৬দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস্তুচ্যুত করে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছিলেন। যুদ্ধের ভয়াবহতা শেষ পর্যন্ত এতটা পরিতাপ এনে দিয়েছিল তাঁকে যে মহামুনি গৌতমের অহিংস ধর্মের বাণি অন্তরে গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিশ্ব তো অহিংস হতে পারে না। নিজেদের রক্ষা করতে হলেও অন্যদের হত্যা করতে হয়। এটাই সব চেয়ে বড় মানবধর্ম, মানুষের নিয়তি। কোনো ধর্মই নরহত্যা ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করার পর প্রজারাও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। প্রজাদের ধর্মের প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক রাজার ধর্ম প্রজাকে পালন করতে হয়। এবং মেনে নিতে হয়। পরবর্তীতে সনাতন ধর্মীয় রাজাদের উত্থানে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্ম প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। পূর্বভারতে নিভু নিভু ভাবে টিকে আছে কিছুটা। পালরাজ্যের প্রসারের পর আবার কয়েকশো বছরের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়। এটার সম্প্রসারণের জন্য মনোনিবেশ করেন ধর্মপাল। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সনাতন ধর্মের তেমন কোনো সংঘর্ষ হওয়ার কারণ নেই। দুটো ধর্মই পরস্পরের ভেতর আত্মীকরণ করে নেয় কিছুটা। তাছাড়া পূর্বভারতের লৌকিক ধর্মগুলো, কৌম সমাজের সীমিত বিশ্বাস ও রীতিনীতিগুলোও দুটো ধর্মই সাঙ্গীকরণ করে নেয়। ফলে তুমুল সংঘর্ষের কোনো কারণ ঘটে না। এমনকি বৈদিক ধর্মবিশ্বাসী ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনেও তেমন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। পূর্বভারতের মানুষগুলোর এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য যে রাজাচার বলে যে-ধর্মটাই ওরা গ্রহণ করুক না কেন প্রাচীন আদিবাসীদের পুজো-আর্চা, সংস্কার ও বিশ্বাস বা ভয়ভক্তি পরিত্যাগ করে না। বংশ পরম্পরা অনুসরণ করে এসব। সন্ধ্যাকালে তুলসীতলায় পিদিম জ্বালানো, পালাপার্বণে চিত্রবিচিত্র ঘট সাজানো, আমপাতা, ধানদুর্বা এসব নিত্যদিনের জীবনযাপনের অনুষঙ্গ হিসেবে টিকে থাকে। এসব প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার উচ্ছেদের কোনো প্রচেষ্টা কোনো ধর্মই গ্রহণ করেনি। এটার কোনো কারণও নেই। বৌদ্ধধর্মের পুনর্বাসনের ফলে সমাজগুলোয় তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসী ও বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী মানুষজন শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে। শত সহস্রভাবে বিভক্ত জনপদগুলোর মধ্যে দুর্গম প্রাকৃতিক কারণে বিচ্ছিন্নতা থাকায় একই ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন জনপদের আচার-অনুষ্ঠানও ভিন্ন ভিন্ন। এসব মিলিয়ে এক জটিল সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠেছে পূর্বভারতের এ অংশটায়।

মহারাজ ধর্মপালের আনুকূল্যে গড়ে উঠেছে বিক্রমশীলা মহাবিহার। এটা পরিদর্শনে আসার জন্য দিনক্ষণ ঠিক করেন তিনি। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ধর্মগুরু হরিভদ্র মহাশয়। মহারাজ তাঁর রাজত্বকালে কম করে হলেও পঞ্চাশটি ছোটো বড় ধর্মবিহার প্রতিষ্ঠা করেছেন হরিভদ্র মহাশয়ের সুপরামর্শে। মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে এই ধর্মগুরুর অবদান অবিস্মরণীয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্রমশীলা যাওয়ার পথে বৈশালিতে কিছুদিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন মহারাজ ধর্মপাল। গুরুদেব হরিভদ্র মহাশয় মহারাজের এ ইচ্ছায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। মগধের এই প্রাচীন নগরীটির প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ রয়েছে ধর্মপালের। এই নগরীটাকে পৃথিবীর প্রথম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয়ে থাকে। বিশাল রাজার নামে এই প্রসিদ্ধ নগরীর পত্তন করা হয়েছিল। রাজা বিশাল মহাগ্রন্থ রামায়ণের সময়কালে রাজত্ব করতেন বৈশালিতে। খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকে, ভজ্জি ও লিচ্ছবিদের সময়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একটা প্রতিনিধি সভা ছিল এখানে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষের একটা বিখ্যাত বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র ছিল এই নগরীটি।

ওখানে পৌঁছে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন হরিভদ্র মহাশয়। মহারাজকে বলেন–

'ভগবান বুদ্ধ এ জায়গাটায় তাঁর শেষ হিতোপদেশ দিয়ে যান।'

হাতজোড় করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন ধর্মপাল। হরিভদ্র আবার বলেন–

'জৈন ধর্মের প্রবর্তন এই বৈশালি নগরীতেই।'

'আজ্ঞে, গুরুদেব।'

'প্রভু মহাবীরের জন্মস্থান এখানটা।'

'আমি কৃতজ্ঞ গুরুদেব এই পবিত্র তীর্থে আপনার সান্নিধ্যে থাকতে পেরে।'

'মহারাজের আগমন উপলক্ষে নগরীর অধিবাসীরা একটা আবেদন রেখেছেন আপনার কাছে।'

'কী ওটা গুরুদেব?'

'মহাপ্রভু বুদ্ধের এমন একটা মূর্তি স্থাপন যা অনন্তকালের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে।'

'আপনার আদেশ অচিরেই কার্যকর হবে গুরুদেব।'

'পবিত্র এ জায়গাটির কত ইতিহাস মহারাজ!'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'লিচ্ছবিদের রাজা মনুদেব মহানর্তকী আম্রপালীর নৃত্যছন্দে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পাওয়ার বাসনা করেন এ স্থানটিতে।'

'কত পুরোনো ইতিহাস মনে করিয়ে দিচ্ছেন গুরুদেব। কতবার শুনেছি আপনার কাছে এসব। এখন মনে হচ্ছে ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আসলে ইতিহাসটা জানতে হয় ঐতিহাসিক স্থানে দাঁড়িয়ে। না হলে এটা হয়তো পূর্ণ হয় না গুরুদেব।'

'ঠিকই বলেছেন মহারাজ। ঐ যে দেখুন আকাশ ছুঁয়েছে সম্রাট অশোকের স্তম্ভ। মনে হয় না যে আমরা ফিরে গেছি ঐ সময়টায়?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কল্পনায় হলেও গুরুদেব।'

'এই কল্পনাশক্তিটাই মূল। মানুষের এ ক্ষমতাটা আছে বলেই সে মানুষ। যে সমাজে এটা বেশি ঐ সমাজটাও বেশি উন্নত মহারাজ।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'ঐ যে দেখুন, অভিষেক পুষ্করিণী। বৈশালির জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুত করানো হত এই পুষ্করিণীর পবিত্র জলে।'

'এ রকম একটা পুষ্করিণী কী বিক্রমশীলায় নির্মাণ করা যায় না গুরুদেব?'

'ওটা তো মহারাজের ইচ্ছাধীন।'

'কিন্তু এ জায়গাটা এত পবিত্র যে কোনোকিছুই এর তুলনীয় করে গড়া সম্ভব না।'

'তা তো অবশ্যই। কপিলাবস্তু ছেড়ে আসার পর এখানটাতেই ধ্যানে ন্যস্ত হয়েছিলেন মহাপ্রভু, এখান থেকে ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন, এবং এখানেই মহানির্বাণ লাভ করেছিলেন। এ স্থানের সঙ্গে তুলনীয় আর কোনো স্থান আমাদের জন্য নেই মহারাজ।'

'রাজা-মহারাজাদের মহানগরীও যে এটা গুরুদেব। লোকশ্রুতি বলে সাত হাজার সাত রাজার নগরী এই বৈশালি।'

'আরও কত শত ইতিহাস আছে এই নগরী ঘিরে সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে! সম্রাট অশোকের বানানো ঐ স্থাপনাটা দেখে আরেকটা কথা আবার মনে পড়ছে গুরুদেব।'

'কোনটা?'

'এটা হয়তো আমাকে শোনাননি গুরুদেব। লিচ্ছবিদের মহাপ্রভুকে অনুসরণের ঘটনাটা।'

'হ্যাঁ, আমাকেও খুব আবেগাপ্লুত করে ওটা। অনেকবার বলেছি আপনাকে। যতবার বলেছি অশ্রু সম্বরণ করতে পারিনি। অথচ এটা দুঃখের অশ্রু না, আবার আনন্দেরও না। শেষবার কাপাল চেতিয়ায় আসার পর মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত নেন যে তিন মাসের মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করে নেবেন তিনি। তাঁর এ সিদ্ধান্তটা প্রথমে জানান মারকে, তারপর জানান অনিন্দকে। পরের দিনই ভবদগমের উদ্দেশ্যে বৈশালি ছেড়ে যান ভগবান। শেষবারের মতো দেখে নেন নগরটাকে। একটা ঐরাবত যেমন তার পুরো শরীর ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখে। বর্ষা ঋতু আসন্ন থাকায় বৈশালির উপকণ্ঠে বেলুবগমে ক'দিন কাটান মহামুনি। সন্ন্যাসীরা তখন বৈশালির চারধারে অবস্থান করছিল। বস্যতে প্রবেশের আগেরদিন নর্তকী আম্রপালী বুদ্ধ ও সঙ্গী সন্ন্যাসীদের একবেলা খাবারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটুক্ষণ ভাবেন হরিভদ্র মহাশয়। এক গল্পের সুতো ধরে আরও অসংখ্য গল্পের সূত্র মনের ভেতর উঁকি দেয়। চোখ ঝাঁপসা হয়ে উঠে হরিভদ্র মহাশয়ের। আবার কথা বলা শুরু করেন তিনি–

'মহাপ্রভুর ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কুলিনজরের পথে বেরিয়েছিলেন তিনি। লিচ্ছবিরা তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি ওদের দান করেন মহাপ্রভু। তবুও ওরা তাঁকে অনুসরণ করা থেকে বিরত হয় না। তখন মহাপ্রভু ওদের সম্মুখে এক মায়ানদীর রূপ সৃষ্টি করেন। ফিরে যেতে বাধ্য হয় ওরা। ঐ স্থানটা এখনও চিহ্নিত করা যায়, বেশ কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন হরিভদ্র মহাশয়। তারপর বলেন, 'ঐ যে স্তুপটা দেখা যায়, ওটা নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট অশোক ঐ ঘটনাটাকে অমর করে রাখতে।'

'আগামীকাল ওখানে যাব আমরা, গুরুদেব?'

'নিশ্চয় মহারাজ।'

'আজ বরং বিশ্রাম নিন আপনি। অনুমতি দিন তো আগামীকাল দেখা হবে।'

'তাই হবে মহারাজ।'

ধর্মগুরু হরিভদ্র মহাশয় চলে যাওয়ার পর গভীর চিন্তার ভেতর ডুবে যান ধর্মপাল। উত্তরাবর্তে বৈদিক আর্যদের প্রাধান্য। মহামুনি গৌতম তাঁর তপোবলে ও অহিংস ধর্মের অনুশাসনে মানুষের অন্তর্জগত জয় করে এ ধর্মটাকে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা করেন এই বৈশালি নগরীতে। সেও তো প্রায় দেড় হাজার বছর পেরোতে চলেছে। তারও আগে এখানেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল আর্যদের বৈদিক ধর্ম। মহামুনি বুদ্ধের এই অহিংস ধর্ম প্রসারের শুরুর দিকেই আবার ভগবান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রবর্তনা করেন এই বৈশালি নগরীতে। শত শত রাজা মহারাজার জন্ম দিয়েছে এই নগরী। যতই আবেগমথিত হোন না কেন এই নগরীর প্রতি ধর্মপাল, যদি এ নগরীতে নিজেকে বেঁধে রাখতে চান তাহলে আর অন্য শত শত রাজার ভেতর আরও একজন রাজা হয়েই ইতিহাসে টিকে থাকবেন হয়তো, পালবংশের ভিন্ন কোনো ইতিহাস সৃষ্টি করবে না এ নগর। এটা বরং তীর্থনগর হিসেবেই টিকে থাকুক আগামী শত সহস্র বছর। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ধর্মপাল, তীর্থযাত্রার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পরপরই ছেড়ে যাবেন এ নগর। বিক্রমশীলা মহাবিহারে শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করবেন ইতিহাসের এক অমর কীর্তি। পিতাজি গোপালদেবের প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুর মহাবিহারের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের সিদ্ধান্তও নেন। পাল রাজাদের পৃথক ইতিহাস এই উত্তরাবর্তে রেখে যাওয়ার আজীবন সাধনা অব্যাহত রাখতে চান তিনি। এই বাসনা মনে নিয়ে দিনশেষের বিশ্রামের জন্য প্রস্তুতি নেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকাশ কালো করে মেঘ নেমে সন্ধ্যার অন্ধকার এগিয়ে এসেছে বৈশালির প্রাচীন প্রকৃতিতে। বেশ বড় বড় ফোটায় এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে আকাশ আবার কিছুটা হালকা হয়ে যায়। তারপর বিরামহীন বৃষ্টি নামে ঝিরঝিরিয়ে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর মহারাজ দেখেন এক সূর্যালোকোজ্জ্বল সকাল। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর একটা খুশি খুশি ভাব দেখা দেয়। রাতের বৃষ্টি ও মৃদুমন্দ বাতাস দিনের তাপমাত্রা সহনীয় রেখেছে অনেকটা। গুরুদেব হরিভদ্র মহাশয় সহ কয়েকটা বিহার ঘুরে দেখা ও পূণ্যতোয়া অভিষেক পুষ্করিণীর ধারে কিছুটা সময় কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন ধর্মপাল।

কিছুক্ষণ পর রাজভৃত্য খবর নিয়ে আসে যে হরিভদ্র মহাশয় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তবে গুরুতর কিছু না। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার আকস্মিক পরিবর্তন সহ্য করতে না পেরে শরীরে জ্বরবিকার দেখা দিয়েছে। রাজবৈদ্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। আশা করা যায় শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবেন। মহারাজের দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

যুদ্ধযাত্রা না থাকলেও রাজকার্যে বিশ্রামের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন মহারাজ। প্রাসাদ ভবনের ভেতর শুয়ে-বসে ও পারিষদদের সঙ্গে খোশগল্প করে একটা দিন কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রাজবিদূষক গঙ্গাধরকে ডেকে পাঠান দিনটা মহারাজের সঙ্গে কাটানোর জন্য।

বৈশালির যে প্রাসাদে মহারাজ অবস্থান করছেন তা লিচ্ছবিদের অনেক পুরোনো এক রাজবাড়ি। বর্তমান রাজা এটার সংস্কার করে রাজ-অতিথিদের জন্য পুনর্নির্মাণ করেছেন। জাঁকজমকে এখন তাঁর নিজের প্রাসাদকেও ছাড়িয়ে গেছে ওটা।

প্রাসাদে এসে যখন পৌছায় গঙ্গাধর তখন প্রাতরাশ সেরে বিশ্রাম নিচ্ছেন মহারাজ। আভূমি নত হয়ে মহারাজকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায় গঙ্গাধর। ইঙ্গিতে আসন গ্রহণ করতে বলেন ওকে মহারাজ। ওর দিকে তাকিয়ে বলেন–

'তোমাকে দেখেই তো হাসি পাচ্ছে আমার গঙ্গাধর!'

'তাহলে তো মৌনি হয়ে রইলেই চলবে আমার প্রভু মহারাজ।'

'না, তা হবে না। বল, তোমার কুশলাদি শুনি আগে।'

'আজ্ঞে সব ভালো মহারাজ।'

'সব ভালো?'

'প্রভুর কৃপায়।'

'কোন প্রভু গঙ্গাধর?'

একটু খটকায় পড়ে গঙ্গাধর। সুযোগ পেলে কথা যেমন প্যাঁচান মহারাজ, কোথায় যে আটকে ফেলবেন বোঝা কঠিন। একটু ভেবে বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্ভয়ে বলব মহারাজ?'

'বল।'

'মহারাজ, এই অধীনের প্রভু ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে ঘরের গিন্নি পর্যন্ত।'

একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকান ধর্মপাল। চোখে বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করেন–

'এ কেমন কথা গঙ্গাধর, তোমার গিন্নিও আবার প্রভু হলো কী করে!'

'ঠিক ঐ অর্থে বলিনি মহারাজ। ঐ যে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আর আমিও বলেছিলাম প্রভুর কৃপায় ভালো।'

'ব্যাখ্যা কর গঙ্গাধর, তুমি বড় বেশি বুদ্ধি রাখ।'

'মার্জনা করবেন মহারাজ।'

'বল, বল।'

'এই ধরুন, প্রাণে বেঁচে আছি ভগবান বুদ্ধের কৃপায়, শান্তিসুখে বসবাস করছি মহারাজের কৃপায়, তারপর ধরুন এবেলা যে পেট পুরে খেয়ে এসেছি তা গিন্নির কৃপায়।'

হেসে উঠেন মহারাজ।

'তাই বলে কী গিন্নিও তোমার প্রভু হল?'

'ছোটো প্রভু আর কী, মহারাজ।'

'তার মানে তো অনেক প্রভু তোমার। তা গঙ্গাধর তুমি কতজনের প্রভু?'

জিভ কাটে গঙ্গাধর। চুপ করে তাকিয়ে থাকে মেঝের দিকে।

'তুমি কী বোকা না বুদ্ধিমান মাঝে মাঝে বুঝে উঠতে পারি না আমি, গঙ্গাধর।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'বোকা?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'না বুদ্ধিমান?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব আমি গঙ্গাধর।'

ওর কাঁচুমাচু অবস্থা দেখে মনে মনে হাসেন ধর্মপাল। সোজাসুজি কথা না বললেও মানুষটি খুব ভালো গঙ্গাধর। সেই কবে থেকে আছে রাজপরিবারের সঙ্গে। ভ্রাতা বাকপাল প্রাগজ্যোতিষে যুদ্ধযাত্রার সময় ওকে বালকভৃত্য হিসেবে এনে দিয়েছিল হরিকেলের কোনো এক সৈনিক। ওর আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে। ওর বাল্যকালে পিতামাতা গত হওয়ায় ঐ সৈনিকের ভৃত্য হিসেবে কাজ করত সে। বাকপালের কাছে আবেদন জানিয়েছিল যে ক'বছর পর সৈন্যদলে ভর্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে সে। ওর মজার মজার সব কথা শুনে বাকপালের সঙ্গে থাকা বিদূষক ওকে ভৃত্য হিসেবে রেখে দেয়। এভাবে অনেকবার হাতবদল হয়ে এখন তো রাজবিদূষক। মানুষটা আসলেই ভালো। কিন্তু পূর্ববঙ্গের মানুষের স্বভাবগত দ্বৈততা রয়েছে ওর ভেতর।

কিছুক্ষণ পর মহারাজ বলেন–

'তোমার বাল্যস্মৃতি কিছু বল গঙ্গাধর, পূর্ববঙ্গের তামাসা শুনি।'

'সে-সবের ভেতর তো অনেক করুণ রস মেশানো, মহারাজ।'

'তাই বল না।'

'এই বৈশালি নগরে বসে এখানের বিষয় নিয়ে কথা না বললে লিচ্ছবিরা আমার মাথাটা কাঁধে রাখবে তো মহারাজ?'

হাসেন ধর্মপাল। বলেন–

'ঠিক আছে বল গঙ্গাধর, নতুন করে বৈশালির আর কী শোনাবে।'

'সবই মহারাজের শোনা, তাও বলি, এই বৃষ্টিবাদলের দিনে একটু প্রণয়রস হয়তো জমবে ভালো।'

নড়েচড়ে বসেন ধর্মপাল।

'বল।'

'অর্হৎ আম্রপালী নিয়ে কিছু বলি মহারাজ।'

'অম্বিকাপালীকে নিয়ে নতুন আর কী বলবে?'

'আজ্ঞে মহারাজ মাগধীতে অম্বা আর বঙ্গে আম্র।'

'হ্যাঁ, অর্হৎ অম্বিকাকে রাজকাননের আমগাছ তলে কুড়িয়ে পাওয়া গেছিল আর শিশু অবস্থায় ওর সৌন্দর্য বৈশালিবাসীকে মুগ্ধ করেছিল।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'এগারো বছর বয়সে ওকে বৈশালির শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। জনপথ কল্যাণী হিসেবে নিজপ্রাসাদে সাত বছরের জন্য 'নগরবধূ' করে রাখা হয়েছিল।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'গল্পটা আমি শোনাব, না তুমি।'

'আমি শুনতে পারি, আবার শোনাতেও পারি মহারাজ।'

'অনেক গুণ তোমার গঙ্গাধর, তোমার পিতামাতা নাম রাখতে পারতেন গুণধর।'

মাথা নিচু করে হাসে গঙ্গাধর।

'বল গঙ্গাধর, বল।'

'মহারাজ তো সবই জানেন, বৈশালির আট ক্ষত্রিয় রাজার মধ্যে সব চেয়ে বেশি শক্তিমান ও প্রভাবশালী রাজা মনুদেব আম্রপালীর নাচ দেখে এতই মুগ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন যে তাঁকে নিজের করে পেতে চেয়েছিলেন। আম্রপালীকে নিয়ে রাজ্যে যেন কোনো যুদ্ধ না বাঁধে সেজন্য বৈশালির নিয়মে ওকে নগরবধূর মর্যাদা দিয়ে নিজ প্রাসাদে রাখা হয়েছিল সাত বছরের জন্য। আম্রপালীর শৈশব থেকে শুরু হওয়া ভালোবাসার পুরুষ, বাগদত্তা কীশোরকুমারকে বিয়ের রাতেই হত্যা করে পথের কাঁটা দূর করেন রাজা মনুদেব। বৈশালির পার্শ্ববর্তী রাজ্য মগধের রাজা বিম্বিসার আম্রপালীর রূপের কথা শুনে বৈশালি রাজ্য আক্রমণ করে আম্রপালীর গৃহে আশ্রয় নেন। বিম্বিসার ছিলেন খুব ভালো গায়ক। আম্রপালী ও বিম্বিসার মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হয়। রাজা বিম্বিসারের পরিচয় জানার পর আম্রপালী তাঁকে আদেশ দেয় বৈশালির সঙ্গে যুদ্ধ থামাতে। আম্রপালীর প্রেমে অন্ধ বিম্বিসার যুদ্ধ থামিয়ে দেন। বৈশালির মানুষেরা তাঁকে কাপুরুষ হিসেবে গণ্য করে। আম্রপালীর গর্ভে বিমল কোন্ডনা নামে এক পুত্রও জন্ম নিয়েছিল রাজা বিম্বিসারের।

রানি কোশল দেবীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন বিম্বিসার পুত্র রাজা অজাতশত্রু। তাঁর ভাইদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে বৈশালি আক্রমণ করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ঐ নগরটিকে। আম্রপালীকে বন্দিশালায় আটকে রেখে সমগ্র বৈশালি নগরী আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলেছিলেন রাজা অজাতশত্রু। আম্রপালী ছাড়া নগরের প্রায় সবাই পতিত হয়েছিল মৃত্যুমুখে। নিজের মাতৃভূমিকে এভাবে ধ্বংস হতে দেখে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা আম্রপালী নিজের প্রেম ফিরিয়ে নিয়েছিল।

জীবনের একটা সময়ে এসে আম্রপালী মহাপ্রভু বুদ্ধকে একবেলা আহার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। বৈশালি রাজ্যের নিয়ম অনুসারে রাজা অজাতশত্রুর কারণে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন প্রভু বুদ্ধ। এরপর 'নগরবধূ'র অবস্থান থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয় আম্রপালী। প্রভু বুদ্ধের অনুশাসন মেনে অবশিষ্ট জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেন। এরপর তো তিনি অর্হৎ হিসেবেই নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর পুত্র বিমলও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন।'

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন মহারাজ ওর গল্পটি। গঙ্গাধরের এ এক আশ্চর্য প্রতিভা। ওর গল্প বলার ধরনটাই যে-কাউকে মুগ্ধ করে রাখে। অনেকবার শোনা গল্পও আরও একবার শুনতে ইচ্ছে করে। এটা হয়তো পূর্ববঙ্গীয় মানুষদের গল্প বলার কৌশল। ওরা নাকি ওদের শিশুদের ঘুম পাড়ায় গল্প শুনিয়ে। মহারাজ জিজ্ঞেস করেন–

'বল তো গঙ্গাধর, এতবার শোনা এ গল্প, আর পুরো বৌদ্ধ সমাজই জানে যে গল্পটা, আজ আবার কেন শোনালে? নিশ্চয় কোনো কারণ আছে?'

'না মহারাজ কোনো কারণ নেই। শুধু এটা মনে করা যে অপরূপ সৌন্দর্যও মানুষের ধ্বংসের কারণ হতে পারে যদি এটাকে সে কেবলি নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে পেতে চায়। রাজা বিম্বিসারের মনের পাপে এত কিছু শুরু। লিচ্ছবিরা সবাই মিলে যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিল যে এই সৌন্দর্যকে 'নগরবধূ' হিসেবে মর্যাদা দিয়ে উন্মুক্ত করে রাখা হবে এবং আম্রপালীর ইচ্ছানুসারে ওর প্রেমিক গ্রহণ করা যাবে, এটা রক্ষা করা হলে পরবর্তী এত সব কিছু ঘটত না। নবকিশোরকে নিয়ে সুখে জীবন যাপন করতে পারত আম্রপালী। অজাতশত্রুর প্রয়োজন হত না বৈশালি নগরীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা, এত নরহত্যা, এত পাপকর্ম করা।'

'আম্রপালী তো তাহলে অর্হৎ হিসেবে নির্বাণও পেত না।'

'একজনের নির্বাণের জন্য লক্ষজনের নিধন কী মেনে নেয়া যায় মহারাজ!'

'ধর্ম বড় জটিল গঙ্গাধর।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

আবার ভাবনারাজ্যে ডুবে যান মহারাজ ধর্মপাল। কেন এই রাজ্যপাট, কেন এই যুদ্ধ, কেন এতসব মহাযজ্ঞ! জীবনের এই শেষবেলায় এসে মনের ভেতর এল এটা!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

ধীরে ধীরে শীতের প্রকোপ কেটে যেয়ে প্রকৃতিতে বসন্তের সকল চিহ্ন ফুটে উঠতে শুরু করেছে। কিন্তু শীতঋতুর শেষ ক'টা দিন উত্তর থেকে এমনই হিম বয়ে আনে যে এদেশে প্রবাদ গড়ে উঠেছে যে মাঘের শীতে নাকি বাঘও কাঁপে। মাঘের ঐ বাঘ-কাঁপানো শীতটা এখনও নেমে আসেনি উত্তরাবর্তে। হয়তো শেষের দিকে উত্তর থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসে বিদায় নেবে শুকনো পাতা ঝরা শীত ঋতু। আমগাছে মুকুল আসতে শুরু করেছে। পলাশ, কৃষ্ণচূড়া, পারিজাতের মতো গাছগুলো আকাশে আগুন ধরানো লাল রঙের আভা ফুটিয়ে উঠাতে শুরু করেছে। বসন্তের পাখি কোকিলের কুহুতান আর বউ কথা কও পাখির কলগুঞ্জন সহ শত শত পাখির ঝাঁক আকাশ ছেয়ে ফেলে প্রকৃতির এই অপার আয়োজনে।

ধীমানের মনে এবার অন্য রঙের খেলা। জীবনের অনাস্বাদিত এক আনন্দের সন্ধান পেয়েছে সে সুতন্বীর সংস্পর্শে এসে। কাজে মন বসে না। সারাক্ষণ মনে হয় ওকে নিয়ে বনবাদাড়ে, সবুজ প্রান্তরে, নদীতীরে ঘুরে বেড়ায়, হারিয়ে যায়।

শুরুতে এমন ছিল না বিষয়টা। ওর এই উরু উরু ভাবটার কারণ খুঁজে না পেয়ে আরও বেশি করে কাজ চাপিয়ে দেয় নিজের উপর। সে-সব আর শেষ হয় না। একটু ভাবনায় পড়ে তারানাথ। লক্ষ্য করে দেখেছে সে যে এটার শুরু হয়েছে ধীমানের গ্রামের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর। ওখানে কিছু ঘটেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি তারানাথ।

মহাবিহারের যেখানে ধীমানের গড়া টেরাকোটার কাজগুলো ব্যবহার করা হচ্ছিল সেখানটা পরিদর্শনের জন্য ধীমানকে নিয়ে বেরোয় তারানাথ। শহর প্রাচীরের বাইরের দিকে ফলের গাছগুলো মাটিতে প্রায় নুইয়ে পড়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলগাছগুলোর পাতা থেকে ফলের পরিমাণই যেন বেশি। গাছগুলো যেন জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জল দেয়া সরস মাটির কাছে প্রণতি জানাতে সব ক'টা শাখাকে নুইয়ে দিয়েছে মাটিমায়ের কাছে। ছোটো ছোটো করমচা ঝোপে লাল-হলুদ ফলের সমারোহ এক অদ্ভুত সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। হেঁটে যেতে যেতে অবাক চোখে প্রকৃতির এই রূপ দেখে ধীমান। যেন জীবনে এবারই প্রথম দেখছে এসব। এক নতুন মাত্রা নিয়ে এসব ধরা দেয় ওর চোখে।

মহাবিহারের নির্মাণযজ্ঞের কাজ চলছে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। গাছপালা সব কেটে ফেলা হয়েছে। কাজ শেষ হলে আবার দৃষ্টিনন্দনভাবে নতুন করে রোপণ করা হবে ফাঁকা জায়গাগুলোয়। মহাবিহারের মূল প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢোকার জন্য কিছুটা ঘুরে যায় ওরা। আধক্রোশ হাঁটার পর চোখে পড়ে বিহারের কেন্দ্রস্থলের মূল ভবনের সিঁড়িপথ। দূর থেকে মনে হয় সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে একটা পর্বতের শিখরে উঠে গেছে। ভবনের চৌকো অংশটা আকাশে এক অসাধারণ জ্যামিতিক বিন্যাস সৃষ্টি করেছে। আর মাঝখানের কৌণিক অংশটা আকাশ ছুঁয়েছে। ওখানেই দাঁড়িয়ে যায় ওরা। নীল আকাশের পশ্চাতপটে লাল ইটের কারুকাজ দেখে মন ভরে যায়। সবকিছু ভুলে বিশাল এই সৌন্দর্যের সামনে থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধীমান। এই মহাকর্মযজ্ঞের একটা অংশ সে! গর্বে বুক ফুলে ওঠে ওর।

এই তন্ময় অবস্থা কাটিয়ে সামনে এগোয় ওরা। বিহার প্রাঙ্গণের চারপাশ উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ওগুলোর গায়ে ধীমানের গড়া টেরাকোটার প্লেটগুলো দেখে মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে গুরু ও শিষ্য দু'জনে। এই টেরাকোটার কাজগুলো যদিও তারানাথের করা না, তবু ওর শিষ্য ধীমানের কাজে এত বেশি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে যে ওর চোখে জল এসে যায়। কাছে যেয়ে প্রতিটা প্লেট স্পর্শ করে দেখে ধীমান। গুরু তারানাথ বলে–

'এগুলো শুধু পোড়ামাটির কারুকাজই না ধীমান, ওখানে গাঁথা আছে তোমার আত্মা। একজন শিল্পীর আত্মা ভাস্বর হয়ে থাকে তার শিল্পকর্মে। যে-কোনো শিল্পীই তাঁর শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে তার আত্মাকেই রচনা করে। তুমি এখন তোমার আত্মার একটা অংশকেই স্পর্শ করছ ধীমান। এ বড় সৌভাগ্যের বিষয় হে। এই শিল্পকর্মের ভেতর দিয়ে তোমার আত্মাটিও অমর হয়ে প্রস্ফুটিত থাকবে ওখানে ধীমান। ভবিষ্যতের মানুষেরা নিশ্চয় শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করবে এক মহান শিল্পী ধীমানের নাম। তবে এটা তোমার শেষ নয়। এখানেই শুরু। সামনে রয়েছে তোমার আত্মাকে নিজ হাতে গড়ে তোলার অনেকটা সময়। আমি তো বুড়িয়ে গেছি ধীমান। তোমার সামনে রইল শিল্পের অনেক বড় জগত। আমি আশীর্বাদ করি, সর্বকালের এক মহান শিল্পী হয়ে ওঠো তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় বড় ফোটায় জল জমে ধীমানের চোখে। গড় হয়ে প্রণাম করে গুরু তারানাথকে। মনের ভেতর যে চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছিল সুতন্বী তা পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। নিজের অন্তরকে সে এখন পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করে শিল্পের সাধনায়। অন্য সবকিছু গৌণ এখানে। এমনটাই হয়তো শিল্পের ধর্ম। অজাগতিক এক সাধনা, যা তুচ্ছ করে প্রেম, ভালোবাসা, অর্থ, বিত্ত, খ্যাতি, মোহ, সব, সবকিছু। মহাবিহারের সীমানা দেয়ালের চারদিক ঘুরে দেখতে যেয়ে শীতের ছোট্ট দিন শেষ হয়ে যায়। রৌদ্রের তাপ কমে যাওয়ায় শীত-লাগা অনুভূতি পায় ধীমান। মহাবিহারের দেয়ালগাত্রের শোভা চোখে নিয়ে ঘরে ফিরে আসে ওরা সেদিন।

রাতের খাবার নিয়ে আসে সুতন্বী। ওকে দেখা মাত্র আবার প্রেমভাব উথলে ওঠে ধীমানের ভেতর। কোথায় হারিয়ে যায় শিল্পচেতনা মনেও থাকে না আর। আরও গভীর প্রেমের ভেতর হারিয়ে যায় ওরা।

পরদিন সকালে শিল্পগুরুর সঙ্গে আবার বেরোয় মহাবিহারের পথে। হেঁটে আসতে আসতে আবার ওর শিল্পীমন নেচে উঠে শিল্পসৃষ্টির অদম্য আহ্বানে। বিহার প্রাঙ্গনে প্রবেশ করে আজ ওরা। মুগ্ধ হয় এর অপরূপ সৌন্দর্যে। বিহারের বাইরের দিকের সব কাজ, স্থাপনা নির্মাণ প্রভৃতি শেষ হয়েছে। এখন চলছে বৃক্ষ রোপণ ও বাগান সৃজনের কাজ। ঘুরে ঘুরে এসব দেখে ওরা। এরপর মহাবিহারের ভেতরে ঢুকে দেখে কুলুঙ্গিতে ও ছোটো বড়ো বেদীগুলোয় প্রতিমা স্থাপনের জন্য ভিত্তি নির্মাণ প্রভৃতি কাজ এগিয়ে চলেছে। তারানাথ বলে–

'এ মহাবিহারের ভেতর বুদ্ধের ধাতুনির্মিত মূল প্রতিমা ছাড়াও শত শত প্রতিমা নির্মাণ করা হবে তাঁর অনুসারী ও অর্হৎদের। এর একটা অংশ তোমাকেও নির্মাণ করতে হবে ধীমান।

'পোড়ামাটির প্রতিমা কী এই মহাবিহারের ভেতর মানাবে গুরুদেব?'

'একারণে সেদিন বলেছিলাম যে কষ্টিপাথরের মূর্তি গড়া শিখতে হবে তোমাকে।'

'আজ্ঞে গুরুদেব, শিখে নেব।'

খুশি হয় তারানাথ। ধীমানের মতো এমন একনিষ্ঠ শিল্পী পাওয়া একজন গুরুর জন্যও সৌভাগ্য বই কী।

মহাবিহারের প্রাঙ্গন জুড়ে শত শত পায়রা উড়ে বেড়ায়। নিরীহ এই পাখিগুলো মানুষের সান্নিধ্যে থাকতে ভালোবাসে। অন্য পাখিদের মতো গাছের ডালে বাসা না বেঁধে মানুষের ঘরবাড়ির ছাদের কার্ণিশে, দেয়ালের উঁচু কুলুঙ্গিতে বা ফাঁকফোকরে বাসা বাঁধে। খুঁটে খায় মানুষের উচ্ছিষ্ট খাবার। ঘরের ছাদে বসে আবাসস্থলের শোভা বাড়ায়। বিহারের আঙ্গিনায় এখন কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে অনেক শ্রমিক। ওদের একজন একটু সময়ের জন্য কাজ থামিয়ে এক মুঠো শস্যদানা হাতে নিয়ে বাড়িয়ে দেয় ওদের দিকে। ওর হাতে বসে ওগুলো ঠুকরে খায় অনেক ক'টা কবুতর। খুব শান্ত প্রকৃতির এই পাখিগুলো। খাবার নিয়ে বা অন্য যে-কোনো কিছু নিয়ে কখনো কামড়াকামড়ি বা মারামারি করতে দেখেনি সে ওদের।

মহাবিহারের মূল ভবনের তিন দিক ঘিরে নির্মাণ করা হয়েছে শত শত প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গড়া ভিক্ষুদের আবাসস্থল। ওগুলোর ছাদে যাওয়া যায় মূল ভবন হতে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে প্রবেশ করতে হয় ভেতরে। ওগুলোও ঘুরে ঘুরে দেখে তারানাথ ও ধীমান। আবাসকক্ষগুলোর ভেতরও বসাতে হবে ছোটো ছোটো মূর্তি। কত শত মূর্তি যে নির্মাণ করতে হবে ভেবে পায় না ধীমান। ধীমানের ভেতর যে এক নিশ্চলাবস্থা তৈরি হয়েছিল তা কেটে গেছে এই দু'দিনের গুরুসান্নিধ্য ও বিহার ভ্রমণে। কিন্তু জন্ম নিয়েছে এক নতুন দ্বৈততা। দিনের সময়টুকুতে ডুবে থাকে কষ্টিপাথর কাটার কঠিন শ্রমের ভেতর। রাত নেমে এলে ওকে আবিষ্ট করে রাখে সুতন্বীর কোমল শরীর। কঠিন ও কোমলের এই দ্বন্দ্বে দিশে হারিয়ে ফেলে ধীমান। এক রাতে সুতন্বীর কাছে সরাসরি প্রণয় প্রার্থনা করে সে–

'চল আমরা বিয়ে করি সুতন্বী।'

মাটিতে চোখ নামিয়ে নেয় সুতন্বী। ধীমান বুঝতে পারে এতে ওর অমত নেই। পরদিনই গুরু তারানাথের কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করে ধীমান। বিস্মিত হয় তারানাথ। এ রকম কিছু ভেবে দেখেনি সে কখনো। তারানাথও জাতশিল্পী। জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গও যে অপ্রধান নয় তা মাথায় আসেনি এতদিন। চোখের আড়ালে যে অনেক কিছু ঘটতে পারে বা ঘটে চলেছে তা খেয়ালই হয়তো ছিল না ওর। প্রয়াত গুরুর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা-বন্ধনে জড়িয়ে আছে সে। কন্যাটিকে ওর নিজবংশে পাত্রস্থ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ সে। চোখের সামনে এই ছোট্ট বালিকাটি কবে যে রমণী হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করেনি তারানাথ। সবকিছু ভেবে বলে–

'ওটা যদি সম্ভব হত তাহলে সব চেয়ে বেশি খুশি হতাম আমি ধীমান। তোমাদের দু'জনের চেয়েও বেশি নিশ্চয়। তোমরা দু'জনে আমার পুত্র ও কন্যাতুল্য। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞায় বাঁধা ধীমান। সুতন্বীর পিতা, আমার গুরু অঞ্জনদেবের মৃত্যুশয্যায় অঙ্গীকার করেছিলাম যে ওকে ওদের কুলে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব। এটা তো রক্ষা করতে হবে আমাকে ধীমান। সুতন্বী যে সনাতন ধর্মের।'

একটুও না ভেবে বলে ধীমান–

'আমি যদি ওর ধর্মটা নেই গুরুদেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা হয় না ধীমান। আমি তোমার পিতৃদেবকে জানি। কত বড়ো সেনাপতি তিনি। আমার এ দুঃসাহস নেই যে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হই। তাছাড়া সনাতন ধর্মটা কেউ গ্রহণ করতে পারে না। ছেড়ে যেতে পারে। কোনোভাবেই এ হবার নয় ধীমান।'

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে গুরুকে প্রণাম করে নিজের ঘরে ফিরে আসে ধীমান। কোনো কাজে আর মন বসে না। রাতে সুতন্বী খাবার নিয়ে এলে সব কথা খুলে বলে। পরের দিনগুলোয় কাজেও যায় না আর। বিষয়টা বুঝতে পারে তারানাথ। এ নিয়ে কোনো চাপাচাপি করে না। হয়তো সময়ই বদলে দেবে সব। কিছুদিন এমনি বয়ে যেতে দেয় সে।

নিজেকে নিয়ে কিছু ভেবে উঠতে পারে না ধীমান। ওর ক্ষেত্রেই কেন এমনটা হচ্ছে! সুভদ্রার সঙ্গে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। সুভদ্রা আপত্তি জানিয়েছিল ওরা নিচুকূলের বলে। আর এখন অন্য ধর্মাবলম্বী হয়েও সম্মতি জানিয়েছে সুতন্বী। কিন্তু ওর বাবার ইচ্ছে পূরণ করতে যেয়ে ওটাও ঘটাতে পারছে না গুরুদেব। মানুষের জীবন কী কিছুই না। কূল, ধর্ম এসবই কী সবকিছুর নিয়ন্তা! ধীমান একজন শিল্পী। শিল্পকেই সে ধর্ম বলে মেনে এসেছে। সামাজিক এই ধর্মীয় বিধিনিষেধ ওর কাছে অলংঘ্য নয়। কিন্তু সমাজ তা হতে দেবে কেন?

সুতন্বীর সঙ্গে পরামর্শ করে এক রাতে। শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নেয় যে ওদের কেউই বিয়ে করবে না। কিন্তু এভাবে এত কাছাকাছি থাকলে যে-কোনো অঘটন ঘটে যেতে পারে। ধীমানের মনে পড়ে গুরুদেব তারানাথকে দেয়া মহারাজ ধর্মপালের আদেশটি। বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে ওটা স্থগিত রেখেছিলেন গুরুদেব। পরদিন সকালে সে তারানাথকে বলে সোমপুরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে।

প্রিয় শিষ্য ধীমানকে হারানোর ব্যথা ওর বুকে শেলের মতো আঘাত হানলেও সবকিছু ভেবে বিষয়টা মেনে নেয় তারানাথ।

প্রকৃতি জুড়ে ঋতুরাজ বসন্ত এসেছে পূর্ণ সাজে। চারদিকে ফুল ও ফসলের সমারোহ। যত প্রাণী আছে এই প্রকৃতিতে তার সব বেরিয়ে এসেছে বছরের আশ্চর্য এই বিশাল পরিবর্তনে। সরিসৃপগুলো বেরিয়ে এসেছে দীর্ঘ শীতঘুম ছেড়ে। গবাদি পশুগুলো কচি ও সবুজ নতুন ঘাসের প্রাচুর্যে ছোটোছুটি করে মাঠেঘাটে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এরিমধ্যে। উত্তরের বরফগলা পানি আসতে শুরু করেছে নদীগুলোয়। বালুচরের চকচকে সাদা বালুকণাগুলো জলের স্পর্শে ঝিকমিক করে উঠে। মনের ভেতর সুখ নেই কেবল ধীমানের।

পরদিন ধীমানের মুখোমুখি হয়ে কিছুটা বিস্মিত হয় তারানাথ। সে বুঝতে পারে যে জীবনের শুরুতে একটা উল্টাপাল্টা ঝড় বয়ে গেছে এই প্রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বালকটির ভেতর দিয়ে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় সে আরও ক'টা দিন থেকে যেতে বলবে ওকে এখানে। সোমপুর যাওয়ার আগে অন্য একদু'টা তীর্থস্থান ঘুরিয়ে আনবে ওকে। মনের এ অবস্থায় কঠিন পরিশ্রমসাপেক্ষ শিল্পনির্মাণ প্রায় অসম্ভব। মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল হয়ে না উঠলে ভালো কিছু করা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না ওর পক্ষে।

মহারাজ ধর্মপাল যখনই সুযোগ পান মহাবিহারের নির্মাণ কাজ দেখতে আসেন। ধীমানের শিল্পনৈপুণ্য দেখে ওকে নির্বাচন করেছিলেন তিনি। এমন অবস্থায় ওকে সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া শাব্দিক অর্থেই তারানাথের গুরুদায়িত্ব।

প্রথমে ওর কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন তারানাথ। তারপর বলেন–

'তোমাকে একটা কথা বলব ভেবেছি ধীমান।'

'আদেশ করুন গুরুদেব।'

'তোমাকে পুত্ররূপে স্নেহ করি আমি ধীমান।'

'জানি গুরুদেব।'

'তোমার মনে কোনো কষ্ট দেয়া আমার জন্য কতটা যন্ত্রণার তাও নিশ্চয় বুঝতে পার।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'একটা বিষয় তো বোঝো ধীমান, অন্যান্য প্রাণীদের বেঁধে রাখা যায় শেকল দিয়ে, রজ্জু দিয়ে, কিন্তু মানুষ বাঁধা থাকে শব্দে। এই যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, এসবই তো শব্দে, ধর্মবাক্য উচ্চারণ করি, প্রার্থনা করি, শপথ নেই, কথা রাখি, কথা দেই, সবই তো শব্দে।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'আমার গুরুদেবের কাছে কথা দেয়ার শেকলে বাঁধা আমি। জীবিতাবস্থায় এটা ছিন্ন করার সাধ্য কী আমার আছে ধীমান?'

'না গুরুদেব।'

'আশা করি বিষয়টা বুঝেছ তুমি।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'যে কথাটা বলতে চেয়েছি তোমাকে, তোমার মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থাটা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে আমাকে। আমার মনে হয় আরও ক'টা দিন এখানে থেকে যাও তুমি।'

'এখানে আর কোনো কাজ তো নেই আমার গুরুদেব।'

'আমি ভেবেছি এক-দুটো তীর্থে যাব তোমাকে নিয়ে। প্রথমটা হল নালন্দা মহাবিহার, যেখান থেকে আমি শিখি প্রাচীন শিল্প-স্থাপত্যকলা, আর দ্বিতীয়টা হল মহারাজ ধর্মপালদেবের পিতা রাজা গোপালদেবের গড়া ওদন্তপুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাবিহার, এখান থেকে আমরা শিখি নতুন শিল্পকলা-রীতি। সোমপুর মহাবিহারে এ দুটোর মিশ্রণ ঘটাতে হবে তোমাদের। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সম্মিলনে যা ঘটে তা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। আমার ইচ্ছে এই সম্ভাবনাটাকে কাজে লাগাও তোমরা ওখানে।

তারানাথের এ প্রস্তাব আশ্চর্যরকমভাবে প্রভাবিত করে ধীমানকে। লাফিয়ে ওঠে ওর অন্তর। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠে ওর শিল্পচেতনা, যা একইসঙ্গে ওর আত্মা। একজন প্রকৃত শিল্পীর আত্মা হল তার শিল্পচেতনা। অন্য সবকিছু সাময়িক, মানবিক সম্পর্কের সংঘাত বা সমন্বয়। ওর চোখ চকচক করে ওঠে। ইতোমধ্যে কিছুটা অভিজ্ঞও হয়ে উঠেছে ধীমান। মনের এই আবেগ ও চাঞ্চল্য সংযত করে ধীরে ধীরে বলে–

'আজ্ঞে গুরুদেব, তাই হবে।'

'ঠিক আছে ধীমান, ক'টা দিন মুক্তভাবে ঘুরে বেড়াও এ নগরটা। বিক্রমশীলার এই মহাবিহারে তোমার হাতের ছোঁয়া অমর হয়ে থাকবে। তোমার হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে যাও ওগুলো। সোমপুর বিহারে তোমার সবটুকু যেন উজাড় করে দিতে পার। তোমাকে জানি আমি ধীমান। একজন প্রকৃত শিল্পী তুমি। আর শিল্পীর প্রকৃত প্রেম হচ্ছে তার শিল্পকর্ম। তোমার এ নশ্বর জীবন ফুরিয়ে যাবে খুব দ্রুত। কিন্তু তোমার শিল্পকর্ম টিকে থাকবে স্মরণাতীতকাল পর্যন্ত। এখন যাও তোমার যেখানে খুশি ধীমান। আমি আশীর্বাদ করি তোমাকে।'

গড় হয়ে প্রণাম করে ওকে ধীমান। তারপর নিঃশব্দে সরে আসে ওখান থেকে। ওর অন্তরের চোখ খুলে দিয়েছে গুরুদেব। একজন শিল্পীর প্রকৃত প্রেম হল তার শিল্প। এখন থেকে জীবনের বাকি দিনগুলো ঐ প্রেমের সন্ধানে, ওটার সান্নিধ্যে কাটিয়ে দেবে। অন্য কোনো প্রেম চাইনে ওর।

ক'দিন ঘুরেফিরে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটিয়ে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আসে ধীমানের ভেতর। মানবিক প্রেমের যে জোয়ারে ভেসে গেছিল ধীমান তাতে ভাটার টান না লাগলেও সেই বাঁধভাঙা প্লাবনটা আর নেই। প্রকৃতিতে বসন্তের সমারোহ, বিচিত্র রঙে আয়োজন, পাখিদের কলকাকলি, পতঙ্গের ওড়াউড়ি, ফুলের সুবাস আনমনা করে তোলে ওকে আবার। মনে হয় এসবকিছু ওর জন্য নয়। প্রকৃতির যথেচ্ছ লীলাখেলা এগুলো। ওর কাজ পাষাণের বুকে এসব ধরে রাখা। আকাশে উড়ে চলা চঞ্চল পাখির মোহন ভঙ্গিটা পাথরের উপর মূর্ত করে রাখা, গাভীর হাম্বা রব, মানুষের বিভিন্ন ভঙ্গি, প্রকৃতির রূপ, এসব ফুটিয়ে তোলা, আর কিছু না।

এক রাতে খাবার নিয়ে এলে সুতন্বীকে বলে ধীমান–

দেবপাল-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সুতন্বী। ওটায় যে একটু পরিবর্তন আনতে হয়।'

'কী ওটা?'

'তুমি বিয়ে করবে সুতন্বী।'

ধীমানের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকায় সে। পিদিমের লালচে আলোয় অচেনা তো মনে হয় না ওকে। তাহলে এ রকম কথা বলছে কেন! স্বল্পভাষী সুতন্বী কিছু বলে না। আবার জিজ্ঞেস করে ধীমান–

'কিছু বলছ না, সুতন্বী?'

এবার কিছুটা তরল হয় সুতন্বী। বলে–

'বিয়ে ঠিক করে রেখেছ নাকি?'

হেসে উঠে ধীমান। বলে–

'না সুতন্বী। ওটা গুরুদেব করবেন। এবং নিশ্চিত বিচক্ষণতার সঙ্গেই করবেন। আমার মতো প্রগল্‌ভ তো আর নন তিনি।'

কিছু বলে না সুতন্বী। ধীমানের খাওয়া শেষ হয়েছে। থালাবাটি ওঠানোর সময় বলে সুতন্বী–

'তুমি বিয়ে করছ না কেন ধীমানদা?'

চমকে উঠে ধীমান। এটা তো ভাবেনি কখনো। এমন একটা জিজ্ঞাসা যে ওর থাকতে পারে তা মাথায়ই আসেনি। একটু পরে বলে–

'আমি তো বিয়ে করেছি সুতন্বী।'

চোখে হাসি ফুটিয়ে মাটির প্রতিমাগুলোর দিকে তাকায়। ওগুলো দেখিয়ে বলে–

'ওদের?'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ তুমি। আমার অনেক স্ত্রী। আরও হবে।'

এই প্রথম সুতন্বীকে কলকলিয়ে হেসে উঠতে দেখে ধীমান। অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় জিজ্ঞেস করে সুতন্বী–

'আমার একটা মূর্তি গড়ে দেবে ধীমানদা?'

জগতসংসার আবার অন্য রকম হয়ে উঠে ওর কাছে। উঠে যেয়ে ওর হাত ধরে। ফিসফিসিয়ে বলে–

'নিশ্চয় দেব সুতন্বী।'

ধীমান বুঝতেও পারেনি যে ওর কাছ থেকে কতটা দূরে সরিয়ে নিয়েছে ওকে সুতন্বী। ওর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে–

'না, ধীমানদা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় সুতন্বী। সারারাত আর ঘুমাতে পারে না ধীমান। অভূতপূর্ব এক অন্তর্দহনে জ্বলতে থাকে। আত্মার জন্য নিজেকে কত আর ক্ষতবিক্ষত করবে সে। আত্মা তো দেহনির্ভর। দেহেরও তো একটা প্রেম আছে। প্রতিমার শরীর আছে। ওখানে প্রেম তো নেই। শরীর নির্ভর আত্মার আছে প্রেম। কোনটাকে অস্বীকার করবে ধীমান!

দেহ না থাকলে আত্মার অবস্থান কোথায়? কোনোভাবেই নিজেকে বোঝাতে পারে না ধীমান।

পরের দুটো দিন নিবিড় প্রকৃতির সান্নিধ্যে কাটিয়ে নিজেকে কিছুটা শান্ত করে আনে ধীমান। গাছে গাছে বিচিত্র রঙের ফুল ফোটা দেখে। নদীতে জলের প্রবাহ বেড়ে ওঠা দেখে। ছোটো বড় প্রাণী ও কীটপতঙ্গের চাঞ্চল্য দেখে ঘুরে ঘুরে।

কর্মশালায় এসে কাদামাটির একটা স্তূপের কাছে যেয়ে বসে। সুতন্বী বলেছিল ওর একটা প্রতিমা গড়ে দিতে। সিদ্ধান্ত নেয় যাওয়ার আগে এই ক'দিনে একটা প্রতিমা নির্মাণ করবে।

মনের সবটুকু মাধুরী ঢেলে একটা প্রতিমা নির্মাণ করে ধীমান। আগুনে পুড়িয়ে ওটাকে স্থায়ী করে। তারপর নিপুণ হাতে ওটার গায়ে ফুটিয়ে তোলে সূক্ষ্ম কারুকাজ। সুতন্বীর ঐ রাতের হাসিমুখটা পুরোপুরি গেঁথে রয়েছে মনের ভেতর। ওর ঠোঁটের পরিমিত প্রসারণ, গালের টোল, উন্নত নাসা, নাসারন্ধ্রের কিছুটা বিস্তৃতি, চোখের চাঞ্চল্য, সবকিছু ফুটিয়ে তুলে শৈল্পিক হাতের ছোঁয়ায়।

যাবার আগের দিন সুতন্বীর হাতে তুলে দেয় ওটা। খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সুতন্বী। জিজ্ঞেস করে–

'এটা কী আমার প্রতিমা ধীমানদা?'

'কেন, চেনা যায় না তোমাকে?'

'পুরোপুরি যায় না।'

'আমি তো পুরোপুরি চিনতে পারছি তোমাকে।'

'নিজের মুখ তো আর নিজে দেখতে পাই না। প্রতিবিম্বে যতটুকু দেখি তাতে মনে হয় মুখটা আমারই। কিন্তু শরীরটা মনে হয় না আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়। ঠিকই তো, ঐ নৃত্যভঙ্গিটা ওর নয়। ওটা পুরোপুরি সুভদ্রার। সুভদ্রার যে মূর্তিটা ওর সঙ্গে রয়েছে ওটার সঙ্গে আশ্চর্য মিল এ মূর্তিটার দেহভঙ্গিমার। সুতন্বীর শিল্পবোধের প্রশংসা করে মনে মনে। আগেও এ স্বাক্ষর রেখেছে সুতন্বী। ওর শিল্পবিচারটি অসাধারণ। যারা নিজ হাতে শিল্পনির্মাণ করে না অথচ সারাক্ষণ থাকে এগুলোর সংস্পর্শে তাদের মধ্যে মনে হয় খুব উন্নতমানের শিল্পবোধ বা শিল্পবিচারবোধ গড়ে উঠে। ধীমান বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ঠিক আছে সুতন্বী। এটা থাক আমার কাছে। আরেকটা গড়ে দেব তোমাকে।'

সম্মত হয় না সুতন্বী। বলে–

'না, ধীমানদা এটাই নিলাম আমি।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি ধীমানদা। হয়তো আমার মুখটাই শুধু অন্তরে নিয়েছ তুমি। তাই ওটাই নির্মাণ করেছ। যার শরীরটা নিয়েছিলে তার ওটাই নির্মাণ করেছ।'

সুতন্বীর এই আশ্চর্য বিশ্লেষণে চমকে ওঠে ধীমান। এভাবে তো ভেবে দেখেনি সে। ওর কথার বিপরীতে কোনো কথা ফুটে উঠে না ওর মুখে। বলে–

'আমার কিছু বলার নেই এখানে সুতন্বী। হয়তো নিজের অন্তরটাই বুঝে উঠতে পারিনি আমি। কীভাবে ওটা বোঝাব তোমাকে।'

'কেউ কারো অন্তর বোঝে না ধীমানদা।'

'হয়তো তাই। তবে অন্তর থেকে তোমার মূর্তিটাই নির্মাণ করতে চেয়েছি আমি সুতন্বী।'

'জানি ধীমানদা। ওটা থাক এখন। মূর্তিটা আমি নিয়েছি তো। ওটা আমারই।'

'ঠিক আছে সুতন্বী। ওটা থাক। এ জগতের সব রহস্য কখনোই বোঝে না মানুষ।'

'কোনো রহস্যই বোঝে না।'

'হ্যাঁ।'

এর ক'দিন পর গুরুদেব সহ ওদন্তপুরী মহাবিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে ধীমান। যেতে হবে নৌকায় করে পঞ্চানন নদী বেয়ে। রাজা গোপালদেব ওদন্তপুরী মহাবিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন হিরণ্যপ্রভা পর্বতের শিখরে। প্রকৃতির এক আশ্চর্য সুন্দর লীলানিকেতন এই ওদন্তপুরী। বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য শ্রী গঙ্গাদেব মহাশয় অধ্যয়ন করেছিলেন এই ওদন্তপুরী মহাবিহারে। ওদন্তপুরীর রূপ নবীন। শিল্প সৌকর্যে সব দিক দিয়ে আধুনিক। এর প্রতিটা অংশ হতে ফুটে ওঠে চাকচিক্য। পথে যেতে যেতে গুরু তারানাথের কাছ থেকে শুনে শুনে এর কাল্পনিক রূপ কিছুটা ফুটে ওঠে ধীমানের চোখে। নদীর দু'তীরের অভাবনীয় সৌন্দর্য গুরুশিষ্য দু'জনকেই নিয়ে যায় জগতের অন্য এক রহস্যলোকে। প্রকৃতির প্রেমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

বৈশালি থেকে বিক্রমশীলা ফিরে এসে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েন মহারাজ ধর্মপাল। এখানেই কিছুটা দীর্ঘ সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পিতাজি গোপালদেবের বাংলা রাজ্যটাকে ওর এক জীবনে সম্প্রসারিত করে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন ধর্মপাল। নিজের প্রতি এখন সন্তুষ্ট তিনি। পুবে মেঘনাদের অববাহিকা হতে পশ্চিমের সিন্ধু অববাহিকা পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারতের একচ্ছত্র অধিপতি তিনি। একটা স্থায়ী রাজধানী ও রাজসভার প্রয়োজন অনুভব করেন এখন। কিন্তু ভারতবর্ষের রাজাদের প্রায় সারা জীবন কাটাতে হয় হাতি বা ঘোড়ার পিঠে, নয়তো রথে বসে। এমন কোনো রাজা নেই যে নিজের রাজ্যে নির্বিঘ্নে ও স্থায়ীভবে অবস্থান করতে চায়, বা সক্ষম হয়। শক্তিমত্তা একটু বেড়ে গেলে প্রজাদের কল্যাণের ভাবনা বাদ দিয়ে ওদের মাথায় চেপে বসে দিগ্বিজয়ের বাসনা। আর দুর্বল হলে নিজরাজ্য রক্ষার সংগ্রাম। এটা অবশ্য পৃথিবীর সব অংশের রাজরাজরাদের ক্ষেত্রে কমবেশি প্রযোজ্য।

হেমন্তের শুরুতে একটা রাজসভা গঠন করেন মহারাজ ধর্মপাল। বিজিত রাজ্যগুলোর জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাজার প্রধান ধর্ম। বাংলা, মগধ, তীরভুক্তি, বরেন্দ্র, উৎকল, সমতট প্রভৃতি যেসব রাজ্যগুলো সরাসরি তাঁর শাসনাধীনে রয়েছে ওগুলো সহ বিজিত রাজ্যগুলোর মধ্যে মৎস্য, বিদর্ভ, কুরু, মদ্র, যদু, যবণ, অবন্তী, গান্ধার, কীর প্রভৃতির শাসকদের নিয়ে রাজসভা গঠন করেন মহারাজ। রাজ্যগুলোর প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রজাদের যথাযথ নিরাপত্তা দেয়া ও সুখে শান্তিতে রাখার জন্য প্রত্যেক রাজা-মহারাজা ধর্মপালের নিকট অঙ্গীকার করেন। তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজ্যে স্থিতাবস্থা ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধাভিযানে যাওয়া হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন।

বীরত্ব প্রদর্শন ও বিচক্ষণতায় তাঁর পুত্র দেবপাল মনে হয় ধর্মপালকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। মনে মনে গর্ব অনুভব করেন তিনি। রাজা গোপালদেবের কথা স্মরণ করেন। পিতাজি সব সময় বলতেন যে আমাদের রাজ্যের উৎস ও মূলশক্তি প্রজাগণ। আমাদের হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়েছিল ওরা। আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ওদের সুখ, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা। আরেকটা মাৎস্যান্যায় যেন কখনোই এই বাংলায় না আসতে পারে তার জন্য সদাসজাগ থাকা। এজন্য প্রতি ক্ষেত্রে রাজা শশাঙ্কের উদাহরণ টেনে আনতেন তিনি। নিঃসন্দেহে একজন যোগ্য রাজা ছিলেন শশাঙ্কদেব। প্রজাদের যথাযথ নিরাপত্তা দিয়েছিলেন ও সুখশান্তিতে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। অনেক যুদ্ধজয়ী বীর রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। কিন্তু যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে সক্ষম না হওয়ায় অসীম সম্ভাবনাময় একটা রাজ্য হারিয়ে যায় শতবর্ষের ঘোর অন্ধকারে। একজন রাজার শুধু নিজের জীবনকাল পর্বটুকু নিয়ে ভাবলে চলে না। যে-কোনো রাজ্যের ইতিহাস হল ওটার শাসকবংশের ইতিহাস। তাঁকে ভাবতে হয় পরবর্তী বংশধরদের নিয়ে। রাজা দেবপালকে সেভাবেই গড়ে তুলেছেন মহারাজ ধর্মপাল।

পালবংশের ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে দেবপালের উপর রাজ্যভার অর্পণ করে নিজেকে কিছুটা বিশ্রাম দেয়ার কথা ভাবেন মহারাজ ধর্মপাল। সম্রাট অশোকের ছত্রছায়ায় যে বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে বিস্তার লাভ করেছিল তা পশ্চিমভারত হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। পূর্ব দিকে এটার সম্প্রসারণ যেভাবে শুরু হয়েছে তাতে সন্তুষ্ট ধর্মপাল। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈদিক ধর্মের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা ও গুরুত্ব দেয়ার অভিপ্রায় জারি রাখেন তিনি। সনাতন ধর্মীয় মন্দির ও প্রার্থনাগৃহ নির্মাণের জন্য রাজকোষ হতে অর্থ বরাদ্দ করতে কখনোই কার্পণ্য করেননি তিনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মগুলোর সহজ সহাবস্থান ব্যাখ্যা করে এখানের সরল মানুষগুলোর সহনশীল বৈশিষ্ট্য। ভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রত্যাখ্যান ও উচ্ছেদ ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। এটা সমুজ্জ্বল রাখতে বদ্ধপরিকর পাল রাজারা। অনেক ধর্মযুদ্ধ হয়েছে এখানে, ন্যায়যুদ্ধ বা অন্যায়ের বিপক্ষে প্রতিরোধের ছদ্মাবরণে, সেসবও প্রশ্নবিদ্ধ। এক ধর্ম অন্য ধর্মকে উচ্ছেদের জন্য কোনো যুদ্ধ হয়নি। ভবিষ্যতেও যেন না হয় সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকার জন্য প্রশাসনকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

রাজ্যশাসন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকেন ধর্মপাল। রাজ্য জুড়ে নির্মিত বিহার ও মহাবিহারগুলো ঘুরে দেখার জন্য মনস্থির করেন। রাজা দেবপালকে আদেশ দেন পদ্মা, মেঘনা ও শীতলক্ষা নদী বেষ্টিত বাংলা ও সমতটের প্রাচীন রাজধানী নগরটিতে তাঁর যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে। সম্রাট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অশোকের কালেও ঐ অঞ্চলটা ছিল বাংলার রাজধানী। প্রাচীন এই জনপদটির প্রতি এক প্রবল আকর্ষণ রয়েছে মহারাজ ধর্মপালের। রাজা দেবপালকে আদেশ দেন পাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত কর্ণধার হিসেবে সে যেন সব দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে নেয়। এবারের বর্ষা মওসুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমতটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

বঙ্গ-সমতটের একটা সমস্যা যে দীর্ঘ ও প্রশস্ত কোনো সড়কপথ সেখানে নির্মাণ করা যায় না যাতে হাতি ঘোড়া সমন্বয়ে বিশাল সৈন্যদল নিয়ে এগোনো যায়। জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা। গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদী এত বিস্তৃত যে বর্ষাকালে মনে হয় সমুদ্র। এছাড়াও রয়েছে বিশালাকার সব হ্রদ ও জলাভূমি। শুকনো মওসুমে কৃষকেরা ফসল ফলায় ওখানে। ওদের সাংবাৎসরিক খোরাক রেখেও অঢেল শস্য রপ্তানি করা যায় অন্যান্য রাজ্যে। ঐ সব ফসলখেত মাড়িয়ে সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। এগোতে হয় নদীপথে। বাংলার প্রায় সব নদী সারা বছরই নাব্য থাকে। এটা এক বড় সুবিধে। মহারাজ ধর্মপালের এখন রয়েছে খুব শক্তিশালী ও চৌকশ নৌবহর। তিনি সিদ্ধান্ত নেন নৌপথে বিক্রমশীলা থেকে যাত্রা করে সমতটে যেয়ে পৌছাবেন। পুরো শুকনো মওসুম সেখানে কাটিয়ে আবার আগামী বর্ষা মওসুমের শুরুতে ফিরে আসার আয়োজন করবেন।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে অশ্বচালিত রথ প্রায় অপ্রচলিত হয়ে উঠলেও পালরাজারা এই ঐতিহ্যটা এখনও ধরে রেখেছেন। যুদ্ধযাত্রায় মহারাজ ধর্মপাল স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন চার ঘোড়ায় টানা বিশালাকায় ভারি রথে। মহারাজের রয়েছে এখন ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় সেনাদল। বাংলার 'নয় লক্ষ সৈন্য' বাক্যবন্ধটি ভারতবর্ষের যে-কোনো রাজার বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। পদাতিক, অশ্বারোহী, হাতিবাহিনী ও উটবাহিনী ছাড়াও মহারাজের রয়েছে শক্তিশালী নৌবাহিনী। যে-কোনোভাবে যুদ্ধযাত্রা এখন মহারাজের পক্ষে সম্ভব। এ রকম চতুর্মুখী সৈন্যশক্তি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের নেই।

বাংলা-সমতট অঞ্চলে মহারাজের অভিযানটি যদিও যুদ্ধযাত্রা নয়, কিন্তু রাজার প্রতিটা পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। রাজার অবস্থানের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। মহারাজের পূর্বমুখী যাত্রার সুযোগে পশ্চিমের কোনো রাজা যেন আবার মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে তাই দেবপালকে রাজ্যের পুরো পশ্চিম দিক ও বাকপালকে উত্তর দিকের ভার দিয়ে রথযাত্রা করেন মহারাজ ধর্মপাল। গঙ্গার ভাটিতে এসে নৌযাত্রা শুরু করবেন তিনি। ওখানের রাজা মদনপাল তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন।

বঙ্গ-সমতটে যাত্রার আরও একটা উদ্দেশ্য রয়েছে মহারাজ ধর্মপালের। নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজবহর পরিদর্শন। মহারাজের বর্তমান রাজ্যসীমা উত্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত। পুবের দিকটা তো নিজেদেরই রাজ্য। যতটা আধিপত্য পশ্চিমে বিস্তার করা যায় ততটাই বেশি নিরাপদ রাখা যায় নিজেদের। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে রাজ্যবিস্তারের কোনো বাসনা নেই ধর্মপালের। ওদের সংস্কৃতি ও জীবনাচারের সঙ্গে পুবের মানুষদের বিশেষ মিল নেই। দ্বিতীয়ত, দক্ষিণের ওরা আগ্রাসী শক্তি হিসেবে প্রায়শই উত্তরে অভিযান চালায়। ওদিকটা যদি সামলানো যায় তাহলে পশ্চিম দিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ভারতবর্ষে যত আগ্রাসনের ঘটনা ঘটেছে তার সবই ঐ পশ্চিম দিক থেকে। বাংলা সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে হলে পশ্চিম দিকটাকে অবশ্যই কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কিন্তু এটার প্রধান অন্তরায়, ঐসব অঞ্চলের ছোটো ছোটো রাজারা সাময়িক বৈশ্যতা স্বীকার করে নিলেও সুযোগ পেলেই বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে সংঘশক্তি গড়ে তুললেও প্রয়োজনের সময় একতাবদ্ধ রাখা যায় না ওদের।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অনেক সময় দ্রুত সৈন্য ও রসদ সরবরাহের প্রয়োজন দেখা দেয়। মহারাজ ধর্মপালের রাজ্যটার পশ্চিমাংশে যেতে হলে কিছুটা দুর্গম ও প্রায় মরুময় অঞ্চল পেরোতে হয়। সেক্ষেত্রে শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তুলতে সক্ষম হলে স্থলবাহিনীকে সহায়তা দেয়ার জন্য গঙ্গা ও যমুনা নদী দিয়ে উজিয়ে কুরুরাজ্যের উত্তর সীমানা পর্যন্ত পৌছা যায়। এ নদী দুটো যদি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে প্রায় সমগ্র উত্তরভারত নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। পরবর্তীতে নৌবহর সম্প্রসারিত করে সিন্ধু ও এর শাখা নদীগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা গেলে নৌশক্তির সহায়তায় উত্তর ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা রাজ্যটির পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মহারাজের যাত্রা শুরু চার ঘোড়ায় টানা অশ্বরথে। মগধ, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য পেরিয়ে যাবেন তিনি অশ্বারোহী বাহিনী সঙ্গে নিয়ে। গঙ্গা নদীর ভাটিতে কজঙ্গলের নিকট ভাগিরথী নদীর পশ্চিম তীর থেকে নৌবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন তিনি। এরপর তাঁর নৌবহর আবার পদ্মা নদী দিয়ে ভাটিতে নেমে যেয়ে, মেঘনা ও শীতলক্ষা নদী ঘেরা বঙ্গ সমতটের প্রাচীন রাজধানীতে যেয়ে পৌছাবে। ওখানে পুরো হেমন্ত মওসুমটা কাটাবেন ধর্মপাল। মহারাজ জেনেছেন মেঘনার মোহনায় অনেক ছোটো ছোটো দ্বীপ রয়েছে। সমুদ্রে চলাচল উপযোগী নৌকা বানানোর কারিগর রয়েছে ওখানে। দক্ষিণের অরণ্যভূমিতে নাকি লোহার মতো শক্ত কাঠের গাছ রয়েছে যা দিয়ে ওরা নৌকা বানায়। এবারের ভ্রমণে নৌবাহিনীর জন্য বিশালাকার ও মজবুত নৌকার বহর গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছে রয়েছে ধর্মপালের। সৈন্য নিয়ে দ্রুত ছুটে চলা নৌকা ও রসদ পরিবহনের জন্য অতিকায় নৌকা থেকে শুরু করে যুদ্ধজাহাজ পর্যন্ত সবকিছু প্রত্যক্ষ করতে ইচ্ছে প্রকাশ করেন তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতলক্ষা নদীতীরে যখন পৌছান মহারাজ ধর্মপাল তখন সকালের রোদ চকচক করছে নদীর বুকে। অসংখ্য পাল তোলা নৌকা দেখে খুশি হয়ে উঠেন মহারাজ। কী অপূর্ব দৃশ্য! উত্তরভারতে এমন মনকাড়া রূপ সাধারণত চোখে পড়ে না। প্রকৃতির রূপ এখানে শান্ত ও সমাহিত। নদীতীরগুলো সবুজে ঢাকা। মনে হয় সবুজ মাটির তীর ছুঁয়ে বয়ে চলেছে বিশাল নদীটা। গাছগুলোয় কলকাকলিমুখর রঙবেরঙের অসংখ্য পাখি। নদীতে মনে হয় মাছের প্রাচুর্য। জলের উপরে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কোনো কোনো মাছ। একটু পর পর শুশুকের ঝাঁক বাঁকানো গোল পিঠ নিয়ে লাফিয়ে উঠে পানির উপরিতলে। অসাধারণ এক দৃশ্য। মুগ্ধ হয়ে যান মহারাজ ধর্মপাল।

মহারাজের রাজবজরা প্রায় মাঝনদীতে নোঙর করা হয়েছে। ছোটো নৌকায় করে যেতে হবে ওটায়। দূর থেকে রাজবজরাটাকে মনে হয় সাদা ডানা একটা কালো হাঁস অপরূপ সাজে ভেসে রয়েছে মাঝনদীতে। সামনের গলুই এত উঁচু যে মনে হয় হাঁসটা ঠোঁট বাড়িয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে। সাদাকালো রঙে আঁকা ওটার একটা মাত্র চোখ দেখা যায় তীর থেকে। নৌকার মাঝখানে মহারাজের থাকার জায়গাটাকে দূর থেকে মনে হয় ছোটো একটা প্রাসাদ। পেছনের গলুই সামনেরটার মতো এত উঁচু না হলেও প্রাসাদটার প্রায় সমান। বজরার দু'পাশে রয়েছে কম করে হলেও দু'কুড়ি দাঁড়। নৌকার প্রায় মাঝখানে বিশাল মাস্তুল। ওখানে টাঙানো রাজপতাকা উড়ছে পতপত করে। গলুইয়ের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। মহারাজের বজরার সামনে পেছনে ও দু'পাশে কম করে হলেও কয়েকশো ছোটো বড়ো নৌকার বহর। রাজকীয় এই নৌবহর ভারতবর্ষের যে-কোনো রাজার গর্বের কারণ হতে পারে।

বিশাল পালকিতে চড়িয়ে মহারাজকে নদীতীরে নামিয়ে দেয় সৈন্যরা। বড়ো একটা ভেলায় ওঠানো হয় ঐ পালকি। তারপর মাল্লারা ওটাকে বেয়ে নেয় বজরা পর্যন্ত। পালকিটাকে বজরায় ওঠানো হলে মহারাজ নেমে আসেন পালকি থেকে। বেরিয়েই অনুভব করেন নদীর শীতল স্পর্শ। স্পষ্ট বুঝতে পারেন নদীতীরের আর্দ্র বাতাস ও নদীর বুকের শীতল বাতাসের বিশেষ পার্থক্যটুকু। বজরার সামনে পেতে রাখা আসনে বসে নদীর মাঝখান থেকে চারদিকে তাকিয়ে দেখেন। এর অপরূপ সৌন্দর্যে তন্ময় হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ।

দুপুরের স্নান-আহারাদির পর বজরার সামনের খোলা অংশে পারিষদদের নিয়ে আসর বসান মহারাজ। গায়ক ও নর্তক, কবি ও বিদূষক সহ অনেক প্রমোদসঙ্গী রয়েছে মহারাজের নৌবহরে। সমতটের রাজধানী অঞ্চলের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিও রয়েছেন যাদের সঙ্গে কথা বলে ওখানটা সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণা নিতে পারেন মহারাজ। মহারাজকে অভ্যর্থনা করে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে মহাসামন্ত অনন্তনাগ। কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি বলেন–

'মহারাজের আগমন অপেক্ষায় এখানের জনগণ অধীর হয়ে আছে প্রভু।'

'কেমন আছে আপনার প্রজারা, অনন্তনাগ মহাশয়?'

'খুব ভালো আছে। এখানকার মানুষজনও প্রকৃতির মতো সবুজ, মহারাজ।'

'ওটা আবার কেমন?'

'খুব প্রাণোচ্ছল ও সারাক্ষণ হাসিখুশি।'

'ফসলাদি কেমন জন্মায় সামন্ত মহাশয়?'

'প্রচুর মহারাজ। ফল ফুল ফসল কোনোটারই অভাব নেই প্রভু। নদীগুলোতে মাছেরও প্রাচুর্য। পাখি ও পশুমাংসেরও কোনো ঘাটতি নেই।'

'এখানের মানুষ কী মাংসাশী?'

'সবাই নয় মহারাজ, নিরামিষভোজীও রয়েছে।'

মহারাজের মনের ভেতর একটু চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এখানের মানুষগুলোকে বৌদ্ধধর্মের আওতায় নিয়ে এলে মাংসাশী স্বভাবটা হয়তো ছেড়ে যাবে।

'খুব বেশি প্রাণীমাংস হয় এখানে সামন্ত মহাশয়?'

'না মহারাজ। খুব বেশি না। অতিথি কুটুম এলে ওরা গৃহস্থালি হাসমুরগি কেটে রান্না করে। আর পূজাপার্বণে ছাগল ভেড়া জাতীয় একদু'টা প্রাণী হত্যা করে। বেশির ভাগ দিনই মাছ-ভাত খায়।'

'পেশাজীবীদের ভেতর কৃষক না মৎসজীবী বেশি?'

'কৃষক বেশি মহারাজ। অধিকাংশ পরিবারই নিজেদের মাছ মাংস নিজেরা সংগ্রহ করে। অসংখ্য খাল বিল রয়েছে এখানে। মাছের কোনো অভাব নেই মহারাজ। মৎস্যজীবীরা শুধু ধনী শ্রেণিটাকে মাছ সরবরাহ করে।'

'ও আচ্ছা।'

'ধর্মকর্ম কেমন এখানের মানুষগুলোর?'

একটু ভেবে নেয় সামন্তরাজা অনন্তনাগ। তারপর বলে–

'সত্যি বলতে কী মহারাজ, ধর্মকর্ম নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামায় না এরা। অভাব নেই মানুষজনের। ফলে শোষণও নেই তেমন। লৌকিক ধর্ম, বিভিন্ন পালা-পার্বণ নিয়ে থাকে। মেয়েরা বিভিন্ন ব্রত পালন করে। কঠিন কোনো নিয়মাচার নেই। অন্যায় অনাচারও নেই। মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই বরং এখানের বৈশিষ্ট্য বলা যায় মহারাজ।'

'মানুষ যদি সুখেশান্তিতে থাকে, সমাজে অন্যায় অনাচার তেমন না থাকে তাহলে ধর্মের বাড়াবাড়িটা তো না থাকাই ভালো সামন্ত মহাশয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ্ঞে প্রভু। তবে অন্যায় অনাচার যে একেবারে নেই, তা তো বলা যাবে না।'

'তা নেই কোথায় অনন্তনাগ। ভগবানের স্বর্গেও আছে ওটা।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কেমন আছে এখানে নাগ মহাশয়?'

'খুব বেশি নেই।'

'একটা বিহার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে?'

একটু যেন বেকায়দায় পড়ে অনন্তনাগ। কিছুক্ষণ ভেবে বলে–

'আমার এলাকার অধিকাংশ প্রজা লৌকিক ধর্মে আস্থাশীল। চৈত্র-সংক্রান্তি, চড়ক পূজা, গাজনের মেলায় যেমন অংশ নেয় আবার ঘটা করে কালী পুজোও দেয়। বারো মাসে তেরো পার্বণে মেতে থাকে। মহারাজ জানেন আমি ক্ষত্রিয়-কুলজাত। মহাশিব আমাদের কুলদেবতা। তবে মহারাজ আদেশ দিলে আমার রাজ্যে একটা বিহার নিশ্চয় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।'

'ঠিক আছে অনন্তনাগ। আপনার রাজ্যের একেবারে শেষ সীমানায় কোনো একটা নদীর ধারে একটা বিহার প্রতিষ্ঠার জন্য জমি নির্বাচন করবেন। বাকিটা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় ঠিক করে দেবেন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'সেই সঙ্গে আপনার যেখানে খুশি একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্যও জায়গা ঠিক করুন। ওটা নির্মাণের ব্যবস্থা আমাদের মন্ত্রী মহাশয় করুন।'

বিহার নির্মাণের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে প্রধান ক্ষেত্রপ মহাশয়কে আদেশ দেন একখণ্ড উঁচু ও স্থায়ী জমি বরাদ্দের জন্য। ধীমানের প্রতি নির্দেশ পাঠান ওর তত্ত্বাবধানে বিহারের গাত্রপ্রাচীর, অভ্যন্তরীণ দেয়াল প্রভৃতি অলঙ্করণ ও প্রতিমা নির্মাণের সকল কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন করবে সে।

যাত্রাপথে বিভিন্ন জায়গায় থেমে সামন্ত ও মহাসামন্তদের আমন্ত্রণ-অভ্যর্থনা রক্ষা করে সমতটের রাজধানী পৌঁছাতে প্রায় দু'মাস লেগে যায় ধর্মপালের। দ্রুতগামী নৌকার মাধ্যমে রাজ্যের খবরাখবর ও দূতিয়ালী কার্যক্রম ভালোভাবেই রক্ষা করে চলেছে দেবপাল। ওর জন্য মনে মনে গর্ব হয় ধর্মপালের। এ পর্যন্ত কোনো দুঃসংবাদ ওর কাছ থেকে এসে পৌঁছেনি। যুদ্ধ জয়, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহ দমন, রাজ্য পরিচালনা, এমন সব দিকের কোথাও ব্যর্থ হয়নি সে। কিন্তু দেবপালের পুত্র দুটির প্রতি কোনো আস্থা রাখতে পারছে না ধর্মপাল। ওদের শরীরে রাজরক্ত থাকলেও ওটা অনেক শীতল মনে হয়। রাজা নিরীহ হলে রাজ্য রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। রাজার হতে হয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তাহলে নিজরাজ্য যেমন অনুগত থাকে তেমনি প্রতিবেশী রাজারাও তাদের লোলুপ হাত বাড়াতে সাহস পায় না। দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপালকে কেন যেন গোবেচারা ধরনের মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মপালের। তার চেয়ে বরং ওর ভ্রাতুষ্পুত্র জয়পালের কিশোর পুত্র বিগ্রহপালকে অনেকটা চৌকশ মনে হয়। এদিকে সূর্যপালেরও রাজা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেবপালের পর এদের কে যে ভবিষ্যত পালরাজ্যটাকে সক্ষমভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে তা ভেবে একটু বিমর্ষ হয়ে পড়েন ধর্মপাল। পরবর্তী রাজা দেবপালকে নিয়ে কোনো ভাবনা নেই ওর। কিন্তু তারপর কী হবে? আগামী প্রজন্মগুলোর কথাও ভাবতে হয় রাজাদের। ওভাবে তৈরি করতে হয় ওদের। ভ্রাতা বাকপালের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য মনে মনে সিদ্ধান্ত নেন ধর্মপাল। ধর্মপালের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাকপাল পিতাজি গোপালদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। দেবপালের সঙ্গে তেমন শক্তিশালী কেউ নেই। বাকপালের পুত্র জয়পাল যদিও রাজকার্য নির্বাহ করছে, কিন্তু দিগ্বিজয়ী ও দোর্দণ্ড প্রতাপশালী হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ওর ভেতর নেই। ওটার প্রয়োজনও অবশ্য নেই। পরবর্তী পালরাজা হিসেবে দেবপালের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে ধর্মপালের।

পালরাজ্যের ভবিষ্যত কর্ণধার ভাবনাটিকে আপাতত মাথা থেকে সরিয়ে বঙ্গ-সমতটের আশ্চর্য সুন্দর সবুজ প্রকৃতির দিকে চোখ ফেরান ধর্মপাল। দীর্ঘ একটা জীবন প্রায় শেষ করে এনেছেন এই রাজ্য-ভাবনায়। এখন চাই কিছুটা বিশ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

বেশ ক'টা মাস বঙ্গ-সমতটের শ্যামল সান্নিধ্যে কাটিয়ে পাটলিপুত্র ফিরে যাওয়ার যাত্রার আদেশ দেন মহারাজ ধর্মপাল। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এই রাজচক্রবর্তীর নিজ জীবনের প্রতি বিশেষ কোনো মোহ আর নেই। সবদিক দিয়ে সফল একটা জীবন যাপন করেছেন তিনি। পুত্র দেবপালের প্রতিও রয়েছে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। পৌত্রদের নিয়েই কেবল রয়েছে একটু দুশ্চিন্তা। বুকের কাঁটার মতো প্রায়ই খচখচ করে উঠে ওটা।

ফেরার পথে ক্লান্তিজনিত যাত্রাবিরতি ছাড়া অন্য কোনো পরিকল্পনা রাখেন না মহারাজ ধর্মপাল। বর্ষা মওসুম পুরোপুরি শুরু হওয়ার আগে পাটলিপুত্র পৌঁছাতে চান তিনি। মহারাজ ধর্মপালের সঙ্গে আলোচনা শেষ করে রাজা বাকপাল ফিরে গেছেন উত্তরবঙ্গে। পাটলিপুত্র যেয়ে দেবপালের সঙ্গে পরবর্তী রাজা নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করতে মনস্থ করেন তিনি। অদূর ভবিষ্যতেও যেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিয়ে পালরাজাদের ভেতর কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয় তার মীমাংসা করে রাখতে চান ধর্মপাল।

মহারাজের নির্দেশ পেয়ে সোমপুরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছেড়ে দিতে হয় ধীমানকে। বঙ্গের রাজধানী নগরীতে বিহার নির্মাণের সঙ্গে জড়িত হওয়ার আদেশ পেয়ে ভাবনায় পড়ে ধীমান। লোকমুখে অনেক শুনেছে এই দেশটি সম্পর্কে। এর নাকি রয়েছে এক জাদুকরী রূপ ও মায়া। এর আকর্ষণে ওখানে যেয়ে পড়েছে যে একবার সে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি কখনো। কিন্তু মহারাজের আদেশ, পালন না করে উপায় তো নেই। বিষয়টা নিয়ে মনে মনে ভাবে ধীমান, এ কেমন প্রহসন এই মানবজীবনে! একের ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য অন্যের সব ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিতে হবে। সোমপুর বিহারে কাজ করার জন্য মানসিকভাবে পুরো প্রস্তুতি নিয়েছিল সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ ধর্মপাল যে-সময়ে বঙ্গের রাজধানী ছেড়ে আসেন প্রায় একই সময়ে ধীমানও ছেড়ে আসে বিক্রমশীলা। নদীর ভাটিস্রোত ধরে নেমে যাওয়ায় বর্ষা মওসুমের আগেই ওখানে পৌছে যায় ধীমান। যাত্রাপথে হয়তো কোনো নদীর বুকে পরস্পরকে অতিক্রম করে গেছে ওরা। নিজের ইচ্ছা বিসর্জন দিয়ে অন্যের ইচ্ছা পূরণের একটা পথের অন্য প্রান্তে ছুটে এসেছে ধীমান।

রাজধানীতে পৌছার কিছুদিন পর মনের গুরুভার কিছুটা দূর হয়ে যায় ধীমানের। বেশ বড় একটা কর্মীদল এসেছে ওর সঙ্গে। ওদের সঙ্গে ঘুরেফিরে বেশ আনন্দোচ্ছল হয়ে ওঠে। নতুন দেশে নতুন কাজের উন্মাদনা পেয়ে বসেছে ওদের। এখানকার মানুষজন অতিথি-বৎসল ও খুব আমোদপ্রিয়। খেলাধুলা, গান বাজনা, নৃত্যগীত এসব লেগেই আছে। ফল ও ফসলের এত প্রাচুর্য মগধে কখনো দেখেনি ধীমান। শুধু ফল খেয়েই এখানের মানুষজন একটা সুখী জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। সুগন্ধি ও রসালো ফলের এত বিপুল সমারোহ দেখে অবাক হয় ওরা। এখানের নদীগুলোয় যে কত রকম মাছ আছে তা বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন। খাল বিল পুকুর ডোবা জলাশয় সব কিলবিল করে মাছে। মাটির প্রতিটি বিন্দু সবুজ। এত সবুজ যে ঘুম এসে যায়। মাটি অবশ্য খুব নরম। ফুল ও ফসলের জন্য ভালো। কিন্তু টেরাকোটার জন্য যে মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে হয় তা এখানে সহজে পাওয়া যায় না।

গুরুদেব তারানাথ আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন এখানে বসে কষ্টিপাথরের প্রতিমা নির্মাণ করতে। কালো এ পাথরের কোনো উৎস এখানে নেই। বর্ষাকালে এখানে টেরাকোটার কাজ করা সম্ভব না। বাংলার বর্ষা ঋতুটা নাকি মগধ মিথিলার সঙ্গে কোনোভাবে মিলে না। কখনো কখনো হপ্তার পর হপ্তা একনাগাড়ে বৃষ্টি ঝরতে থাকে। বানের জলে পথঘাট মাঠ ডুবে সব একাকার হয়ে যায়। মানুষের ঘরবাড়িগুলো জেগে থাকে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো। কষ্টিপাথরের যোগান থাকলে হয়তো ঐসব দ্বীপঘরে বসে কাজ চালিয়ে নেয়া যেত। ধীমানের জানা মতে কষ্টিপাথর পাওয়া যায় পশ্চিমভারতের সুরাষ্ট্রে। ওখান থেকে পাথরের চালান নিয়ে আসতে অনেক মাস লেগে যাবে। ততদিনে বর্ষা শেষ হয়ে শুকনো মওসুম ফিরে আসবে। তখন টেরাকোটার কাজে হাত দেয়া যাবে। আশপাশ থেকে মাটি সংগ্রহ করতে হবে। হিসাব করে দেখে ধীমান যে আগামী ক'টা মাস হাতে কোনো কাজ নেই। মনে মনে খুশি হয়। সেই কিশোর বয়সে কঠিন কাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর্দা। অনেক বছর হল কোনো ছুটি পায়নি ধীমান। এ ক'মাস আলস্য উপভোগ করার ভাবনায় খুশি হয়ে ওঠে সে।

শুকনো জলবাতাসে বেড়ে ওঠা ধীমান ক'দিনের ভেতরই ক্লান্ত হয়ে উঠে এই স্যাঁতসেঁতে বর্ষার বাতাসে। সূর্যের দেখা নেই আকাশে। ঘরের ভেতর গুমোট গন্ধ। দরজা জানালা খোলা রাখা যায় না। বৃষ্টির ছাঁট এসে ঘর ভিজিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। পরনের কাপড়-চোপড় শুকোতে চায় না। কালোচিতি পড়ে যায় কাপড়ে। বেশ শীত শীত ভাব লাগে যখন দমকা বাতাস বয়। বৃষ্টি থেমে গেলে আবার গুমোট ভাব এসে শরীর ঘামিয়ে তোলে। রাস্তাঘাটে চলাচল করা কঠিন। কাদাজলে থিকথিকে রাস্তায় পা পিছলে পড়ে যাওয়ার ভয়। ঘরে বসে খাওয়াদাওয়া ও গল্পগুজব করে কাটাতে হয়। এখানের আম, কাঁঠাল, কলা, জাম প্রভৃতি ফল খুব সুস্বাদু। মাছ যে কত রকম আছে কল্পনা করাও দুষ্কর। পাঁচমিশালি ছোটো মাছ দিয়ে চচ্চড়ি রান্না করে এরা। দারুণ স্বাদের খাবার।

শুধু খেয়ে বসে আর গল্পগুজব করে কত সময় আর পার করা যায়। নৌকা নিয়ে প্রতিদিন ঘুরতে বেরোয় ধীমানেরা। কোনো কোনো রাত নৌকাতেই কাটিয়ে দেয়। ঘরের ভেতর থিতু হয়ে না থেকে এই ঘুরে বেড়ানোটাও ভালো লাগে। খুব বেশি দূরে নদীর স্রোতের ধারে যাওয়া যায় না। এখানের বিল ও ছোটো ছোটো জলাশয়গুলো সব নদীর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। অভিজ্ঞ মাঝিরা এসবের সুলুক-সন্ধান জানে। সারাদিন বিলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় ওরা। কোনো কোনো বিলের বুক সবুজ হয়ে আছে। ওগুলো নাকি আমন ধানের খেত। পানির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠে এ ধানগাছগুলো। কচুরিপানার ভেসে চলা দেখে বোঝা যায় ছোটো ছোটো নদী ও খালের স্রোত। অসংখ্য কচুরিপানা এ সময় ভেসে যায় ভাটির দিকে। ছোটো ছোটো দু'একটা জলাশয় দেখা যায় যেখানে স্রোত নেই। কচুরিপানা জমে ঘন সবুজ ঝোপ তৈরি করে ওখানে। জলচর পাখিরা বাসা বাঁধে ঘন ঝোপের ভেতর। ডিম ফুটিয়ে ওখানেই বাচ্চা নেবে ওরা।

পাখি শিকারি ছোট্ট একটা গোত্র আছে এখানে। খাঁচায় পোষা একটা পাখি নিয়ে বিলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় ওরা। পাখির ঝাঁক দেখতে পেলে ছেড়ে দেয় ওটাকে। তারপর কোনো একটা পাখিকে ফুসলিয়ে এনে ফাঁদে ফেলে ওটা। বিষয়টা খুব নির্মম মনে হয় ধীমানের কাছে। এক পাখি শিকারির কাছ থেকে ওর ফাঁদে আটকানো সব ক'টা পাখি কিনে নেয়। অদ্ভুত সুন্দর ঐ পাখিগুলো। লাল ঠোঁট, হলদে ঝুঁটি, শরীরের রং চকচকে সবুজ। গলার কাছটা মনে হয় মণিমুক্তোর উজ্জ্বল পালকের মালায় জড়ানো। সব ক'টা পাখি ছেড়ে দেয় ধীমান। পাখি শিকারি লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ধীমানের দিকে। সে হয়তো জানে যে এই পাখিগুলো কালই আবার ধরা দিতে পারে ওর ফাঁদে।

জলে ভেসে থাকা দিগন্তের কোনো কোনো দিকে দেখা যায় শত শত পাল তোলা নৌকা। বোঝা যায় যে ওটা নদীর মূল স্রোত। পণ্য ও মানুষ পরিবহনের চলাচল পথ। আশপাশে চারদিকে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য ছোটো ছোটো নৌকা। মানুষের কর্মব্যস্ততা ধরে রেখেছে এসব নৌকার চলাচল। উড়োজাল ছুঁড়ে মাছ ধরে অনেকে। অনেকে আবার নৌকা বোঝাই করে কচুরিপানা বয়ে নিয়ে যায় গবাদিপশুর খাবার হিসেবে। পুরো বর্ষা মওসুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গবাদিপশুগুলো টিকে থাকে শুকনো খড়ের সঙ্গে এসব কচুরিপানা খেয়ে। ছাগল ও ভেড়াগুলোর জন্য রয়েছে কাঁঠাল পাতা। এখানে প্রচুর কাঁঠাল গাছ থাকায় বৃষ্টির সময়টা পার করে দিতে পারে পোষা প্রাণীগুলো। কৃষকের হাতে কাজকর্ম না থাকায় বউঝিদের নাইওর পাঠায় ভিন্ন গ্রামে, ওদের প্রিয়জনদের কাছে। নৌকার মাঝিদের মুখে প্রায় সারাক্ষণ লেগে রয়েছে ভাটিয়ালি, মুর্শিদি প্রভৃতি গান। নৌকায় বসে আপন মনে বাঁশি বাজায় অনেকে। মুগ্ধ চোখে এক অন্য রকম জীবন দেখে ধীমান।

বর্ষার জল কমে শুকনো মাটি জেগে উঠতে শুরু করে। অবস্থাটা একটু বিচ্ছিরি ধরনের মনে হয় এখন। কেমন এক পচা সোঁদা গন্ধ ভেসে রয়েছে বাতাসে। বেশি দিন অবশ্য থাকে না এটা। হপ্তা দু'য়ের মধ্যে শুকিয়ে যায় সবকিছু।

কাজে নেমে পড়ে ধীমানের দল। টেরাকোটার জন্য মাটির মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এখানের কুমোরপাড়ায় যেয়ে খুশি হয়ে উঠে ধীমান। বংশ-পরম্পরা এই পেশা চালিয়ে আসছে ওরা। ওদের দক্ষতা ও মৃৎপাত্র নির্মাণ দেখে প্রশংসা করে ধীমান। চাক ঘুরিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে মাটির তাল থেকে বিভিন্ন প্রকার তৈজসপত্র নির্মাণ করে ওরা। প্রায় কোমর সমান উঁচু পাত্র নির্মাণ করতে পারে দক্ষতার সঙ্গে। মাটি দিয়ে এত বড় পাত্র বানানোয় সত্যিই দক্ষতার প্রয়োজন। এদের সঙ্গে কথা বলে টেরাকোটা নির্মাণের প্রতি একটু সন্ধিহান হয়ে উঠে ধীমান। এখানের মাটিতে লবণের পরিমাণ বেশি। দক্ষিণের সমুদ্র খুব দূরবর্তী না হওয়ায় জোয়ারের জল নদী খাল বিল প্রভৃতি বেয়ে এসে মিশে যায় মাটির সঙ্গে। ফলে নির্মাণ সামগ্রীর স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহ জাগে ধীমানের। এটার প্রমাণ পায় পুরোনো ক'টা ভবন পরিদর্শন করে। এখানের পাট্টক প্রধান তিলপার বাড়ি যেয়ে খুঁটে খুঁটে দেখে ইটগুলো। ওর কাছ থেকে জানতে পারে যে ভবনটির বয়স পঞ্চাশ পেরোয়নি। অথচ কোনো কোনো ইটে এখনই ক্ষয় ধরেছে। কোথাও কোথাও সাদা সাদা ছাপ পড়েছে। অচিরেই এসব ইট ঝুরো হয়ে ঝরে পড়বে মনে হয়। দেয়ালে হাত বুলিয়ে দেখে হাতে দাগ পড়ে যায় ইটের লাল গুঁড়োয়। এই লবণাক্ততা কাটিয়ে উঠার কোনো পথ জানা নেই ওর। চুনসুড়কি দিয়ে ইট গাঁথার কারণে কিছুটা লবণাক্ততা হয়তো নষ্ট হয়। কিন্তু পুরোপুরি দূর হয় না এ সমস্যা। টেরাকোটার কাজ স্থায়ী হবে না এখানে।। মাটির কাজ আপাতত না করার সিদ্ধান্ত নেয় ধীমান। অপেক্ষা করে উত্তর ভারত থেকে কালো ব্যাসল্ট পাথরের চালান আসার জন্য। সঙ্গে যে কর্মীবাহিনী নিয়ে এসেছে ধীমান ওরা টেরাকোটা কাজের শ্রমিক। এদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে অনেক সময় লেগে যাবে। পাথরকাটা শ্রমিক সংগ্রহ করতে হবে আবার। হয়তো স্থানীয় অনেককে নেয়া যাবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্টিপাথরের চালান ধীমানের হাতে এসে পৌছার আগেই একটা দুঃসংবাদ এসে পৌছে। গুরুদেব তারানাথ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেছেন। এমন একটা দুঃসংবাদ কল্পনাও করতে পারেনি ধীমান। গুরুদেবের শোক ও সু-ীর জন্য উৎকণ্ঠা ওকে মুহূর্তকালও সময় দেয় না। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমশীলার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাসায়।

প্রায় মাসখানেক লেগে যায় বিক্রমশীলায় যেয়ে গুরুগৃহে পৌছাতে। ততদিনে গুরুদেবের শোক কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে সুতন্বী। কিন্তু প্রতি পলে, প্রতিটা ক্ষেত্রে গুরুদেবের অনুপস্থিতি অনেকদিন কাতর করে রাখে ধীমানকে। শেষ পর্যন্ত শোক কাটিয়ে ওঠে সে। কাটিয়ে উঠতে হয়। গুরুদেবের শিল্পকর্মশালার ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়। মহারাজের কাছে সবকিছু বুঝিয়ে বলে। সেক্ষেত্রে বিক্রমশীলা ছেড়ে সোমপুরে যেয়ে কাজ করার নির্দেশ দেয় আবার মহারাজ। কিন্তু ধীমানের ইচ্ছে হয় না বিক্রমশীলার এই কর্মশালা প্রাঙ্গণটি ছেড়ে যেতে। শেষ পর্যন্ত সুতন্বীও বলে সোমপুরে যেতে। এটা মহারাজের দ্বিতীয়বারের আদেশ। সুযোগ পেয়ে ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'তুমি কী যাবে আমার সঙ্গে সুতন্বী?'

'আমি কেন যাব?'

'বা রে, তোমাকে এখানে একা রেখে যাব কেমন করে?'

চুপ করে থাকে সুতন্বী। আবার বলে ধীমান–

'গুরুদেবের একটা অঙ্গীকার ছিল তোমার বাবামায়ের কাছে। এখন তো তাঁদের কেউ নেই। এখন সিদ্ধান্তটা নিতে পারি না আমরা?'

এবারও চুপ করে থাকে সুতন্বী। কিছুক্ষণ পর এসে ওর হাত ধরে ধীমান। সাড়া দেয় সুতন্বী।

বিক্রমশীলায় সুতন্বীকে কিছুটা গুছিয়ে রেখে ফুরফুরে মন নিয়ে অনেক দিন পর নিজের গ্রামের পথে যাত্রা করে ধীমান। অনেক দিন পর পুরোনো পথঘাট আবেগে আপ্লুত করে ওকে।

বাড়ি পৌছে দেখে ঠাকুর্দা অভিনন্দ বয়সের ভারে জবুথবু। পাট্টক প্রধানের দায়িত্ব হতে অবসর নিয়েছে বয়সের কারণে। প্রায় সারাক্ষণই ঘরে থাকে। হাঁটাচলার শক্তিও কমে এসেছে। ধীমানকে দেখে খুব খুশি হয় অভিনন্দ। বলে-

'এলি দাদু, বুড়োটাকে মনে পড়ল তোর?'

'মনে পড়বে কেন ঠাকুর্দা, মনে তো রয়েছই।'

'আরও কত কিছুই যে না আছে তোর মনে!'

ফোকলামুখে হাসে অভিনন্দ। এই ক'বছরে এত বুড়িয়ে গেছে ওর ঠাকুর্দা তা বুঝতে পারেনি ধীমান। আরও একটা সুসংবাদ ধীমানের কাছে যে পিতাজি বাড়ি রয়েছেন। সৈন্যদল থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। অনেক বছর আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিনন্দদের গড়ে তোলা এই জনপদ ও আশপাশের অনেকগুলো গ্রাম, ফসলখেত ও অরণ্যভূমি নিয়ে ছোট্ট একটা সামন্তরাজ্য গড়ে তোলার আদেশ পেয়েছেন তিনি মহারাজ ধর্মপালের কাছ থেকে। সে লক্ষ্যে সৈন্যদল ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলছেন তিনি। এখন থেকে এখানেই অবস্থান করবেন। নতুন নির্মাণ কাজ চলছে ধীমানদের বাড়িতে। নতুন সব ভবন নির্মাণ, রাজবাড়ি নির্মাণ, দিঘি ও পুকুর খনন প্রভৃতি কর্মযজ্ঞে পুরো গ্রামটির রমরমা অবস্থা। অভিনন্দের কাছে সুযোগ বুঝে সুতম্বীর বিষয়টি ওঠায় ধীমান। হাসে অভিনন্দ। একটুক্ষণ ভেবে বলে–

'একবার সুভদ্রার বিষয়ে তোমাকে বারণ করে মনে মনে যে কী কষ্ট পেয়েছিলাম তা ভগবান জানেন ধীমান। এবার আর ওটি করছি না। যা করতে হয় তার সবই করব। তা বল দেখি কী করতে হবে।'

'বাবার সঙ্গে কথা বল।'

'কন্যাটির পরিচয় বিস্তারিত বল তো ধীমান মহাশয়।'

সব শুনে আবার অভিনন্দের ফোকলা মুখে হাসি ফুটে উঠে।

'শেষ পর্যন্ত ঐ বামুনিই বিয়ে করতে যাচ্ছিস ধীমান? মাঝখানে মত পাল্টেছিলি কেন তাহলে?'

হেসে গড়িয়ে পড়ে ধীমান।

'এখনও ওসব মনে আছে ঠাকুর্দা?'

'সব মনে আছে রে। তোর সব কিছুই মনে আছে। শুধু এই বুড়োটারই কোনো কিছু মনে নেই তোর।'

'না ঠাকুর্দা। তোমারও সবকিছু আমার অন্তরে গেঁথে রয়েছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ ঠাকুর্দা। এখনও চোখ মুঁদে দেখতে পাই তুমি কাকচক্ষু নদীজলে সাঁতরে চলেছ আমাকে নিয়ে। বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ।'

অভিনন্দের চোখে জল জমে।

'এত দ্রুত কেন ফুরিয়ে যায় জীবন, ধীমান! আরও ক'টা বছর যদি বেঁচে থাকতাম শুধু স্মৃতিগুলো নিয়ে।'

'আরও অনেক বছর বাঁচলেও স্মৃতি ফুরোবে না ঠাকুর্দা। নতুন নতুন স্মৃতি জমবে আরও। এই যে মুহূর্তগুলো কাটছে তোমার সঙ্গে, এগুলোও একদিন স্মৃতি হয়ে যাবে।'

'তা হয়তো হবে। কিন্তু সবই স্মৃতি হয় না ধীমান। কিছু কিছু সময় হয়তো স্মৃতি হয়ে থাকে।'

'তাই ঠাকুর্দা।'

দু'জনেই নিশ্চুপ থাকে অনেকক্ষণ। তারপর ওর বিয়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'যেভাবে বললে তুমি, ধীমান মহাশয়, তা কন্যাটিকে সম্প্রদান করবে কে?'

'এটা একটা প্রশ্নই বটে ঠাকুর্দা। ভেবে দেখিনি।'

'তাহলে?'

'এক কাজ করা যায়? তুমিই নাহয় কর ও কাজটা।'

হেসে গড়িয়ে পড়ার অবস্থা অভিনন্দের।

'তিন কুলে কেউ নেই ওর, ব্রাহ্মণকন্যা সে, আমি বৌদ্ধ, আর আমি কীনা করব কন্যা সম্প্রদান!'

'তিন কুলে যখন কেউ নেই ওর তখন তো সুবিধেই হলো ঠাকুর্দা। বৌদ্ধ হিসেবে সম্প্রদান কর ওকে।'

আবার হাসে অভিনন্দ। চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলে–

'আগে ওকে বৌদ্ধ করে নিতে হবে তাহলে। সেক্ষেত্রে তো বিয়েটা আমাকেই করতে হয়।'

ধীমানও যোগ দেয় ওর হাসিতে।

'আমার আপত্তি নেই ঠাকুর্দা। যদ্দিন তুমি আছ ততদিন ও তোমার।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ ঠিক।'

'ও যদি এই বুড়োকে নিতে না চায়?'

'অমত করবে না।'

'এত নিশ্চিত হলি কী করে ধীমান মহাশয়?'

'নিশ্চিত ঠাকুর্দা।'

'তাহলে তো বিয়ের ব্যবস্থাটা করতেই হয়।'

অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ধীমানের বাবাকে রাজি করায় অভিনন্দ। সেও ভেবে দেখে এটা না করালে ধীমানের হয়তো আর বিয়েই হবে না।

বেশ ধুমধাম করে নতুন সামন্তরাজ্যের পত্তন করে মধুমথন। তারপর আয়োজন করে ধীমানের বিয়ে। স্মরণীয় এক শীতঋতু হয়ে ঐ বছরটা নতুন রাজ্যের মানুষগুলোর মনে জেগে থাকে বেশ অনেকদিন। বিয়ের পর ওখানেই ক'মাস কাটিয়ে দেয় ধীমান। তারপর রাজাজ্ঞা পালনের জন্য ছুটে যায় সোমপুর। গঙ্গাতীরের বিক্রমশীলার সবুজ অরণ্যময় প্রকৃতি অথবা সমতটের জলমগ্ন সবুজ, কোনোটার সঙ্গে মিলে না সোমপুরের ভিন্ন প্রকৃতি। নদী ও শাখানদী বিধৌত বিস্তৃত ভূখণ্ডের ভেতর উঁচু হয়ে জেগে থাকা ভূমি নিয়ে গড়ে উঠেছে এখানের জনপদগুলো। সমতটের মতো লবণাক্ত নয় এখানের মাটি। ফলে টেরাকোটার কাজ করা সহজে সম্ভব। বিষয়টা উৎফুল্ল করে ধীমানকে। এখানের ভবনগুলোর ভেতর দেয়ালচিত্র অঙ্কনও হয়তো সম্ভব হবে। বাতাসে আর্দ্রতা তত বেশি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোমপুরে থিতু হয়ে বসে কাজের ভেতর ডুবে যায় ধীমান। মহারাজের নির্দেশে এ অঞ্চলের সেরা মহাবিহারের কাজ এগিয়ে চলেছে পুরোদমে। শুধু ধর্মশিক্ষা নয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনা রয়েছে ধর্মপালের। বৌদ্ধ ধর্মকে উত্তরে হিমালয় অঞ্চল ছাড়িয়ে ও পুবে যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে দিতে চান মহারাজ। সম্রাট অশোকের সময় বিস্তার লাভ করা বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ হতে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। ধর্ম নিয়ে ওদিকের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে চান না তিনি। তার চেয়ে বরং পুবে ও উত্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলে এ ধর্মটার পুনরুজ্জীবন ঘটতে পারে। মহারাজের আদেশে সমগ্র দেশ জুড়ে আরও অনেক বিহারের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলেছে। এ সকল বিহারের প্রতিমা নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটা নির্মাণশালা গড়ে তোলার জন্য ধীমানকে দায়িত্ব দিয়েছেন মহারাজ ধর্মপাল। সোমপুর বিহারের প্রধান স্থপতির সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজে হাত দেয় ধীমান। তাছাড়া নতুন একটা বিষয় আবার ধীমানের মাথায় কাজ করা শুরু করেছে। বঙ্গের কংস্যশিল্প কারিগরদের সংস্পর্শে এসে ধাতু নির্মিত প্রতিমার দিকে বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েছে সে। সমতটের রাজধানী নগরীর কাঁসারীদের অপূর্ব কাজ দেখে যার পর নাই মুগ্ধ সে। ওদের অনেককে সোমপুরে আনিয়ে নেয় পিতল ও স্বর্ণ মিশিয়ে প্রতিমা নির্মাণে সহায়তা করার জন্য। ওর এসব কাজ দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন মহারাজ। কর্মশালা ও নির্মাণশিল্পীদের আবাসিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য সোমপুর বিহারের কাছে বিশ একর সম্পত্তি ওকে দেয়ার জন্য ক্ষত্রিপ মহাশয়কে আদেশ দেন ধর্মপাল।

এই কর্মযজ্ঞের ভেতর ডুবে থাকার সময় ওদের গ্রামের বাড়ি থেকে একটা সুসংবাদ এসে পৌঁছায় একদিন। এক পুত্রসন্তান লাভ করেছে ধীমান। প্রধান স্থপতির অনুমতি নিয়ে দ্রুত গ্রামে ফিরে যায় সে। খুশির বান বয়ে চলেছে সেখানে। সব চেয়ে খুশি হয়েছে মনে হয় অভিনন্দ। সে বলে–

'মনে হয় তোর পুত্রসন্তানটি দেখার জন্য এতদিন বেঁচে ছিলাম রে ধীমান। ভগবান ওকে শতায়ু করুন।'

প্রকৃতঅর্থেই খুব বুড়িয়ে গেছে অভিনন্দ। প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। হাঁটাচলাও করতে পারে না কারো সাহায্য ছাড়া। ধীমান বলে–

'সবই আপনার আশীর্বাদ ঠাকুর্দা।'

'এক কাজ করিস ধীমান, ছেলেটিকে তোর কাছে নিয়েই রাখিস। না হলে তোর পিতাজি হয়তো সৈনিক হিসেবেই গড়ে তুলতে চাইবে ওকে। তোকে তো আমি রক্ষা করতে পেরেছিলাম। ওকে আগলে রাখার জন্য আমি তো থাকব না রে ধীমান।'

'তা নয় ঠাকুর্দা। আরও অনেক বছর বেঁচে থাক তুমি। তবে কথা দিচ্ছি, আমার কাছেই রাখব ওকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ, ধীমান দাদু, একজন সৈন্য হওয়া থেকে একজন শিল্পী হওয়া মনে হয় ভালো।'

'ব্যক্তিজীবনের জন্য হয়তো।'

'হ্যাঁ ধীমান, নিজের জীবনের জন্য।'

'কিন্তু ঠাকুর্দা, একজন শিল্পীর নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হয় অন্যের উপভোগের সামগ্রী তৈরি করার জন্য।'

'একজন সৈনিকও নিজের জীবন উৎসর্গ করে তার সম্প্রদায়ের জন্য।'

'কাউকে খাটো করে দেখা ঠিক না।'

'তা বোঝাতে চাইনি আমি ধীমান।'

'বুঝেছি ঠাকুর্দা।'

'ওর নাম যদি আমার পিতাজি বীতপার সঙ্গে মিলিয়ে রাখি তোর আপত্তি আছে ধীমান?'

'না ঠাকুর্দা।'

'আমার পিতাজি মাৎস্যান্যায়ের সময় রাজা গোপালদেবের জন্য যুদ্ধ করতে যেয়ে নিহত হয়েছিলেন।'

'একজন মহান মানুষ ছিলেন তিনি।'

'না ধীমান, খুবই সাধারণ একজন মানুষ। তাঁর নামও কেউ জানে না।'

'ঠিক আছে ঠাকুর্দা, সর্বপ্রাণে চেষ্টা করব আমি আমার পুত্রকে দিয়ে ঐ নামটি প্রতিষ্ঠা করতে।'

'ওর নাম তাহলে বীতপাল।'

'ঠিক আছে ঠাকুর্দা, বীতপাল।'

ঘটা করে বীতপালের নামকরণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে সোমপুরে ফিরে যায় ধীমান। মহারাজ ধর্মপাল ধীমানের পুত্র সংবাদ জানতে পেরে খুশি হয়ে আরও কুড়ি একর সম্পত্তি ওকে দেয়ার আদেশ দেন যেন সে নিজস্ব কর্মশালা ও আবাসিক গৃহ নির্মাণ করতে পারে। ভবিষ্যতে বীতপালকে যেন এক মহান শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে ধীমান তার সব ব্যবস্থা করেন মহারাজ ধর্মপাল।

বীতপালের জন্মের এক বছর না পেরোতেই দেহত্যাগ করে অভিনন্দ। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে যায় বঙ্গ সমতটের মাৎস্যান্যায় কালের শেষ সাক্ষী। অভিনন্দের চিতার সামনে দাঁড়িয়ে ধীমান বিদায় জানায় বঙ্গ সমতটের ইতিহাসের এক দুঃখজনক অধ্যায়টিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত ও বয়সের ভারে ন্যুব্জ মহারাজ ধর্মপাল দীর্ঘজীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। রাজ্যশাসন থেকে অনেক বেশি ঝুঁকে পড়েছেন এখন ধর্মকর্মে। অধিকাংশ সময় কাটান ধর্মাচার্য হরিভদ্র মহাশয়ের সঙ্গে। উত্তরভারতের এই বিশাল রাজ্যটির ভার পুরোপুরি এসে পড়ে রাজা দেবপালের হাতে।

রাজ্যশাসন হাতে পেয়ে পিতৃরাজ্য সুসংহত করায় মনোনিবেশ করেন তিনি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে অনেক রাজ্য রয়েছে যেগুলো কেন্দ্রীয় পালরাজ্যের আওতাভুক্ত না হলেও মহারাজ ধর্মপালের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। ওদিকটা নিয়ে এখন ভাবতে চান না দেবপাল। উত্তরভারতে প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য রাষ্ট্রকূট রাজা ও প্রতিহার রাজা খর্গ উঁচিয়ে রেখেছে। এখনই ঐ ঝঞ্ঝাটে না যেয়ে কেন্দ্রের কাছাকাছি রাজ্য উৎকল ও প্রাগজ্যোতিষকে পুরোপুরি কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নেন দেবপাল। দুটো রাজ্যই এখন পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। অতীত ইতিহাস বলে এদেরকে এখনই দমন না করলে ভবিষ্যতে যে-কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবে না ওরা। যদি কোনো কারণে প্রতিহাররাজ বা রাষ্ট্রকূটরাজের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পারে দেবপাল তাহলে তৎপর হয়ে উঠবে ওরা দু'জনে। দক্ষিণদেশীয় পাণ্ডবরাও প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে।

মহাসেনাপতি লাউসেনকে পাটলিপুত্র থেকে পুণ্ড্রনগরে পাঠিয়ে দেন দেবপাল আগামী শরতে যুদ্ধযাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে। প্রাগজ্যোতিষরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বঙ্গ সমতটের সব সামন্ত ও মহাসামন্তের কাছে মহারাজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন মহাসেনাপতি লাউসেন।

পুনশ্চ পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরতের শুরুতে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে সৈন্য সমাবেশের পরিকল্পনা করে লাউসেন। পালরাজাদের হাতিবাহিনীর বড় অংশটা গড়ে উঠেছে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের দক্ষিণের বিশাল অরণ্য থেকে। হাতির অভয়ারণ্য ওটা। মহারাজ ধর্মপালের সময়ে অনেক ক'টা হাতি ধরার খেদা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল ওখানে। কিন্তু প্রাগজ্যোতিষ রাজার সঙ্গে যুদ্ধটায় দেবপালের হাতিবাহিনী খুব একটা কাজে আসবে না। এখানে বরং অধিক সংখ্যায় পদাতিক ও কিছু ঘোরসওয়ার সৈন্য নিয়ে অভিযানের পরিকল্পনা করেছেন দেবপাল। পাহাড়ি অরণ্যাঞ্চলে সৈন্য পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যটার যত উত্তরে যাওয়া যায় তত দুর্গম ও অরণ্যবেষ্টিত। ফলে স্থানীয় সৈন্য সংগ্রহ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

বর্ষা মওসুমের শেষভাগে মহাসেনাপতি লাউসেন ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে এসে পৌঁছেন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে। মহাসামন্ত অমিতবিক্রম তাঁকে স্বাগত জানায়।

খুব ভোরে উঠে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে দাঁড়িয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন লাউসেন। নদীটার বিস্তার এখানে বিশাল। ওকুল প্রায় দেখা যায় না। টকটকে লাল সূর্য উঠেছে নদীর বুকে। ধূসর ঘোলা জলে এটার রক্তিম প্রতিফলন এক অন্য রকম অনুভূতি সৃষ্টি করে ওর ভেতর।

অমিতবিক্রমের দিকে তাকিয়ে বলেন–

'জল দেখি রক্তে লাল হয়ে উঠেছে এখনি অমিতবিক্রম মহাশয়।'

'আজ্ঞে ওটা রক্তের লাল নাও হতে পারে সেনাপতিজী।'

'আপনার কী তাই মনে হয় অমিতবিক্রম?'

'আজ্ঞে কর্তা।'

'কেন হে?'

'প্রাগজ্যোতিষের রাজার সাহস হবে না আমাদের মহারাজের সামনে এসে দাঁড়ায়।'

'নিজে না এসে যদি ওদের হাতিগুলো এগিয়ে দেয়।'

'আমাদেরও হাতি আছে না!'

'ওদের হাতির সংখ্যা কত জানেন অমিতবিক্রম মহাশয়?'

'অনেক তো হবেই।'

'মানুষের থেকেও বেশি। পুরো জঙ্গলটাই হাতির।'

'তাহলে কর্তা?'

'ওটাই তো বিষয় হে। আমাদের একলক্ষ সৈন্য যখন উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে তখন তো প্রাগজ্যোতিষের রাজা হিমালয়ে গিয়েও লুকানোর জায়গা পাবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই ঠিক কর্তা।'

'জানেন না, চারদিকে একটা রব আছে যে পালরাজাদের 'নয় লক্ষ সৈন্য'। এটাই আমাদের সব চেয়ে বড় সাহস। এত বড় সৈন্য সংখ্যা আর কোনো রাজারই নেই।'

'হয়তো পৃথিবী জুড়ে থাকা কোনো রাজারই নেই।'

'তাও হতে পারে।'

'মহারাজ কী এ যুদ্ধে যোগ দেবেন?'

'মনে হয় না। পাটলিপুত্রেই থাকবেন তিনি। মন্ত্রীপ্রধান দর্ভপাণি রয়েছেন তাঁর সঙ্গে। ওখানেও সৈন্য সমাবেশ করছেন তিনি। মহারাজ ধর্মপালের বিজিত রাজ্যগুলো বশে রাখার জন্য উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভিযানে থাকবেন তিনি।'

সূর্য তার উজ্জ্বল আলো ছড়াতে শুরু করলে ব্রহ্মপুত্রের বুকে জেগে উঠে শত শত নৌকার পাল। এসব নৌকা গঙ্গা যমুনা বেয়ে পশ্চিমে যাবে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্যসম্ভার নিয়ে। রাজস্বের এক বড় উৎস এই নৌবাণিজ্য। বাণিজ্যিক নৌ-চলাচল নিরাপদ রাখার জন্য হাজার হাজার নৌসেনা সার্বক্ষণিক প্রহরায় রয়েছে নদীগুলোর বুক জুড়ে। প্রতিটা নদীবন্দরে রয়েছে নৌঘাঁটি। এদের সদাতৎপরতায় নৌবাণিজ্য থেকে যে অর্থাগম হয় তা দিয়ে রাজ্যের বিশাল সেনাবাহিনী রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠে।

ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীর থেকে শুরু হয়েছে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য। দেবপালের পিতা মহারাজ ধর্মপাল নদী অতিক্রম করে উত্তরের পাহাড়সারি ডিঙ্গিয়ে সুদূর কামরূপনগরে তাঁর জয়স্কান্ধাভার স্থাপন করেছিলেন এক সময়। ওখানে এখন আবার স্থানীয় রাজা অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে সৈন্য সমাবেশ সম্পন্ন করতে এবং ওদের যুদ্ধ মহড়ায় বেশ ক'মাস লেগে যায় লাউসেনের। নদীর জল ভাটিতে নেমে যাওয়ায় এর প্রশস্ততা অনেক কমে এসেছে। ঢালু তীর বেয়ে অনেকটা নিচে নেমে নদী পারাপারের ভেলায় চড়ে সৈন্য ও রসদ ওপারে নিয়ে যেতে হয়। মাত্র দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়েছে লাউসেন। ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী সৈন্যেরা রয়েছে তাঁর সঙ্গে। হাতির দেশের রাজার সঙ্গে হাতি নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা ওর নেই। খুব ভোরে শুরু হয় সৈন্য পারাপার। নদীর উত্তর দিক হাজার হাজার সৈন্য ছাউনিতে ছেয়ে যেতে শুরু করে। নদী অতিক্রম করে বিপক্ষদলের কোনো সেনা-তৎপরতা লক্ষ্য করে না লাউসেন। কোনো বাহিনী বা কোনো সেনাচৌকিও চোখে পড়ে না। একটু অবাক হয় সে। নদীর দিকে তাকালে মনে হয় শত শত ভেলা পিঁপড়ের সারির মতো নদীর দুটো তীর জুড়ে দিয়েছে। সৈন্যদলের সব সৈনিক, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সামগ্রী পেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলে দ্রুত অগ্রবর্তী বাহিনীকে উত্তরে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেয় মহাসেনাপতি লাউসেন। ঘোরসওয়ার বাহিনী একদিনের পথ সামনে এগিয়ে আবার বিরতি দেয় পদাতিক বাহিনী এসে পৌঁছার জন্য। দিনের পর দিন মহারাজের সেনাদল উত্তরে এগিয়ে যেতে থাকে কোনো বাঁধা না পেয়ে। পথে যেতে যেতে ছোটো ছোটো আরও ক'টা নদী ও খাল অতিক্রম করে উত্তরের পাহাড়সারির পাদদেশে এসে চূড়ান্তভাবে সৈন্য সমাবেশ করে লাউসেন। এ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ করতে না পারায় সেনাদলের অনেকের ভেতর হতাশা দেখা দেয়।

'কী হে ভায়া, এত সব ঢাল তলোয়ার, তীর বর্শা নিয়ে কী প্রমোদ ভ্রমণে বেরিয়েছি?'

'অনেক তো লড়েছ দাদা, এবার না হয় একটু পানতামাক সেবন কর।'

'শুনেছি ম্লেচ্ছদের এ রাজ্যটায় প্রচুর গুয়া জন্মে। পানপাতা সবুজ হয়ে জড়িয়ে থাকে বিশাল সব গাছ জুড়ে।'

'তা তো দেখাই যায়। চারদিকে কত সব গুয়াগাছ।'

'এই গুয়াগাছগুলো মাটিতে জন্মে আকাশে যেয়ে ফল দেয় কেন রে জগা?'

'ভাবনাই বটে।'

'এখানকার মাটি মনে হয় তেতো।'

'খেয়ে দেখ না একটু।'

'ও না খেলেও চলবে। গাছগুলো দেখতে কিন্তু খুব ভালো রে। কাঠির মতো সোজা দাঁড়িয়ে আকাশে উঠে পাতা মেলে।'

'কমলারঙের ফলের গুটিগুলোও খুব সুন্দর।'

'নদীপথে দেখিসনি শত শত নৌকা গুয়া বোঝাই করে মহারাজের রাজধানীর পথে পাল তুলেছে। ওখান থেকে আরও পশ্চিমের কোন কোন দেশে নাকি যাবে সমুদ্র বেয়ে।'

'সমুদ্র দেখিনি কখনো। হ্রদ দেখেছি। ওটাও নাকি সমুদ্রের মতো। শুনেছি সমুদ্রের ঢেউ আরও অনেক বড় আর জল নোনা।'

'আমি হ্রদও দেখিনি।'

'কী দেখেছিস তবে?'

'নদী দেখেছি।'

'তা তো আমার সঙ্গেই পেরোলি।'

পাহাড়ের পাদদেশে সৈন্য সমাবেশ করে ক'দিন অপেক্ষায় থাকে লাউসেন। প্রাগজ্যোতিষ রাজার বিষয়টা বুঝতে পারছে না সে। অগ্রবর্তী সৈন্যদল পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করে চলেছে। কোথাও কোনো বাধা পাচ্ছে না। সতর্ক থাকতে হয় লাউসেনকে যেন রাজার হাতিবাহিনী নেমে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যদলকে কোনোভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিতে না পারে। যোদ্ধা সৈন্যের জন্য কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই ওর। সঙ্গে রয়েছে ঘোরতর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অভিজ্ঞ সৈন্যদল। ওরা বরং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। ওদের ধনুকবাহিনী লক্ষ্যভেদী। তূণীরের একটা তীরও বিফলে যায় না। ঘোড়ার পিঠে বসে সফলভাবে শত্রুসেনার বুক ভেদ করে যায় ওদের ছোঁড়া তীর। কয়েকশো ঘোড়সওয়ার সৈন্য উত্তরের পাহাড়গুলোয় পাহারায় রাখে যেন হাতির কোনো সন্ধান পেলেই দ্রুত নেমে এসে পদাতিক বাহিনীকে সুবিধে মতো অবস্থানে সরিয়ে নিতে পারে। প্রচুর গুয়াবাগান আছে এখানে। ঘনসংবদ্ধ গাছপালার অরণ্য আছে যেখানে হাতি চলাচল করতে পারে না। দ্রুত সেসব জায়গায় সৈন্য সরিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে লাউসেন।

হপ্তা দুয়েক ওখানে কাটিয়ে দেয় মহাসেনাপতি লাউসেন। তারপর সিদ্ধান্ত নেয় সৈন্য নিয়ে প্রাগজ্যোতিষ নগর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার। অকারণে সৈন্যদের রসদ অপব্যয় করার কোনো অর্থ নেই।

মহারাজ দেবপালের রাজচিহ্ন খচিত ধ্বজা বয়ে নিয়ে আগে আগে চলেছে দুশো অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক শম্ভুপাল। পেছনে চলেছে তার সৈন্যদল, বাজনাবাদক দল, পোটকা মাছের মতো গলা ফুলিয়ে শঙ্খ ও শিঙ্গা ফুঁকা দল। এ যেন যুদ্ধযাত্রা নয়, যুদ্ধ শেষে বিজয়ী কোনো নগরে জয় শোভাযাত্রা!

প্রকৃতপক্ষে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যটি মহারাজ দেবপালের করতলগত হয়। ঝড়ের বেগে অশ্বারোহী দল পাঠিয়ে মহারাজের কাছে এ শুভসংবাদ পৌঁছে দেয় সেনাপতি। খুশি হয়ে দেবপাল ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরদিকে দুটো সামন্তরাজ্য নিজের জন্য বেছে নিতে আদেশ দেন লাউসেনকে। আগামী বছরের শরতকাল ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রাগজ্যোতিষ নগরে থাকারও নির্দেশ দেন। অধিকাংশ নিয়মিত সৈন্য ছুটিতে পাঠিয়ে দিতে বলেন। লাউসেনের অধীনস্ত সেনাপতিদের অধীনে প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের সৈন্যদের মধ্য থেকে বিশ্বস্তদের নিয়োগ দেয়ার আদেশ দেন। ঐ রাজা যেন আর কখনো সৈন্য সংগ্রহ করতে না পারে সেজন্য তাঁর কোষাগারের সব রত্নরাজি পাটলিপুত্রে পাঠিয়ে দেয়ারও আদেশ দেন। রাজ্যজুড়ে বিহারাদি নির্মাণ ও শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন এখন দেবপালের।

হাতি ধরার পুরোনো খেদাগুলোর সঙ্গে আরও নতুন খেদা নির্মাণ করে হাতি সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের আদেশ দেন দেবপাল। মহাসেনাপতি বুঝতে পারেন যে মহারাজ বড় কোনো যুদ্ধ পরিকল্পনা করেছেন। ফলে সাজো সাজো রবে মেতে উঠে চারদিক।

প্রাগজ্যোতিষ নগরে মহারাজ ধর্মপালের অস্থায়ী জয়স্কন্ধাবার প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন তরুণ দেবপাল ও মহাসমরনায়ক পিতৃব্য বাকপাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাশয়। এক জৌলুসপূর্ণ ও জয়োৎফুল্ল সময় ছিল ওটা। প্রকৃতপক্ষে পালরাজ্যের পূর্বদিকের প্রায় পুরোটাই মহাবিক্রমশালী সমরনায়ক বাকপালের অসিঝঙ্কারে কম্পমান ছিল। রাজ্যের এই বিশাল অংশটা পালরাজাদের করতলগত হওয়ার প্রায় পুরো কৃতিত্বই তাঁর। শ্রদ্ধেয় এই পিতৃব্যকে যথাযথ সম্মানে ভূষিত করেছিলেন দেবপাল।

আগামী বছরের যুদ্ধযাত্রাটা প্রাগজ্যোতিষ নগরে ঐতিহাসিক একটা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করে শুরু করতে মনস্থ করেন দেবপাল। প্রাগজ্যোতিষরাজের বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ পালরাজার মনোবল যেমন বাড়িয়ে দিয়েছে তেমনি প্রতিবেশী রাজ্যগুলোরও শঙ্কার কারণ হয়েছে।

পিতৃব্য বাকপাল মহাশয় এখন রয়েছেন পুণ্ড্রনগরে। তাঁর উপসমরনায়ক বৈজুপাণির অধীনে সৈন্যদল ন্যস্ত করে ও মহামন্ত্রী দর্ভপাণিকে পাটলিপুত্রে অবস্থানের ব্যবস্থা করে দেবপাল প্রাগজ্যোতিষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

পুণ্ড্রনগরে হপ্তাকাল বাকপালের আতিথ্যে কাটিয়ে দু'জনে মিলে সসৈন্য যাত্রা করেন প্রাগজ্যোতিষের উদ্দেশ্যে। রাজকীয় বিশাল বাহিনীর পদভারে উত্তরবাংলা ও প্রাগজ্যোতিষের সকল জনপদ কেঁপে উঠে। বিজয়ী মহারাজকে অভ্যর্থনা জানাতে পথিমধ্যে সব সামন্তরাজারা ঘটা করে তোরণ সাজিয়ে রাজপ্রণাম করে। বিজয়ী রাজা দেবপাল প্রাগজ্যোতিষে পদার্পণ করলে রাজকীয় অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে পার্বত্য অঞ্চলটি মুখরিত হয়ে ওঠে। শৈলশিখরে প্রতিষ্ঠিত এই নগরীটি স্মরণাতীতকালে এত বিশাল সৈন্যের সমাহার আর প্রত্যক্ষ করেনি।

এরপর ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী নগরটিতে কিছুদিন অবস্থান করে ওখানে পালরাজ্যের জয়কেতন উড়িয়ে পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন আবার দেবপাল।

স্থায়ী সেনাদলকে সঙ্গে রেখে সংগৃহীত অস্থায়ী সৈন্যদলকে বেতনভাতাদি দিয়ে ছুটিতে পাঠিয়ে দেন সেনাপতি লাউসেন। বর্ষা মওসুম এগিয়ে এসেছে। সামনের কয়েকমাস আর কোনো যুদ্ধাভিযান নেই। ছুটি পাওয়া সৈন্যেরা যার যার দেশে ফিরে চলেছে। সঙ্গে এখন অস্ত্রশস্ত্রের ভারি বোঝা না থাকায় পাহাড়ি সুগন্ধি লেবু, গুয়া, ফলমূল প্রভৃতি নিয়ে চলেছে পরিবারপরিজনদের জন্য। কয়েক হপ্তা লেগে যাবে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে সমতল পেরিয়ে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমকূল পর্যন্ত পৌঁছাতে। তারপর নদী পেরিয়ে চলে যাবে যে যার গন্তব্যে। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ করে নেমে আসে পাহাড়ি ঢল। সেই সঙ্গে মৌসুমী বৃষ্টির প্রথম ধারাবর্ষণ।

দেবপালের সৈন্যদলে রয়েছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে সংগৃহীত বেতনভূক সৈন্য। যুদ্ধের সময় এরা পেশাদারিত্ব নিয়ে যুদ্ধ করে। তারপর যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে বাড়ি ফিরে যায়। অপেক্ষায় থাকে আবার ডাক পাওয়ার জন্য। অনুগত সামন্ত, মহাসামন্ত ও রাজারা এসব সৈন্য সরবরাহ করে রাজকীয় বাহিনীতে। বেশির ভাগ সামন্ত মহাসামন্ত নিজেরাই সেনাপতি। ওদের অধীনেই দলগত সৈন্যেরা যুদ্ধ করে। দেবপালের সৈন্যবহরে কুরু, গান্ধারা, কোশল, অবন্তী প্রভৃতি রাজ্য থেকে সংগ্রহ করা সৈন্যদলও রয়েছে। যুদ্ধের একটা মওসুম পাশাপাশি থেকে যুদ্ধ করার সময় ভিনদেশি সৈন্যদের মধ্যেও বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সমতটের জগা ও বরেন্দ্রর সরেণের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়েছে। ওদের সৈন্যদল দুটো পাশাপাশি থাকায় ও যুদ্ধে নিয়োজিত থাকতে না হওয়ায় অবসর পেয়েছে ওরা। বিদায় নেয়ার সময় ঘনিয়ে এলে তরুণ বন্ধু দু'জনের ভেতর বিষণ্নতা নেমে আসে। জগা বলে–

'সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলে না তুমি, আর ক'টা দিন থেকে যাও। এখানেই সমুদ্র দেখতে পাবে।'

'কোথায়?'

'ব্রহ্মপুত্রের আরেকটু ভাটিতে নেমে কিছুটা পুবে গেলেই দেখবে কয়েক হপ্তার মধ্যে বিশাল বিশাল হ্রদের জন্ম হয়েছে।'

'এত জল আসে কোথা থেকে?'

'প্রাগজ্যোতিষে যত বৃষ্টি হয় তা ব্রহ্মপুত্র বেয়ে নেমে যেতে পারে না। তারপর পুবদিক থেকে নেমে আসা মেঘনাদের জলও নেমে যেতে পারে না। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ যেখানে মিলেছে তার উত্তরে নিচু এলাকায় সব জল এসে জমা হয়। ঐ সব হ্রদের মাঝখানে যদি নৌকা নিয়ে যাও চারদিকে কোনো কূল দেখতে পাবে না। তখন ওটাকেই সমুদ্র মনে হবে তোমার।'

'না দাদা। জলে ভীষণ ভয় করে আমার।'

'কেন হে?'

'সাঁতার জানি না।'

হো হো করে হেসে উঠে জগা।

'বল কী! আমাদের জন্মের পর মায়েরা নদীতে ছেড়ে দেয়। মাছের মতো সাঁতার শিখতে হয় আমাদের।'

'ভাটির দেশের মানুষ তোমরা। ওটা তো শিখতেই হবে তোমাদের।'

'তোমাদের ওখানে নদী নেই?'

'আছে, তবে ওখানে সাঁতরাতে হয় না আমাদের।'

'তোমাদের মানুষেরা সাঁতার জানে না?'

'জানে। তবে আমার ভয় করে জলে নামতে।'

'তাহলে বরং থেকেই যাও আর ক'টা দিন। সাঁতার শিখিয়ে দেব আমি।'

মনে মনে একটু ভাবে সরেণ। আর ক'দিন থেকে গেলে মন্দ কী। বাড়ি ফিরে যেয়ে তো কাজ কিছু নেই। নতুন বন্ধুর সঙ্গে বরং নতুন কিছু ঘুরে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাক। তাছাড়া সমুদ্র দেখার একটা আকর্ষণ রয়েছে ওর ভেতর। সমুদ্রের সৌন্দর্য নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে। সমুদ্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নাকি অনেক সুন্দর। শেষ পর্যন্ত থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিয়ে নেয় সে। বলে–

'ঠিক আছে। থেকে যাব নাহয় আর ক'দিন।'

'তাহলে সাঁতারটা শিখিয়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিয়ে উঠে সরেণ–

'না না, সাঁতার শেখাতে হবে না। আমাদের গাঁয়ে নদী নেই। পুণ্ড্রনগরের উত্তরদিকে আমাদের গ্রাম। ওদিকটায় নদী নেই।'

'ওহে ভায়া, সাঁতার শেখা খুব সোজা। দুটো কলাগাছ কেটে ভাসিয়ে দেব। বগলের নিচে ওদুটো ধরে রেখে তুমি নিজে নিজেই শিখে যাবে ওটা। এত ভয় পাচ্ছো কেন?

জগার মুখের দিকে তাকায় সরেণ। খুব একটা ভরসা যেন করতে পারে না। ওকে জিজ্ঞেস করে–

'তোমাদের বাড়ি আর ক'দিনের পথ?'

'এসে পড়েছি বলে। আর তিন-চারদিন পুবে এগোলেই আমাদের গ্রাম। একেবারে হাওড়ের মাঝখানে।'

'হাওড়টা আবার কী?'

'ঐ যে বললাম হ্রদ। বর্ষাকালে বিল দেখনি কোথাও?'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

'ওরকমই, তবে অনেক বড়।'

জগার বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়েই ফেলে শেষ পর্যন্ত সরেণ। ওর গ্রাম থেকে আসা সৈন্যদের বলে দেয় যেন বাবামায়ের কাছে ওর দেরিতে ফেরার খবরটা পৌঁছে দেয়। জগার গ্রামে এসে পৌঁছাতে আরও হপ্তাখানেক লেগে যায়। প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে পথে। খালবিল নদীনালা সব উপচে উঠেছে জলে। নৌচলাচল শুরু হয়েছে। নৌকা ভাড়া করে গ্রামে পৌঁছে ওরা। কয়েকদিনের ভেতর পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টির জল জমে কানায় কানায় ভরে উঠে হাওড়। নদী খাল বিল জলাশয় সব একাকার হয়ে উঠে এক সত্যি সমুদ্রের রূপ নিয়েছে হাওড়। গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে জগাদের বাড়ি। হাওড়ের জলের ঢেউ এসে বাড়ির আঙ্গিনায় লুটিয়ে পড়ে। ভিটির সঙ্গে লাগানো কাঁঠালগাছের শিকড়ে বাধা রয়েছে একটা মাঝারি আকারের গয়না ও ছোটো দুটো ডিঙ্গি নৌকা। পুরো বর্ষাকাল ওদের যাতায়াতের মাধ্যম এই নৌকাগুলো। গ্রামের অনেক বাড়িঘর পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। নতুন এক জগতে যেন এসে পড়েছে সরেণ। বেশ আনন্দ নিয়ে উদযাপন করে ওর এই নতুন অভিজ্ঞতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজকর্ম না থাকায় গ্রামের মানুষগুলো গানবাজনা শুনে ও গল্পগাথা বলে সময় কাটায়। প্রাগজ্যোতিষ থেকে নিয়ে আসা ওদের সদ্য অভিজ্ঞতার কথাও জিজ্ঞেস করে মানুষজন। পাহাড়ি ঐ রাজ্যটা নিয়ে অনেক অলীক গল্প প্রচলিত রয়েছে এদের ভেতর। পৌরাণিক কিছু গল্পও রয়েছে। ওসবের একটা শোনায় একদিন এক গাথক।

'প্রাচীনকালে অসুরদের এক আরণ্যক রাজ্য ছিল। ঐ রাজ্যটা ছিল দুর্গম ও নিষিদ্ধ। দেবমাতা অদিতির মণিমুক্তাখচিত কানবালাটি একদিন জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল অসুরেরা। অদিতির দেবপুত্রেরা ওটা ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়ে বসুদেব কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। ঐ অসাধ্য ও কঠিন কাজটি করতে সম্মত হয়েছিলেন কৃষ্ণ। নির্মোচন নগরে ছয় হাজার অসুর নিধন করে যাত্রাপথের সব রাক্ষস বধ করে ও বাধা অপসারণ করে রহস্যনগরী প্রাগজ্যোতিষে যেয়ে পৌছান কৃষ্ণ। ধর্মপুত্র রাজা নারককে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত কানবালা উদ্ধার করে ফিরে আসেন তিনি।'

প্রাগজ্যোতিষের এমন অসংখ্য গল্প চালু আছে ভাটি এলাকার এসব মানুষের ভেতর। মাসখানেক ওখানে কাটিয়ে দেশে ফেরার ইচ্ছে করে সরেণ। হাওড় এলাকা থেকে তখন অনেক হাজারমনী, দু'হাজারমনী নৌকা ধান বোঝাই করে পশ্চিমের বিভিন্ন বন্দরে যাত্রা শুরু করেছে। ঐ সব নৌকায় মাঝিমাল্লা হিসেবে অনেকে ওদের গন্তব্যে উঠে যায়। কয়েকদিন অপেক্ষার পর পুণ্ড্রনগরের পাশ দিয়ে যাবে এমন একটা নৌকা পেয়ে যায় সরেণ। ওটার মাল্লা হিসেবে উঠে পড়ে সে।

প্রায় মাসখানেক দাঁড় টেনে বিভিন্ন নৌবন্দরে ভিড়ে শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্রনগরে পৌছায় সরেণ। বাড়ি গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সৈনিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প করে পার করে দেয় পুরো বর্ষা ঋতুটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১

ঠাকুর্দা অভিনন্দের লোকান্তর ধীমানের ভেতর এক আশ্চর্য পরিবর্তন নিয়ে আসে। এতদিন বুঝতেই পারেনি ধীমান যে ওর অন্তর্জগতের কতটা জুড়ে ছিল অভিনন্দ। হয়তো ওর মনের অবচেতনে নিজের ভেতরটা তৈরিই হয়েছে অভিনন্দের আদর্শে। অভিনন্দের আত্মার একটা অংশ ধীমানের আত্মার সঙ্গে মিশে ছিল এতদিন। এখন অভিনন্দের সবটুকু জুড়ে বসেছে ধীমানের ভেতর। বাল্য ও কৈশোরের প্রতিটা স্মৃতি বাঙ্ময় হয়ে উঠছে এখন। ঠাকুর্দার প্রতিটা পরামর্শ, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সবকিছু গড়ে তুলেছে ধীমানকে। নিজের ভেতর এক ব্যাপক শূন্যতাবোধ সৃষ্টি হয়েছে এখন। বালকপুত্র বীতপালের হাত ধরে অভিনন্দকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করে সে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, ঠাকুর্দা যেমন ধীমানকে গড়ে তুলেছে নিজের প্রতিরূপ হিসেবে, তেমনি বীতপালকে ধীমান গড়ে তুলবে নতুন এক অভিনন্দ রূপে।

পিতৃছায়ায় ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে বীতপাল। ব্রাহ্মণদুহিতা মায়ের কাছে শেখে রামায়ণ মহাভারতের সব পৌরাণিক কাহিনি। আর পিতার কাছে শিখে শিল্পকলা।

ধীমানের শিল্পনির্মাণের হাতেখড়ি ছিল গ্রামের কুমোরপাড়ায়। হাতে টেপা কাদামাটিতে সুভদ্রার সঙ্গে পুতুল গড়ায়। কিন্তু বীতপালকে ধাতুর প্রতিমা নির্মাণে পারদর্শী করে তুলতে চায় সে। বঙ্গের কংস্যশিল্পে একসময় প্রচুর উৎসাহ পেয়েছিল সে। তামা, দস্তা, টিন প্রভৃতি ধাতু গলিয়ে সোনারং কাঁসার পাত পিটিয়ে ওখানের কাঁসারীরা অদ্ভুত সুন্দর তৈজসপত্র নির্মাণ করে। ওগুলোর গায়ে ধারালো ছেনি ঠুকে ঠুকে আশ্চর্য সুন্দর সব নক্সা ফুটিয়ে তোলে। পিতল গলিয়ে মূর্তির কাঠামো তৈরি করে ওগুলোকে ঘষে ঘষে প্রতিমা তৈরি করার এক শ্রেণির কারিগর শিল্পী রয়েছে। বীতপালকে ঐ প্রতিমা নির্মাণ শিল্প আয়ত্ত করার জন্য বঙ্গে পাঠাতে মনস্থ করে ধীমান। অষ্টধাতুর প্রতিমা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন ধাতুর উপর স্বর্ণ ও রূপার পাত গিল্টি করে প্রতিমা নির্মাণেও পারদর্শী ওরা। পালরাজাদের আনুকূল্যে হাজার হাজার প্রতিমাশিল্পী গড়ে উঠেছে সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে। শিল্পীদের এই মহাউত্থানকালে বীতপালকে কাজে লাগাতে চায় ধীমান।

বীতপালের বয়স চৌদ্দ পেরোলে ধীমান সিদ্ধান্ত নেয় এবার ওকে ভিন্ন ভিন্ন শিল্পনির্মাণশৈলী শিক্ষা দেয়ার জন্য দেশবিদেশে পাঠাবে। কিন্তু সুতন্বী এতে সম্মত হয় না। সে চায় বীতপাল সোমপুরে থেকেই শিল্পনির্মাণ কাজ চালিয়ে যাক। যেতে হয় কিছুদিনের জন্য বিক্রমশীলা যেতে পারে। অথবা ওদের নিজগ্রাম ধীমানের গুরুদেব তারানাথের কর্মশালায় যেয়ে আবার কাজ শুরু করতে পারে। ধীমান বলে–

'তার চেয়ে বরং চল আমরাই ফিরে যাই সুতন্বী। গুরুদেবের কর্মশালাটি আবার সচল করে তুলি।'

'ভাবনাটা মন্দ না।'

'বীতপালকে জিজ্ঞেস করব, ওর কী ইচ্ছে?'

'জিজ্ঞেস করতে পার। কিন্তু ওখানে আরেকটা সন্দেহ রয়েছে।'

'কী ওটা?'

'সন্দেহ নয়, বরং ভয়। তোমার পিতাজি না আবার বীতপালকে সেনাপতি হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন।'

পুরোনো দিনের স্মৃতি মনে করে হেসে ওঠে ধীমান।

'তা হয়তো আর করবেন না তিনি। নিজের পুত্রকে যখন পারেননি, আর পৌত্রের দিকে হাত বাড়াবেন কেন? তাছাড়া সেনাপতি মহাসেনাপতি, সামন্ত মহাসামন্ত, বা রাজা মহারাজা হওয়ার ইচ্ছা কার ভেতরে না থাকে। সবাই তো রাজা হতে চায়। শিল্পী হতে চায় ক'জন?'

'তা অবশ্য ঠিক। কথা বলে দেখতে পার বীতপার সঙ্গে।'

উত্তরের দেবরাজ্য হিমালয় থেকে হিমবাতাস বইতে শুরু করেছে। ভোরের ঘাসে শিশিরের চিহ্ন। আমগাছের পাতাগুলো রাতের কুয়াশায় স্নান করে আশ্বিনে জমা লালধুলো ধুয়ে ফেলতে শুরু করেছে। শস্যেরা দানা বাঁধতে শুরু করেছে বিস্তীর্ণ ফসলখেতে। কোথাও কোথাও ধরেছে সোনালি রং। প্রকৃতির এ মধুর পরিবর্তন মুগ্ধ চোখে দেখে ধীমান। অনেক ক'টা বছর ছিল ছোট্ট এই নদীতীরে গড়ে ওঠা নতুন নগরটায়। ছেড়ে যেতে চেয়ে এখন বুকের ভেতর শূন্য মনে হয়। প্রায় পুরো কর্মজীবন সে কাটিয়েছে এই নগরীতে। কত সুখদুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এখানে। এসবই ছেড়ে যেতে হবে! বীতপালের জন্ম যদিও ওদের পিতৃপুরুষের গ্রামে, কিন্তু বড় হয়ে উঠেছে সে এই সোমপুরের জলহাওয়ায়। ওর সবকিছুর সঙ্গে মিশে রয়েছে এখানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি। ওর ইচ্ছে নেই এ জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া। ফলে ধীমান সিদ্ধান্ত নিয়েছে এখানে রেখে যাবে ওকে। নদীর ওপারে এক ব্রাহ্মণদম্পতির আশ্রয়ে রেখে যাওয়া মনস্থ করেছে। ঐ ব্রাহ্মণের রয়েছে এক বিশাল প্রতিমানির্মাণশালা। খুব নামকরা একজন ভাস্কর রয়েছে ওখানে। ব্রাহ্মণ নিজেও তন্ত্রমন্ত্র ছেড়ে শিল্পের সাধনায় মজে রয়েছে। দেয়ালচিত্র আঁকায় অসাধারণ পারদর্শীতা ওর। ঐ ব্রাহ্মণ ও ভাস্কর রুবেরুর সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট ধীমান। ওর কাছে বীতপাল কষ্টিপাথরের প্রতিমা নির্মাণশিল্পে দক্ষ হয়ে উঠবে আশা করা যায়। চিত্রাঙ্কনও শিখতে পারবে এখানে। কর্মশালা ও গ্রামটা বীতপালেরও পছন্দ হয়েছে।

শীত জাঁকিয়ে বসার আগেই আদিপুরুষের ভিটেয় ফিরে আসে ধীমান। অবসরে কাটিয়ে দেয় বেশ ক'দিন। ঠাকুর্দা অভিনন্দের সঙ্গে কাটানো কৈশোরকালের স্মৃতিগুলো আবেগাপ্লুত করে ওকে। ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদীটাকে এখন আরও ছোটো মনে হয়। নদীতীরের ঐ গাছটা মনে হয় একটুও বাড়েনি এই দীর্ঘ সময়ে। ওর কৈশোরের কচি চোখে ঐ গাছটাই অনেক বড় মনে হয়েছিল। বালুময় ফসলখেতগুলো রয়ে গেছে এখনও। প্রতি বছরের বন্যায় পলিমাটি জমিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে মনে হয়। কৃষকেরা আখ চাষ করে ওখানে। এখানে তৈরি গুড় ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় রপ্তানি হয়। ছোটো ছোটো আখের চারা গজিয়েছে মাত্র। যতদূর চোখ যায় সবুজে ছেয়ে উঠেছে। গ্রামীণ প্রকৃতির এই সব অকৃপণ প্রতিদান মন ভরে উপভোগ করে ধীমান। বয়সের ভারে ওর চোখের কোনও ভারি হয়ে ওঠে।

ঘুরেফিরে কয়েকদিন কাটানোর পর গুরুগৃহে ফিরে আসে ধীমান। গুরুদেবের মৃত্যুর পর পড়োবাড়িতে পরিণত হয়েছে ওটা। ঝোপঝাড়, আগাছা ও গাছপালা জন্মে প্রায় জঙ্গল হয়ে উঠেছে। মাসখানেক লেগে যায় ঝোপজঙ্গল পরিষ্কার করে সূর্যের আলোর নিচে আনতে সবকিছু। মাটির ঘরের দেয়ালগুলোর আবরণ কোথাও কোথাও খসে পড়েছে। ঘরের চালগুলো প্রায় সবই অকেজো। উইপোকা খেয়ে ফেলেছে দরজা জানালার কাঠ। অনেক সময় লেগে যায় সব কটা ঘর মেরামত করতে। সবকিছু মেরামত করার পর এবাড়িতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ধীমান ও সুতন্বী।

অতীতের সবকিছু মনে পড়ে। কর্মশালার ভেতর এখনও সাজানো রয়েছে অসংখ্য প্রতিমা। অনেকগুলো অর্ধনির্মিত, কোনো কোনোটার শুধু কাঠামো বানানো হয়েছে। গুরুদেব শুরু করেছিলেন। তাঁর আকস্মিক তিরোধানে শেষ করে যেতে পারেননি। ওগুলোর গায়ে হাত বুলায় ধীমান। চোখের কোনে জল জমে। শিল্পী হিসেবে ধীমানের যে পসার আজ তার পুরোটাই গুরুদেবের কল্যাণে হয়েছে বলে মনে করে সে। গুরুদেবের অসমাপ্ত কাজগুলো প্রথমে

দেবপাল-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ করবে ভেবে নেয়। ওর এই তন্ময়াবস্থার সময় কখন সুতন্বী এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেনি। ওর দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় ধীমান। ওর চোখেও জলের চিহ্ন। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারে না ওরা। শিক্ষানবীশকালে যে ঘরটাতে কাটাতো ধীমান, ওটাতে যায়। প্রতিরাতে খাবার নিয়ে আসত ওখানে সুতন্বী। ওর শোবার খাটটা ঘুণে খেয়ে ফেলেছে। একই রকম আরেকটা খাট বানিয়ে নিয়েছে ধীমান। ওখানে বসে সে। সুতন্বীকে বলে পাশে বসতে। চুপচাপ বসে থাকে ওরা অনেকক্ষণ। অতীত স্মৃতির ভেতর হারিয়ে যায়। পাশে বসা সুতন্বীর হাতে হাত রেখে ধীমান জিজ্ঞেস করে–

'মনে আছে সব সুতন্বী?'

একটু যেন লজ্জা পায় সুতন্বী। কিছু না বলে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘোমটাটা একটু টেনে দেয়। চোখের কোণ ছলছল করে ওঠে। কীভাবে কোথায় চলে গেল জীবনের এতটা সময়!

এখন মনে হয়, ভালোই হয়েছে এখানে ফিরে এসে। মানুষের শেষ জীবনটা হয়তো শৈশব কৈশোরের মাটিতেই কাটানো উচিত। জীবনের কিছুটা ফিরে পাওয়া যায়, বোঝা যায়।

হঠাৎ খুব নিঃসঙ্গ বোধ করে ধীমান। বীতপাল যদি এখানে এসে একসঙ্গে কাজ করত খুব ভালো হত। বাকি দিনগুলো ওদের কর্মোজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারত। আর কোনো কিছু করতে ইচ্ছে হয় না এখন। কোনো কিছু যেন আর করার নেই এ জীবনে। কোথাও যাওয়ার নেই। কোনো কিছু পাওয়ার নেই। অর্থ বিত্ত চিত্ত ভালোবাসা, কিছুই না। কিছুটা আনন্দ দিতে পারত প্রিয়জনদের সান্নিধ্য। আরও ক'টা দিন পার করে দেয়া যেত ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে।

তা তো আর হয় না। হবার না। ধীমান থাকেনি ওর পিতার সঙ্গে। কীভাবে সে আশা করে বীতপাল থাকবে ওদের সঙ্গে। মানুষ প্রকৃতই নিঃসঙ্গ। মানুষ ক্ষণজীবী। এমনকি এই মাটির প্রতিমাগুলো থেকেও অনেক বেশি ক্ষণজীবী। শুধুই একটা স্মৃতি। গুরুদেবের হাতে গড়া প্রতিমাগুলো এখনও রয়েছে চোখের সামনে। হয়তো থাকবে আরও অনেক বছর। গুরুদেব নেই। এখন আছে শুধু ওর স্মৃতি। তাও আবার ধীমানদের মতো ক'জনের অন্তরেই কেবল। এটাও থাকবে না ওর অন্তর্ধানের পর।

এইই জীবন! এরই জন্য এত কিছু!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগর, পুবে আরাকান পর্বতশ্রেণি ও পশ্চিমে দুর্গম পাথুরে পর্বতসঙ্কুল ভূভাগ ভারতবর্ষের বাহ্যিক মানচিত্রে একটা স্থায়ী রূপ দিলেও অভ্যন্তরীণ ভূচিত্রটি প্রতিবছর পশ্চিম থেকে আসা মৌসুমী বাতাসে ব্যাপকভাবে বদলে যায়। পুবদিকের বিস্তীর্ণ স্থলভূমির একটা দেশ বৃষ্টিজল ও পাহাড়ি ঢলে তলিয়ে যেয়ে ছোট্ট একটা ভূখণ্ডে পরিণত হয়। বিশেষ করে পূর্বভারতের উত্তরদিকের রাজ্যগুলো। প্রাগজ্যোতিষ অভিযান শেষে মহারাজ দেবপাল সমরনায়ক জয়পাল সহ সমতটের রাজধানীতে বর্ষাকালটা যাপন করার সিদ্ধান্ত নেন। মহামন্ত্রী দর্ভপাণি রয়েছেন পাটলিপুত্রে। শক্তিশালী সেনাপতিরা রয়েছে তাঁর সঙ্গে। পরাক্রমশালী হয়ে ওঠা প্রাগজ্যোতিষের রাজার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে দেবপালের জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। তাঁর রাজধানীর দিকে যুদ্ধযাত্রা করার আয়োজন আপাতত দক্ষিণের বা পশ্চিমের রাজাদের সাহসে কুলোবে না। পুরো একটা বর্ষাঋতু এখন বিশ্রাম চাই মহারাজ দেবপালের। তাছাড়া বর্ষাকালে কোনো যুদ্ধাভিযান সাধারণত হয় না এই ভারতবর্ষে। পিতৃব্য বাকপাল মহাশয়ের পুত্র, সমরনায়ক জয়পাল সঙ্গে থাকায় অনেককিছু সহজ হয়ে গেছে দেবপালের জন্য। বাকপাল মহাশয় ধর্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন না শুধু, শাব্দিক অর্থেই তাঁর ডানহাতস্বরূপ ছিলেন। ধর্মপালের অসংখ্য যুদ্ধজয়ের সমরনায়ক ছিলেন তিনি। অসমসাহসী এই বীরের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন পিতাজি। দেবপালও তাঁর খুরতুতো ভাইটিকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে থাকেন। বীরত্ব প্রদর্শনের দিক থেকে তাঁর পিতা বাকপাল থেকে কোনো অংশেই কম যান না তিনি। এবং পুরোপুরি আস্থাভাজন।

দর্ভপাণির কাছে মহারাজের এই সিদ্ধান্ত দূত মারফত পৌঁছার পর দর্ভপাণি খবর পাঠান যে মহারাজ চাইলে সে নিজেও এসে যোগ দিতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

সমতটে। আসন্ন শীতের যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য অনুকূল হতে পারে ওটা। সৈন্য সংগ্রহ করতে হবে এখন। সামন্তরাজাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। এবং মহারাজের অনুমোদনের জন্য যুদ্ধ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রাখতে হবে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে যান দেবপাল। দর্ভপাণির এ পরামর্শটির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এবং অতি দ্রুত সমতটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার নির্দেশ দেন। জয়পালকেও পাটলিপুত্র অভিমুখে যাত্রা করিয়ে দেন। শতদাঁড়টানা দর্ভপাণির বিশাল নৌকা যখন শীতলক্ষা নদীর ভাটিতে নোঙর ফেলে তখন পুরো বর্ষাকাল। ভরা নদীর অপরূপ সৌন্দর্য মোহিত করে তাঁকে। সামন্তরাজাদের প্রাসাদে না থেকে রাজকীয় বজরায় ক'টা দিন কাটানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন দেবপাল। ওভাবে আয়োজন করে সমতটের রাজা শ্রীরামপাল। দর্ভপাণি পরামর্শ দেয় নদীতে ভেসে না বেড়িয়ে বরং পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলে নৌভ্রমণ হবে আবার যাত্রাও সংক্ষিপ্ত হবে। তাহলে শীত মওসুমের আগেই পাটলিপুত্রে যেয়ে পৌছানো সম্ভব হবে। দেবপালের নৌবাহিনীকে সেভাবেই আদেশ দেন তিনি।

শ্রাবণের শেষ দিকে বৃষ্টি কিছুটা কমে এলে পশ্চিম দিকে যাত্রা শুরু করে দেবপালের রাজকীয় নৌবহর। দর্ভপাণিকে নিয়ে আসা শতদাঁড়ের নৌকাটিকে বিলাসবহুল রাজকীয় নৌকায় সাজিয়ে তোলা হয়। দেবপাল ও দর্ভপাণি দু'জনেই ঐ নৌকায় অবস্থান নেন। প্রায় মাসখানেক পর করতোয়া নদীর তীরে পুণ্ড্রনগরে এসে যাত্রাবিরতি নেন দেবপাল। করতোয়া নদীর তীরে গড়ে ওঠা পৌরাণিক এই নগরীটির প্রতি আগ্রহ রয়েছে ওর। পালরাজ্যের জন্য একটা স্থায়ী রাজধানী গড়ে তোলার ভাবনা মহারাজের মাথার ভেতর কাজ করছে বেশ কিছুদিন থেকে। মৌর্যরাজাদের রাজধানী পাটলিপুত্র বা লিচ্ছবিদের প্রাচীন নগরী অজাতশত্রুর রাজধানী বৈশালিকে নিজেদের করে নিতে ইচ্ছে হয় না তাঁর। এমনকি রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণও ওর মনোপুত নয়। মহামন্ত্রী দর্ভপাণির সঙ্গে একান্তে কথা বলেন তিনি এ বিষয়ে–

'দর্ভপাণি মহাশয় কী কখনো একটা বঙ্গাল রাজধানী নগরের বিষয়ে ভেবেছেন?'

একটু ভেবে বলে দর্ভপাণি–

'না মহারাজ, এমনটা তো ভাবিনি কখনো!'

'কেন যেন ক'দিন থেকে বিষয়টা আমার মাথায় ঢুকে আছে। ভাবনাটা দূর হচ্ছে না।'

'মহারাজের কী কোনো সমস্যা হচ্ছে পাটলিপুত্রে?'

'মোটেও তা নয় দর্ভপাণি মহাশয়।'

দর্ভপাণি ভেবে পায় না মহারাজের মাথায় এ ভাবনাটা কেন খেলা করছে। এখন দৃঢ় হাতে বিজিত রাজ্যগুলোকে রক্ষা করে পালরাজ্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফরায় সমস্ত শক্তি ও মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বোধ হয় এটা নিয়ম দাঁড়িয়েছে যে রাজার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীও ঘুরে বেড়ায়। মগধরাজ অজাতশত্রুর হাতে গড়া পাটলিপুত্রের রয়েছে প্রাচীন ঐতিহ্য। রাজধানী হিসেবে নন্দ, মৌর্য, সুঙ্গ, গুপ্ত রাজারাও বেছে নিয়েছিলেন পাটলিপুত্রকে। উত্তরাবর্তের প্রায় কেন্দ্রে ও ভৌগোলিকভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ এর অবস্থান। বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে আসা দ্রাবিড় রাজাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যও পাটলিপুত্রের অবস্থান সুদৃঢ়। তাছাড়া প্রাকৃতিক একটা সুরক্ষা রয়েছে নগরীটির। গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থান হওয়ায় ব্যবসা ও বাণিজ্য নগরী হিসেবে রয়েছে এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। রাজধানী হিসেবে পাটলিপুত্র সবদিক থেকেই শ্রেষ্ঠ। মহারাজের মাথায় নতুন রাজধানী স্থাপনের ভাবনাটা কেন এল বোঝার চেষ্টা করে দর্ভপাণি। মহারাজ আবার বলেন–

'যেসব রাজারা পাটলিপুত্রকে রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাদের কেউই বঙ্গাল ছিলেন না দর্ভপাণি মহাশয়।'

'তা ঠিক মহারাজ, নন্দরা যেমন মৌর্য ছিল না, সুঙ্গরাও তেমনি গুপ্ত ছিল না।'

'আপনার কথা নিশ্চয় ঠিক মন্ত্রী মহাশয়। কিন্তু ওদের কেউই পুবদেশীয় ছিল না। পুবদেশীয়দের জন্য একটা নতুন রাজধানী গড়ে তোলা উচিত মনে হয়।'

'তা হয়তো উচিত।'

একটু থেমে বলে–

'এজন্যই কী মহারাজ পুণ্ড্রনগরে যাত্রাবিরতি নিয়েছেন?'

'তা ঠিক বলতে পারব না মন্ত্রীমহাশয়।'

'রাজা শশাঙ্ক তো বাঙালি ছিলেন। তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণ কেমন হয় মহারাজ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে যান দেবপাল। বলেন–

'দর্ভপাণি মহাশয়ের মনে হয় পুণ্ড্রনগরটা পছন্দ হয়নি।'

'তা নয় মহারাজ। প্রাচীন নগরী এই পুণ্ড্র। এর একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিশ্চয় রয়েছে।'

'পাটলিপুত্র থেকে খুব বেশি দূরেও নয়।'

'মহারাজ যদি পাটলিপুত্রে অবস্থান করতে না চান তাহলে নিশ্চয় ভেবে দেখা হবে। পুরোনো রাজধানীগুলোর যে কোনো একটাকে বেছে নেয়া যেতে পারে। এমনকি লিচ্ছবিদের রাজধানী বৈশালি নগরীটার কথাও ভেবে দেখা যেতে পারে।'

'বিষয়টা আমার অবস্থানের নয় দর্ভপাণি মহাশয়। আমার অবস্থান হাতির হাওদা, অশ্বচালিত রথ, নয়তো এই নৌযানের উপরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটলিপুত্রের বিষয়টা যে বলছেন ওটা তো অজাতশত্রুর হাতে গড়া। নন্দ, মৌর্য, সুঙ্গ বা গুপ্ত, কারোই না।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'মঞ্জীর জায়গাটি কেমন মনে হয় আপনার?'

'একটু দুর্গম নয় মহারাজ?'

'হয়তো, পিতাজি মঞ্জীরের গল্প বলেছিলেন একদিন। তাই মনে এল।'

'নতুন রাজধানীর বিষয়টি মনে হয় একটু ভেবেচিন্তে স্থির করা উচিত।'

'ঠিকই বলেছেন মন্ত্রী মহাশয়। ভাবাবেগের স্থান এখানে রাখা ঠিক না।'

রাজধানী বিষয়ে আলোচনাটি ওখানেই চাপা পড়ে। পুণ্ড্রনগরের প্রশাসকের আতিথ্যে দু'দিন কাটিয়ে স্থলপথে পাটলিপুত্রে যাওয়ার ইচ্ছে করেন দেবপাল। রাস্তাঘাট প্রায় শুকিয়ে গেছে।

মহারাজের হাতিবাহিনী প্রস্তুত হয়। সেনাপতি জয়পাল ঘোড়া ছুটিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসে মহারাজকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে। প্রাগজ্যোতিষ বিজয়ের সাফল্য উদযাপনের জন্য পাটলিপুত্র নগর পুরোপুরি প্রস্তুত। পথে যেতে যেতে যে সব সামন্তরাজ্য পড়বে তাদের জনগণ ও রাজাগণের জন্য মহারাজের পক্ষ থেকে উপহার বিলানো হবে।

রাজধানীর পথে যেতে যেতে সামন্তরাজাদের সঙ্গে খণ্ড খণ্ড বৈঠকে মিলিত হন দেবপাল। প্রজাসাধারণের সর্বোচ্চ সুখশান্তি প্রদানের আশ্বাস নেন তাঁদের কাছ থেকে। যেসব সামন্তরাজার প্রশাসনিক কাঠামো দুর্বল তাদের প্রশাসন ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেন। রাজরক্ষী সৈন্যদল কৃষকদের উপর কোনোভাবে অত্যাচার করতে যেন না পারে তার জন্য সব ব্যবস্থা নেয়ার আদেশ দেন। রাজ্যকর আদায়ের জন্য খেয়াঘাটগুলোর ইজারা ও হাটবাজার হতে 'তোলা' নেয়ার সময় যেন কৃষকের উৎপাদনের উপর লক্ষ্য রাখা হয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বলা হয়। স্থানীয় বিহার ও ধর্মশালাগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য জমি ব্যবস্থা করা, রাজকোষাগার হতে বার্ষিক সহায়তা, প্রভৃতি সহ সব ধরনের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে চালানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দেন মহারাজ।

প্রশাসনিক এসব কাজকর্ম সম্পর্কে যখন খোঁজ খবর নিচ্ছেন দেবপাল রাজদূত খবর নিয়ে আসে যে দক্ষিণের পাণ্ড্য রাজা আবার যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করেছে। মহড়া চলছে ওদের। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রী দর্ভপাণি মহাশয়কে দেখা করার নির্দেশ দেন দেবপাল। দর্ভপাণি এলে জিজ্ঞেস করেন–

'আচ্ছা মহামন্ত্রী, এদের বিষয়টা একটু খুলে বলুন তো আমাকে। বারবার ওরা আমাদের রাজ্যে আক্রমণ চালায় কেন? উদ্দেশ্যটা কী ওদের?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'নির্ভয়ে বলার অনুমতি দিচ্ছেন মহারাজ?'

'হ্যাঁ মন্ত্রী মহাশয়।

'যে কারণে আমরা অন্য রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনা করি তা থেকে ভিন্ন কিছু তো দেখিনে আমি।'

'কিন্তু আমরা তো প্রজাদের কল্যাণে রাজ্যগুলোকে কঠিন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়ে ওটা করি। যারা অকারণে আমাদের উৎখাত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করি।'

'সব রাজাদেরই এই একই উক্তি। বিষয়টা হচ্ছে শক্তির ভারসাম্য।'

'আরেকটু ব্যাখ্যা করবেন মহামন্ত্রী।'

'অন্য সব বিষয়ের মতো শক্তিরও দুটো দিক রয়েছে। আপনার শক্তি কমে গেলে অন্য শক্তি এসে তা পূরণ করবে। আপনারটা বেড়ে গেলে দুর্বলশক্তিগুলোর উপর ওটা প্রয়োগ করবেন আপনি।'

'বুঝেছি দর্ভপাণি মহাশয়।'

'শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়, এবং প্রসারিত হয়, কোথাও স্থির থাকে না।'

'এখন কী পাণ্ড্যরাজ মনে করছেন যে তাঁর কেন্দ্রে অনেক শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। এটার প্রসারণ দরকার?'

'অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে।'

'কী রকম?'

'তিনি হয়তো ভাবতে পারেন যে মহারাজের নিয়ন্ত্রণে অনেক বেশি শক্তি পুঞ্জিভূত হয়েছে যা গ্রাস করতে পারে তাঁকেও।'

'আপনি কী বোঝাতে চান যে সাহস ও ভীতি, দুটোই এক সঙ্গে কার্যকর শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে?'

'ঠিক তাও না। দুটো একসঙ্গে কাজ করতে পারে, আবার পৃথকভাবেও।'

'বিষয়টা একটু জটিল।'

'আজ্ঞে মহারাজ। এই শক্তি নিয়ে খেলাটাই হচ্ছে রাজধর্ম।'

শক্তিসাম্যের বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এটার পেছনে মনে মনে যুক্তি দাঁড় করান দেবপাল। নিজেদের রাজ্যের জনগণকে পাণ্ড্যরাজার সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য হলেও ওখানে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা দরকার। প্রত্যেক রাজারই অধিকার রয়েছে অধীনস্ত প্রজাদের সুরক্ষা দেয়া।

পাণ্ড্যরাজার সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার আগে কজঙ্গলে একবার ঘুরে যেতে চান দেবপাল। ওখানের রাজাকে তাঁর অনুকূলে রাখা ও ওখানে সৈন্যশক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে। যেন প্রয়োজন হলে কজঙ্গলের দিক থেকেও পাণ্ড্যরাজাকে চেপে ধরা যায়। দর্ভপাণি মহাশয় পরামর্শ দেয় যে সেক্ষেত্রে বরং তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত মহারাজের এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। তাম্রলিপ্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দরটি পালরাজ্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ নৌবন্দর। পালরাজাদের শক্তিশালী নৌঘাঁটি রয়েছে সেখানে। দক্ষিণের রাজাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে বিশাল শক্তিশালী সেনাকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন ওখানে।

'তাহলে তো এ বছর পাটলিপুত্র ফেরাই হবে না দর্ভপাণি মহাশয়।'

'পাটলিপুত্রে ফিরে যেতে হবেই এমন তো দিব্যি নেই মহারাজ।'

'তা অবশ্য নেই।'

'কিন্তু মহারাজ, আমরা তো পাটলিপুত্রই যাচ্ছি।'

'দেখুন দেখি, আমার মনে হচ্ছিল, আমরা বুঝি কজঙ্গলের পথে রয়েছি, আর সেখান থেকে তাম্রলিপ্তি যাচ্ছি।'

'আজ্ঞে না মহারাজ, আমরা পাটলিপুত্র যাচ্ছি। সেনাপতি জয়পাল এসেছেন আপনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এগিয়ে নেয়ার জন্য।'

পাটলিপুত্র যাওয়ার পথে ছোটো ছোটো রাজ্যগুলোর শত শত তোরণ পেরিয়ে, ফুলের পাপড়ি ছড়ানো পথে জনগণের সারিবদ্ধ করতালির মধ্য দিয়ে বীরবেশে এগিয়ে যায় দেবপালের রাজকীয় সৈন্যদল। সবুজে সবুজময় প্রকৃতির কোলে অসংখ্য ফুল ও ফলে ভারানত গাছপালা, অসংখ্য পাখি ও প্রজাপতি, ফসলখেতের শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। প্রাচুর্য ভরা এদেশটায় রাজা হওয়া যেমন সৌভাগ্যের তেমনি এটার প্রজা হওয়াও সৌভাগ্যের। সামান্য পরিশ্রমে নিজেদের জীবন নির্বাহ করা যায় এদেশে। জীবন যাপনের এত অঢেল উপকরণ বিশ্বের অন্য কোনো অংশে রয়েছে কিনা জানা নেই দেবপালের। গল্প শুনেছে পশ্চিমদেশীয় মানুষেরা ও হিমালয়ের ওপারের মানুষেরা শুধু জীবনধারণের জন্য কী কঠিন সংগ্রাম করে! নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য দিনরাত অন্যের সম্পদ চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি করে। ওদের রাজারাও সব সময় অন্য রাজ্যগুলো আক্রমণ করে শুধু বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের জন্য। দর্ভপাণির কথা অনুসারে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য নয়। এ নিয়ে আরেকদিন কথা বলবে ওর সঙ্গে। এখন পাটলিপুত্রে ফিরে নিজের প্রাসাদে অবস্থান করে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন। পুবের আর্দ্র জলহাওয়া শরীরের উপর কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। এটারও প্রতিকার প্রয়োজন। আগামী যুদ্ধগুলোর জন্য প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিতে হবে। হাতির হাওদায় বসে জনগণের শুভেচ্ছা নিতে নিতে মাথার ভেতর এসব ভাবনা কাজ করে চলেছে দেবপালের অবচেতনে।

পাটলিপুত্র পৌছার পর বিজয়োল্লাসের ঘনঘটা পেরোতে প্রায় এক হপ্তা লেগে যায়। মহামন্ত্রী দর্ভপাণিকে ডেকে বলেন মহারাজ, এবার সত্যিই কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে চান তিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাই হবে মহারাজ। নৃত্যগীত প্রভৃতি অনুষ্ঠানাদি অথবা ক্রিড়াকৌশল জাতীয় কিছু আয়োজনের আদেশ দেবেন মহারাজ?'

একটু ভাবনায় পড়েন দেবপাল। বিকেলে বা সন্ধ্যার পর গানবাজনা শোনা যেতে পারে। এজন্য তো আর বিশেষ আয়োজনের প্রয়োজন নেই। খেলাধূলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। ওতে হয়তো বিকেলটা উপভোগ করা যাবে। সেই সঙ্গে প্রজাসাধারণের জন্য কিছুটা চিত্তবিনোদনেরও ব্যবস্থা হবে।

'ঠিক আছে মন্ত্রী মহাশয়, একটা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।'

'সংগীত, মহারাজ?'

আবার একটুক্ষণ ভাবেন দেবপাল। বঙ্গে এক কবির গান শুনেছিলেন তিনি নৌযাত্রার সময়। ওর নামটা মনে করার চেষ্টা করেন। ওর গানের কথাগুলো ছিল খুব মর্মস্পর্শী। দর্ভপাণিকে জিজ্ঞেস করেন–

'দর্ভপাণি মহাশয়ের কী মনে আছে এক পাহাড়ি বঙ্গাল কবির কথা, নৌকায় গান শুনিয়েছিল আমাদের।'

'ঐ বুড়ো, মনে হয় মহারাজ শবরপাদের কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ, শবরপাদ বা শবরীপাদ।'

'ও তো খুব বুড়িয়ে গেছে মহারাজ। দেখি লোক পাঠিয়ে আনানো যায় কিনা।'

'ওর গান অন্যেরা গায় না?'

'তা নিশ্চয় গায়। যদ্দূর জানি বজ্রযানী গ্রন্থ রচনা করেছে সে।'

'বজ্রযানী!'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

আর কিছু বলেন না মহারাজ। শবরপাদের জন্য বঙ্গে দূত পাঠান দর্ভপাণি। বার্ধক্যের জন্য শবরপাদ চলাচলরহিত হয়ে শয্যাশায়ী। তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হয় না। রাজদূতের সঙ্গে একজন কবিতা আবৃত্তিকার পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি। তাঁর কবিতা শুনিয়ে মহারাজকে মুগ্ধ করে ঐ আবৃত্তিকার। শবরপাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন দেবপাল। কবিদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিভিন্ন রাজ্যে নিষ্কর জমি উপঢৌকন দেয়ার আদেশ দেন তিনি।

হপ্তা দুয়েকের একটা দীর্ঘ বিশ্রামে থেকে শারিরীক ক্লান্তি কাটিয়ে ওঠেন দেবপাল। সেনাপতি জয়পালকে ডেকে পাঠান প্রাসাদে। এ বছর আর কোনো যুদ্ধাভিযানে না যেয়ে করায়ত্ব রাজ্যগুলো পরিদর্শন ও শান্তিশৃঙ্খলা সমুন্নত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন দেবপাল। পিতাজি ধর্মপালদেব সিন্ধু অববাহিকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে শুরু করে গঙ্গা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা জুড়ে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য গড়ে দিয়ে গেছেন সেটাকে স্থিতিশীল রাখাও এক মহাযজ্ঞ। নতুন করে রাজ্য জয়ের প্রয়োজনীয়তা আপাতত না ভাবলেও চলে। জয়পালকে পাটলিপুত্রে রেখে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেবপাল কজঙ্গল ও তাম্রলিপ্তি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন আবার। কিন্তু মহামন্ত্রী দর্ভপাণি পরামর্শ দেন যে তার চেয়ে বরং মহারাজ দেবপাল থেকে যান রাজধানী নগরীতে। জয়পালদেব সৈন্যসামন্ত নিয়ে কজঙ্গল হয়ে তাম্রলিপ্তি ঘুরে আসুক। এতে শক্তিমত্তা প্রদর্শন করা হবে একদিকে আবার পাণ্ড্যরাজার জন্য একটা আগাম সতর্কবার্তাও ঘোষিত হবে। সিদ্ধান্তটা একটু পাল্টে দুর্গম কজঙ্গলের পথে জয়পালের সৈন্যবাহিনী প্রেরণ ও তাম্রলিপ্তির পথে নৌসেনাদলের মহড়া অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। তাম্রলিপ্তির প্রশাসকের অধীনে যে সৈন্যবহর আছে তার শক্তিবৃদ্ধি করে একটা স্থায়ী সেনানিবাস গড়ার জন্য কয়েকশো রণতরী বাড়ানোর আদেশ দেন। প্রতিপক্ষের গুপ্তচরেরা যেন ওদের রাজাদের কাছে দেবপালের রণসজ্জা বিষয়ে জানাতে পারে।

বিশালত্বের দিক থেকে পালরাজ্যটি মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজ্যসীমা অপেক্ষা কিছুটা ছোটো হলেও গুপ্ত, সুঙ্গ বা নন্দীরাজের সাম্রাজ্য হতে অনেকাংশে বড়। সম্রাট অশোকের সময় সমগ্র ভারতবর্ষের জনসংখ্যাই বা কত ছিল, মাত্র তিন কোটি! কলিঙ্গের যুদ্ধে ওদের একটা বড় অংশকে আবার হত্যা করেছিলেন তিনি রাজ্য জয় করতে যেয়ে। কথিত আছে প্রায় তিন লক্ষ মানুষের মৃতদেহে কলিঙ্গকে কলঙ্কিত করেছিলেন তিনি। আরও প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ হয়েছিল আহত ও মৃতপ্রায়। বীরের মতো প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল কলিঙ্গের প্রায় পুরো জনগোষ্ঠী! জীবিতাবস্থায় অশোকের কাছে নতিস্বীকার করেনি ওরা। এরপরই নাকি অশোকের মতি-পরিবর্তন হয়েছিল। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক বলে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রাজ্যের প্রজাদেরও বাধ্য করেছিলেন গৌতমের অনুসারী হতে। ওটাও তো সহস্রাধিক বছরের পুরোনো ইতিহাস। ভারতবর্ষ হতে ঐ বৌদ্ধধর্ম আবার প্রায় বিলুপ্তও হয়ে পড়েছে।

সম্রাট অশোকের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি নিয়ে মাথাব্যথা নেই দেবপালের। কিন্তু তাঁর প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন তাঁর সভাসদদের সঙ্গে। এত বিশাল একটা সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রাখার জন্য নিশ্চয় একটা দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাঁর সময়ে। হাজার বছরে যদিও ওটা একই রকমভাবে টিকে থাকার কোনো কারণ নেই, কিন্তু ওটার ধারাবাহিকতা নিশ্চয় রয়েছে। যে প্রক্রিয়ায়ই হোক, সম্রাট অশোক সমগ্র ভারতবর্ষকে একত্রিত করেছিলেন। দেবপালের মনের ভেতর গোপন বাসনা রয়েছে ভারতবর্ষকে আবার ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুপ্ত সম্রাটদের প্রশাসনিক কাঠামোর অস্তিত্ব এখনও গৌড়রাজ্যে রয়েছে। পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন স্বয়ং সম্রাট। ফলে একটা দক্ষ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল ওটা। এবছর যুদ্ধাভিযান না থাকায় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করেন দেবপাল। পাটলিপুত্রের রাজধানীসুলভ কোলাহলের বাইরে মঞ্জীর নগরীর বাগানবাড়িতে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। এই বাগানবাড়িটার অভ্যন্তরভাগ রাজপ্রাসাদের মতো জাঁকজমকপূর্ণ। চারদিক ঘেরা বিশাল গাছপালা ও বাগানের জন্য ভেতরের ছোট্ট প্রাসাদভবনটা চোখে পড়ে না। প্রাসাদের ভেতরে সাজানো রয়েছে প্রচুর দামি আসবাবপত্র। দরজা জানালা ও দেয়ালগুলো সব খোদাই করা কাঠের অলঙ্করণে সজ্জিত। শীতকালে ফুলে ফুলে ঢেকে যায় পুরো প্রাসাদ প্রাঙ্গন। প্রাসাদের দক্ষিণদিকের ঘরগুলো দেবপালের পছন্দসই আসবাবে সাজানো। বারান্দায় বসে শীতের সকালের রোদ উপভোগ করতে ভালো লাগে তাঁর। টানা লম্বা বারান্দায় সভাসদদের নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি।

মঞ্জীরের প্রশাসক তীর্থঙ্কর শিবের পূজারী। নগরীর উপকণ্ঠে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানায় সে। ওখানের অধিকাংশ প্রজা শৈব ধর্মাবলম্বী। সানন্দে সম্মতি জানান দেবপাল। তীর্থঙ্করকে জিজ্ঞেস করেন–

'বৈষ্ণব নেই এখানে তীর্থঙ্কর মহাশয়?'

'আজ্ঞে মহারাজ, অনেক আছে।'

'ওরাও আপনার প্রজা সামন্ত মহাশয়। আপনি শৈব বলে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে করেন, বৈষ্ণবদের জন্যও বিষ্ণুমন্দির নয় কেন?'

'অনেক প্রাচীন একটা বিষ্ণুমন্দির রয়েছে ওদের মহারাজ।'

'তাহলে নতুন একটা গড়ুন। প্রজাদের তো সমান চোখে দেখতে হবে রাজামশায়। সব ধর্মের মানুষই সমান মর্যাদাবান। প্রত্যেকের নিজনিজ বিশ্বাস তাদের কাছে মূল্যবান। এটা তো আমাদের মনে রাখতে হবে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'কালই ওদের সঙ্গে কথা বলুন। ওরা নতুন মন্দির নির্মাণ করতে চায়, না পুরোনো মন্দির সংস্কার বা সম্প্রসারণ চায় জেনে নিন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'ওরা হয়তো দুটোর একটাও না চাইতে পারে। হয়তো মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি চাইতে পারে। অথবা নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ চাইতে পারে। বিষয়টা ওদের চাওয়ার উপরই ছেড়ে দিন।'

'যথা আজ্ঞা প্রভু।'

প্রাসাদের একদিকে একসারি কামরাঙা গাছে থোকা থোকা ফল পেকে হলুদ হয়ে আছে। এক ঝাঁক টিয়ে গাছগুলোর পাতার ফাঁকে ফাঁকে নেচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছে। দু'একটা কামরাঙা ঠুকরে খায় পাখিগুলো আর মাটিতে ঝরিয়ে ফেলে অনেক। মাঝে মাঝে কর্কশ স্বরে চিৎকার করে যখন ডেকে ওঠে কোনো একটা পাখি, মনে মনে ভাবেন দেবপাল, 'এত সুন্দর পাখিগুলোর কণ্ঠ এত কর্কশ হয় কী করে!' শরীরের হালকা সবুজ রং, হলুদ ঝুঁটি আর লাল বাঁকানো ঠোঁটে অপূর্ব দেখায় ওদের।

রাজসভা শেষ করে প্রাসাদ প্রাঙ্গনে পায়চারি করতে বেরোন দেবপাল। শুকনো শীতঋতুতে জল না পেয়ে ঘাসগুলো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। মালীকে ডেকে বলেন, 'শুধু ফুলগাছে জল ঢাললে হবে মশায়, এই দুর্বাঘাসগুলোও যে বেঁচে থাকতে চায়।'

হাতজোড় করে মালী বলে–

'জল ছাড়াই দিব্যি বেঁচে থাকে ওরা মহারাজ।'

'তাই নাকি হে?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'একই মাটি থেকে এত প্রাণশক্তি সংগ্রহ করে কীভাবে ওরা?'

'ওদের চাহিদা কম, প্রভু।'

'এটা একটা কাজের কথা বলেছ হে মালী বাবু।'

'আজ্ঞে প্রভু।'

কামরাঙা গাছের সারিটা দেখিয়ে বলেন–

'ওগুলোয় জল দাও না মালী?'

'আজ্ঞে না, প্রভু।'

'তাহলে কী ওদেরও চাহিদা কম?'

'মাটির অনেক গভীরে শিকড় ছড়িয়ে জল শুষে নিতে পারে ওরা, প্রভু মহারাজ।'

'তাই বল মালী, চাহিদাটা তাহলে বড় কথা না, প্রয়োজনটাই বড়, প্রয়োজনেই মাটির অনেক গভীরে যেতে হয় ওদের।'

'আজ্ঞে পভু।'

'চাহিদা সীমিত রাখা যায়, প্রয়োজনটা মেটাতে হয়।'

'আজ্ঞে পভু।'

হাঁটতে হাঁটতে একটা সরোবরের সামনে এসে পড়েন দেবপাল। অসংখ্য পদ্ম ফুটে রয়েছে ওখানে। লাল, নীল ও সাদা রঙের পদ্মফুলগুলো চোখ জুড়িয়ে দেয়। সরোবর তীরে কিছুক্ষণ বসার ইচ্ছে করেন দেবপাল। মালীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গতিতে দৌড়ে যেয়ে অনুচরদের খবর দেয়। মহারাজ সরোবরের তীরে পৌঁছানোর আগেই আসন নিয়ে উপস্থিত হয় অনুচরেরা। রোদের দিকে পিঠ পেতে বসেন দেবপাল। হাঁস ও জলচর পাখি রয়েছে সরোবরে। তীরের গাছগুলোয় দু'একটা মাছরাঙা বসে রয়েছে স্থির হয়ে। হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেমে এসে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেয় একটা ছোটো মাছ। তারপর আবার যেয়ে বসে থাকে ধ্যানমগ্ন হয়ে। সাদা সাদা রাজহাঁসগুলো ভেসে বেড়ায়। মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যায় জলের নিচে।

ভারতবর্ষের পূর্বাংশটা এত সবুজ, এত সুন্দর! প্রকৃতির এই রূপে মুগ্ধ হয়ে চুপচাপ বসে থকেন দেবপাল। কিছুক্ষণ পর মনে হয় তাঁর ক্ষুধা পেয়েছে। দুপুরের খাবার এই সরোবর তীরে বসে সম্পন্ন করতে চান। খাবারের জন্য ভৃত্যের দল কাজ শুরু করে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। প্রধান রাজপরিচারক ভবানন্দকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন রাজ-অতিথিদের খাওয়ার ব্যবস্থা যেন এখানে করা হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে নিরিবিলি সরোবর তীরটা অতিথি ও অভ্যাগতে ভরে ওঠে। এদের নিয়ে আহারাদি সেরে সামন্তরাজা দামোদরকে জিজ্ঞেস করেন–

'এমন একটা বাগানবাড়ি থাকতে মজ্ঞীর প্রাসাদে থাকতে ইচ্ছে হয় আপনার দামোদর মহাশয়?'

'প্রশাসনিক কাজে থাকতে হয় মহারাজ। অবসর কাটানোর জন্য মাঝে মাঝে আসা যায়, কিন্তু রাজ্য-পরিচালনা সম্ভব না এখান থেকে। সারাক্ষণ সৈন্যসামন্ত, হাতিঘোড়া ও রথের ছোটোছুটি চললে এটা তো আর বাগানবাড়ি থাকবে না মহারাজ।'

'তা ঠিক রাজামশায়।'

'রাজ-অতিথিদের ব্যবহারের জন্য এটা ব্যবহার করা হয় শুধু মহারাজ।'

' ব্যবহার হয় কেমন?'

'প্রায় সারা বছরই কেউ না কেউ থাকেন। বিশেষ করে শুকনো মওসুমটা খালি যায় না। বর্ষাকালে অতিথি তেমন আসেন না।'

'একটা বর্ষা নাহয় আমিই কাটিয়ে যাব দামোদর মহাশয়।'

'সে তো মজ্ঞীর রাজ্যের মহাসৌভাগ্য, মহারাজ।'

'দেখা যাক রাজামশায়। সত্যি সত্যি মনে ধরেছে জায়গাটা আমার।'

'পরম সৌভাগ্য আমাদের প্রভু।'

দ্রুত শেষ হয়ে যায় শীতের বিকেল। দিনের ম্রিয়মান আলো নিভে যেতে শুরু করেছে। ঠাণ্ডা লাগে এখন বেশ। অতিথিরা চাদর মুড়িয়ে শীতের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করে। মহারাজ সভা ভঙ্গের আদেশ দিচ্ছেন না দেখে রাজা দামোদর জিজ্ঞেস করেন–

'সন্ধ্যার পর নৃত্যগীতের আয়োজন করব প্রভু?'

'এখনি করুন না কেন রাজামশায়।'

হেসে উঠে অতিথিরা। বেশ আমুদে মেজাজে রয়েছেন মহারাজ। রাজা দামোদরকে বলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আগে একটা অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করেন না দামোদর মহাশয়।'

'তাহলে সরোবরের ওদিকটায় যেতে হবে মহারাজ। চারদিক ঘেরা ও মাঝখানে খোলা একটা জায়গা আছে ওখানে। আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসা যায় চত্বরটার চারদিকে। মশাল জ্বালানোর ব্যবস্থাও আছে।'

' নৃত্যগীতের ব্যবস্থা ওখানে করবেন কীভাবে?'

'নৃত্যের ব্যবস্থা এত দ্রুত সম্ভব হবে না হয়তো, মহারাজ। গীত হবে।'

'আজ কী একাদশী না দ্বাদশী রাজামশায়?'

'একাদশী মহারাজ।'

'চাঁদটাকে অনেক বড় মনে হচ্ছে।'

'আজ্ঞে পভু।'

অনেক রাত পর্যন্ত গুণী শিল্পীদের সংগীত পরিবেশন চলে আগুনের চারদিক ঘিরে। মনের ভেতর গভীর প্রশান্তি নিয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন দেবপাল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩

যমুনেশ্বরী নদীতীরে গুরুগৃহে শুরু হয় বীতপালের নতুন জীবন। নদীর তীর ঘেসে এক টুকরো সমতল সবুজ প্রান্তর। তারপর ঘন গাছপাছালির সরু জঙ্গল। এর পেছনে অনেক ক'টা ঘর জুড়ে বীতপালের গুরুদেব দেবজ্যোতির বিশাল কর্মশালা। একটা ঘরে কষ্টিপাথরের মূর্তি নির্মাণের কাজ চলে ভাস্কর রুবেরুর অধীনে। সারাদিন পাথর কাটার ঠুকঠুক শব্দ ওঠে ওখান থেকে।

শিক্ষানবিশ হিসেবে ওখানে কাজ শুরু করে বীতপাল। নদী বেয়ে নিয়ে আসা বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই এনে ঘরের পাশে ফেলে রাখে শ্রমিকেরা। ওগুলোর গায়ে মূর্তির আদল ফুটিয়ে তোলার আগে কেটে ছোটো চৌকো শ্লেটের আকার তৈরি করে পাথর কাটায় দক্ষ কারিগরেরা। খুব পরিশ্রমের কাজ ওটা। শক্ত লোহার ছেনির উপর হাতুড়ির আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছোটে। অনেক শ্রমিক আহত হয়। কারো কারো চোখ নষ্ট হয়ে যায়। খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। শুরুতে ভয় ভয় লাগে বীতপালের। কিন্তু গুরুদেব দেবজ্যোতির উৎসাহে কিছুদিনের মধ্যে ভয় কেটে যায়। পাথরের মোটা শ্লেটের গায়ে খড়িমাটি দিয়ে মূর্তির গড়ন এঁকে ধীরে ধীরে প্রাথমিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে হয়। অনেক পাথর ভেঙে যায় এসময়। নতুন করে অন্য আরেকটা পাথর নিয়ে কাজ শুরু করতে হয় আবার। একটা কাঠামো দাঁড় করাতেই অনেক পাথর ব্যবহার করতে হয় কোনো কোনো সময়। তারপর শুরু হয় মূর্তির দেহভঙ্গিমা ফুটিয়ে তোলার কাজ। ওটার পর অলঙ্করণ ও অন্যান্য সুক্ষ্ম কাজ। বছরের পর বছর কেটে যায় কোনো একটা প্রতিমা গড়ে তুলতে। এ রকম একটা প্রতিমা ওকে দেখায় দেবজ্যোতি। দেবী মারিচীর প্রতিমা। দেবজ্যোতির শিক্ষানবিশকাল থেকে নাকি এটার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও শেষ করে উঠতে পারেননি। অসম্ভব শক্ত পাথর। খুব বেশি শক্তিও প্রয়োগ করা যায় না। খুব ধীরে ধীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারিচী দেবীর পৌরাণিক কাহিনিটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। মারিচী দেবীর রথবাহক সপ্তবরাহের চিত্রটি পাথরে ফুটিয়ে তুলতেই নাকি সাত বছর লেগেছিল তাঁর।

বীতপালের মা ব্রাহ্মণকন্যা সুতন্বীর কাছে সনাতন ধর্মের পৌরাণিক অনেক কাহিনি শুনেছে সে। হিন্দুপুরাণে সূর্যদেবের বাহন সপ্তাশ্ব চালিত রথ। বিষয়টা কৌতূহল সৃষ্টি করে ওর মনে। দেবজ্যোতিকে জিজ্ঞেস করে–

'গুরুদেব, মারিচী দেবীর বাহক সপ্তবরাহ কেন? ওদেরকে কী রথ টানায় ব্যবহার করা হত?'

'বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলতে হবে তোমাকে। হিন্দু ধর্মে সূর্যদেব অশ্ববাহিত। আর বৌদ্ধ ধর্মে মারিচী দেবী বরাহবাহিত। বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনিতে এভাবে পৌরাণিক পার্থক্য তৈরি হয়। কাহিনি হয়তো একই। কিন্তু উপস্থাপন ভিন্ন। পৌরাণিক কাহিনিগুলো সাধারণত রূপকধর্মী। অশ্ব বা বরাহ এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এসব কাহিনির পেছনে সত্য বা অসত্য খোঁজার প্রয়োজন নেই। তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এসব পৌরাণিক কাহিনির অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য ও মূল সুর। এটার বক্তব্য তোমার ভেতর যে ব্যঞ্জনা তৈরি করে, এবং এর ভিত্তিতে তুমি যে শিক্ষাটা লাভ করলে, তা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। এসব পৌরাণিক কাহিনি গড়ে উঠেছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টির জন্য, যেন মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। অভ্রান্ত বলে এসব বিশ্বাস করতে হবে, তেমন কোনো দিব্যি তো কেউ দেয়নি তোমাকে। এগুলো বিশ্বাস না করলে তোমার মাথা কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়নি ওরা।'

'বুঝেছি গুরুদেব।'

'তোমার পিতা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তোমার মা ব্রাহ্মণদুহিতা। আমি নিজেও ব্রাহ্মণ। শুধু যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি আমি নির্মাণ করে চলেছি তা তো না।'

'আজ্ঞে গুরুদেব। মারিচী বৌদ্ধ পৌরাণিক দেবী।'

'হ্যাঁ, ওটা নির্মাণ করে চলেছি আমার জীবনের গুরু থেকে। শেষ করে যেতে পারব কিনা জানি না।'

'নিশ্চয় পারবেন গুরুদেব।'

'এই যে বরাহর বিষয়টি ওঠালে তুমি, এখানেও পরিবর্তন আনা যাবে। উপনিষদে ভক্তকে অনুমতি দেয়া আছে, যে-কোনো রূপে তুমি তাঁর উপাসনা করতে পার। সবার ভালোলাগা তো এক রকম না। তোমার যে রূপটি ভালো লাগে সেরূপেই তুমি ঈশ্বরের উপাসনা করতে পার। ঈশ্বরের তো কোনো রূপ নেই। তোমার কল্পনার ভালোলাগা রূপে তাঁর সাধনা কর তুমি। যে হিন্দু ভক্ত সূর্যদেবতার রূপটি সর্ব প্রথম কল্পনা করেছিলেন তাঁর কাছে হয়তো ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিবসটিকে মনে হয়েছিল খুব দ্রুত ধাবমান, শীতকালীন, ফলে তাঁর কল্পনায় এসেছে সূর্যদেব সপ্তাশ্ব বাহিত। খুব দ্রুত আকাশরেখা অতিক্রম করে যান। আর যে বুদ্ধভক্ত মারিচী দেবীর কল্পনা করেছিলেন তিনি হয়তো গ্রীষ্মের ধীর দিনের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে তাঁর রূপে জুড়ে দিয়েছিলেন ধীরগামী বরাহ। এ রকম অনেকভাবেই কল্পনা করা যায়।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'ঈশ্বর তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে বীতপাল, মানুষ তোমাকে স্বাধীনতা দেবে না। এখন তুমি যদি মারিচী দেবীর রথের বাহক হিসেবে সাতটি বরাহ না এঁকে আটটি বা ছ'টি আঁকো, অথবা বরাহের বদলে গর্দভ আঁকো তাহলে বৌদ্ধ শ্রমণেরা তোমার মুণ্ডুপাত করবে।'

ভাবনায় পড়ে বীতপাল। জিজ্ঞেস করে–

'তা কেন হবে, গুরুদেব?'

'এটার জবাব আমার জানা নেই বীতপাল। অনুমান করতে পারলেও, উচ্চারণ করতে পারব না। এক সময় তুমিই বুঝে নেবে এসব।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'তুমি বুঝবে। কারণ তোমার ভেতর রয়েছে দুটো ধর্মের মিশ্রণ। তোমার পিতা বৌদ্ধ আর মাতা ব্রাহ্মণ। তোমার পিতাজির কাছে জেনেছি, তিনি সুশিক্ষিতা। যে শিল্পাচার্যের গৃহে তিনি পালিত হয়েছিলেন তিনি একজন সত্যি অর্থেই জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তোমার পিতাও ঐ গুরুদেবের শিষ্য। জন্মগতভাবে এক শৈল্পিক উত্তরাধিকার অর্জন করেছ তুমি।'

'আপনার শিষ্যত্ব অর্জনের জন্য পিতাজি আপনার হাতে ন্যস্ত করেছেন আমাকে। আপনার সব নির্দেশনাই আমার শিরোধার্য, গুরুদেব।'

'কথা হচ্ছিল ধর্ম নিয়ে বীতপাল। কোনো ধর্মের ঈশ্বরই তোমার স্বাধীনতা খর্ব করেননি। এমনকি ধর্মপ্রচারকেরাও না। কিন্তু ঐসব ধর্মের ধ্বজাধারীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষের মুক্তি নেই। কিন্তু তুমি শিল্পী। তোমাকে থাকতে হবে স্বাধীন। এই আমাকে দেখ। পৈতৃক ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদ। ওটা ত্যাগ করিনি। আবার পালনও করছি না। প্রকৃতপক্ষে একজন শিল্পী নির্দিষ্ট যে-কোনো ধর্মের ঊর্ধ্বে। কারণ কোনো শিল্পকর্মই একটা নির্দিষ্ট ধর্ম অবলম্বনকারীদের জন্য গড়ে তোলা হয় না। সকল ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের ঊর্ধ্বে উঠে শিল্পনির্মাণ করতে হবে তোমাকে। ঈশ্বরের মতো নক্ষত্ররাজির ঊর্ধ্বে হবে না তোমার অবস্থান। আবার ঈশ্বরের দাস হিসেবে ধুলোয়ও লুটোতে পারবে না তুমি। একজন শিল্পী হবে ঈশ্বরপ্রতীম। একটা নিজস্ব সত্ত্বা ও স্বকীয়তা থাকবে তার। ছোটো বা বড়, যে রকমই হোক।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

দেবপাল-দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি জানিনে বোঝাতে পারছি কিনা তোমাকে।'

'পারছেন গুরুদেব।'

'বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য গুরুতেই সেরে নিচ্ছি এটা। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠতে হবে তোমাকে। না হয় শিল্পকর্ম হবে না তোমাকে দিয়ে। ধর্মীয় সীমারেখার বাইরে বেরিয়ে আসতে না পারলে কারো শিল্পজগতে বিচরণ করা উচিত না।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'আমি কিন্তু ধর্মকর্ম ত্যাগ করতে বলিনি তোমাকে।'

'আজ্ঞে না, গুরুদেব।'

'যেখানে খুশি যাও তুমি, বৌদ্ধমন্দির বা বিষ্ণুমন্দির, শিবমন্দির বা জৈনমন্দির, ওগুলো তোমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন শিল্পী একই সঙ্গে একজন সামাজিক মানুষও। সমাজ ও সংস্কৃতি এড়িয়ে চলা তার উদ্দেশ্য নয়। সমাজের বিধান তাকে মেনে চলতে হয়। পূজা-অর্চনা তাকেও করতে হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে যেতে হয়।'

'বুঝেছি গুরুদেব।'

'অনেক বেলা হয়েছে বীতপাল। বিশ্রাম নাও এবেলা। ওবেলা কাজে হাত দিও।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

দেবজ্যোতি মহাশয় ওখান থেকে চলে যাওয়ার পর নিজেকে মহাভাগ্যবান মনে হয় বীতপালের। এমন এক মহান শিল্পীর অধীনে কাজ করতে পারা সত্যি এক মহাসৌভাগ্যের বিষয়।

গুরুদেবের নির্দেশনা ও নিজের সৃজণশক্তি-নৈপুণ্যে অচিরেই পালরাজ্যের এক খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয় বীতপাল। জগদ্দল, ওদন্তপুরী, সোমপুর, বিক্রমশীলা প্রভৃতি মহাবিহার সহ ছোটো বড় অনেক বিহারে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ওর হাতে গড়া বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। বিষ্ণু, শিব, জৈন, শাক্ত প্রভৃতি মন্দিরগুলোতেও প্রতিমা গড়িয়ে নেয়া হতে থাকে দেবজ্যোতির প্রতিষ্ঠিত করতোয়া তীরের এই নির্মাণশালাটি থেকে। পিতা ধীমানের মতো কীর্তিমান শিল্পী হিসেবে ছড়িয়ে পড়ে বীতপালের নাম।

কাজের ভেতর ডুবে থেকে নিজগ্রামে যাওয়ার কথাও ভুলে থাকে বীতপাল। মাঝে মাঝে ধীমান এসে বছরে একদু'বারের জন্য নিয়ে যায় ওর গ্রামের বাড়িতে। খুব বেশি দিন থাকতে চায় না বীতপাল। বিষয়টা বোঝে ধীমান। কিন্তু বুঝতে চায় না সুতন্বী। ও চায় বছরের অন্তত কয়েকটা মাস বাবামায়ের সঙ্গে কাটাক বীতপাল। ধীমানের কর্মশালার বিভিন্ন শিল্পকর্ম দেখতে তিনজনেই ভেতরে ঢোকে একদিন। পালরাজ্যের সর্বত্র এখনও বিভিন্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পকর্মের চালান যায় ধীমানের কর্মশালা হতে। ধীমানের কিছু কিছু কাজ দেখে অবাক হয় বীতপাল। এত অসাধারণ কাজ মানুষের হাত দিয়ে বেরোয় কীভাবে! কোনো কোনো মূর্তি দেখে মনে হয় এখনই প্রাণ পেয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবে ওখান থেকে। কোনো কোনো মূর্তির দিকে তাকালে মনে হয় ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে। মুখের এরকম আশ্চর্য অভিব্যক্তি পাথরের বুকে ফুটিয়ে তোলা এখনও সম্ভব হয়নি বীতপালের। ধীমানকে জিজ্ঞেস করে–

'মুখের এসব রেখা, অভিব্যক্তি কী করে ফুটিয়ে তোলো বাবা? আমি তো পারি না।'

'তুই তো পাথর নিয়ে কাজ করিস। শক্ত মাধ্যমে ওটা ফুটিয়ে তুলতে আরও সময় লাগবে হয়তো। তবে পারবি নিশ্চয় একদিন।'

একটা মূর্তির গালের টোল দেখিয়ে বলে–

'পাথরে এটা কীভাবে ফুটিয়ে তুলব বাবা?'

'ঘষে ঘষে!'

হেসে উঠে বীতপাল।

'শুধু এটার জন্য এক জীবন চলে যাবে বাবা।'

'যদি এটাই ফুটিয়ে তুলতে চাস তাহলে একটা জীবন তো লাগবেই। একটা মহৎ শিল্প গড়ে তোলার জন্য একটা জীবন হয়তো যথেষ্টও না। অনেকের জীবন কেটে যায় শুধু সাধনায়। সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে দেখে সামর্থ্য ফুরিয়ে গেছে। তখন ভাবে, আহা, আর ক'টা দিন আয়ু পেলে!'

'হ্যাঁ বাবা, তাই হবে।'

'ঠোঁটের এই হাসির রেখাটা যে ফুটিয়ে তুলেছ তা পাথরে ওঠানো খুব কঠিন হবে।'

'কঠিন হয়তো হবে। তবে অসাধ্য না।'

'তোমার এসব কাজের একদু'টা নিয়ে যাব?'

'এগুলো তো তোর মায়ের কাজ। আমি শুধু প্রতিমাটা গড়ে দেই। তারপর সূক্ষ্ম কাজগুলো বসে বসে করে তোর মা।'

'তাই মা?'

'হ্যাঁ, তোর বাবা তো সারা জীবনে দুটো মাত্র প্রতিমা গড়েছে।'

'ও দুটো তো আমাদের গৃহদেবী।'

হেসে ওঠে সবাই। বীতপাল জিজ্ঞেস করে–

'মূর্তি দুটো কই মা, দেখি না যে?'

'ও দুটো তোর বাবার পুজোঘরে।'

'বাবার পুজোঘর তো এটাই।'

কিছুটা যেন লজ্জা পায় ধীমান। বলে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিছুদিন এখানে থেকে কাজ কর বীতপা।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে সুতন্বী।

'হ্যাঁ তপা, বাবার কাছে পোড়ামাটির কাজ শিখে যা।'

'পাথর কেটে আমার হাত যা হয়েছে না মা, মাটির কোনো কিছু হাতে ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ধুলো হয়ে যাবে। তোমরাই কর এই মাটির কাজ।'

একটু হতাশ হয় ধীমান। বলে–

'কাজ শুরু করলে আবার কিছুদিনেই নরম হয়ে যাবে হাত।'

আর কিছু বলে না বীতপাল। ধীমান বুঝতে পারে এই ছেলে আর কখনোই ফিরে আসবে না সোমপুর থেকে। শেষ পর্যন্ত মানুষ শেকড়েই ফিরে যায়। ধীমান ফিরে এসেছে এই শেকড়ের টানে। বীতপালের তো ঐ টানটা নেই। সে ফিরবে কেন? কর্মশালার ভেতর ও বাইরে ঘুরে ঘুরে ওর মনে হয় হয়তো এখানেই শেষ এটার আয়ু। গুরুদেবের হাতে গড়া কর্মশালার পরিত্যক্ত রূপটা মনে পড়ে। ওরা ফিরে না এলে আর ক'বছর পর এটা হয়তো মাটির সঙ্গে মিশে যেত। ধীমানেরা এসে ঐ পতনটা রক্ষা করেছে। কারণ ধীমানের ছিল এটার সঙ্গে নাড়ির টান। আর কেউ ফিরে আসবে না এখানে ঐ টানে। গুরুদেবের কারখানায় মাত্র ক'বছরের জন্য আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছে ধীমান। জাগতিক নিয়মে এটার বিলুপ্তি ঘটবে। অন্তিম যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। ধীমানেরই ইচ্ছে হয় না এখন তেমন একাগ্রভাবে আর কাজ করতে এখানে। ওর শিষ্যদের মধ্যে কেউ যদি কখনো আবার এটা চালাতে চায় তাহলে হয়তো কর্মশালাটি আরও একটা বা কয়েকটা জীবন লাভ করবে। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর শেষ আছে। অন্তিম পরিণতি আছে। এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বীতপালকে জিজ্ঞেস করে–

'কংস্যশিল্পের কাজ নিয়ে কিছু এগিয়েছ বিতপা?'

'না পিতাজি। ওটাতে ঘষাঘষি খুব বেশি। আমার কাজটা মূলত ছেনির।'

হেসে ওঠে সুতন্বী।

'শোন ছেলের কথা। সূক্ষ্ম কাজগুলো তো ঘষাঘষিই। ছোটো ছেনি দিয়ে যখন প্রতিমার চোখমুখে অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলিস ওটা কী হাতুড়ি পিটিয়ে, না ছেনি দিয়ে ঘষেঘষে করিস!'

'ও কাজগুলো এখনও গুরুদেব করে। আমি ওসব সূক্ষ্ম কাজ করতে গেলে ভেঙে ফেলি।'

ধীমান বলে–

'হ্যাঁ, ওটাই যৌবনের ধর্ম। আরেকটু বয়স বাড়লে তখন দেখবি, ছেনিতে হাতুড়ি পেটানোর কাজটা তোর শিষ্যকে দিয়ে নিজের হাতে তুলে নিবি সূক্ষ্ম কাজগুলো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুতন্বী বলে–

'এটাই নিয়ম, তপু।'

'আজ্ঞে মা।'

ধীমান বলে–

'কংস্যশিল্পটার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল আমার।'

'অষ্টধাতুর কাজে হাত দিয়েছিলাম বাবা।'

'চালিয়ে যাসনি কেন?'

'আবার হাতে নেব। তখন তোমার কংস্যশিল্পটাও নেব।'

কংস্য শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করে বীতপাল যে সুতন্বী ও ধীমান, দু'জনেই হেসে ওঠে। হঠাৎ বীতপাল বলে–

'ক্ষুধা লেগেছে মা, খাব।'

'চল ঘরে যাই, ভাত খাবি।'

'এখন ভাত খাব না মা, পিঠা খাব।'

'শোনো ছেলের কথা। এত চটজলদি পিঠা বানাবে কে? ওবেলা পিঠা খাস। স্নান করে আয়। বাবার সঙ্গে ভাত খাবি।'

'ঠিক আছে মা।'

বীতপালকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে যায় ধীমান। বাল্যস্মৃতি জেগে ওঠে ওর। হুহু করে মনের ভেতরটা। স্বচ্ছজলের এই নদীতে ওকে সাঁতার শিখিয়েছিল ঠাকুর্দা অভিনন্দ। কত যে সাঁতার কেটেছে এখানে দু'জনে! অভিনন্দের ঐ বয়সে পৌঁছে গেছে এখন ধীমান। বীতপাল অবশ্য তত ছোটোটি নেই এখন। পরিপূর্ণ যুবা। সাঁতার শেখাতে হবে না ওকে। প্রকৃতপক্ষে কিছুই শেখাতে হবে না ওকে। প্রায় সবকিছুই যেমন শিখিয়েছিল ধীমানকে অভিনন্দ। হয়তো বীতপালের কাছেই এখন অনেক কিছু শেখার আছে ধীমানের। ওর বালককালের স্মৃতি আর এযুগের ছেলেমেয়েদের বাল্যস্মৃতির সঙ্গে অনেক পার্থক্য। ধীমানের বাল্যকৈশোরটা গড়ে উঠেছিল ঠাকুর্দা অভিনন্দের হাত ধরে। অভিনন্দ তাঁর নিজের ও পূর্বপুরুষদের স্মৃতি সব ধীমানের কাছে রেখে গেছে। কিন্তু ধীমান তো পারছে না সেসব বীতপালের কাছে স্থানান্তর করতে। অভিনন্দরা জীবন বাঁচাতে পালিয়ে এসেছিল নদীর ওপার হতে। জলজংলা থেকে ভূমি উদ্ধার করে পত্তন করেছিল এই লোকালয়টি। ধীরে ধীরে এখন এটা একটা সমৃদ্ধ অঞ্চল হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতে হয়তো একটা নগরই হয়ে উঠবে। অভিনন্দের ঐ সব কর্মকাণ্ডের বর্ণনা যদি কারো কাছে রেখে যেতে না পারে ধীমান তাহলে ওগুলোর স্মৃতি মুছে যাবে মানুষের মন থেকে।

অতীত স্মৃতি ঘেঁটে চলেছে ধীমান। আর বীতপাল হয়তো বিভোর রয়েছে ভবিষ্যত কোনো পরিকল্পনা নিয়ে। এটাই হয়তো জগতের নিয়ম। জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুরুর দিকে মানুষের দৃষ্টি থাকে সামনে চলার পথের দিকে। আর শেষ দিকে এসে তাকিয়ে দেখে পেছনে ফেলে আসা পথের দিকে। পিতা ও পুত্র, দু'জনে এখন তাকিয়ে আছে বিপরীত দুটো দিকে। ধীমান ও অভিনন্দের মধ্যে যে যোগসূত্রটা তৈরি হয়েছিল তা আর হয় না ধীমান ও বীতপালের মধ্যে। ধীমান ও অভিনন্দের যৌথ দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়েছিল অভিনন্দের অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে। ধীমানের ভবিষ্যত দিনগুলোর কল্পিত এক রূপরেখা তৈরি করেছিল ওগুলো। ওসবের সঙ্গে না ধীমান, না অভিনন্দের ছিল কোনো সাধারণ পূর্বস্মৃতি। শুধু কল্পনায় ভর করে এগিয়ে যেতে পেরেছে ওরা দুটো শিশুর মতো। কিন্তু এখন ধীমান বা বীতপাল কেউই শিশু নয়। প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব সত্ত্বা।

স্নান করে ঘরে ফিরে বীতপাল দেখে চটজলদি কিছু তেলের পিঠে ভেজে ফেলেছে ওর মা। খুশি হয়ে বীতপাল বলে–

'পিঠে ভেজেছ মা!'

'হ্যাঁ, চালের গুঁড়ি ছিল। ভাবলাম সহজেই ভেজে ফেলা যায় এই মালপোয়া পিঠে। নে খা।'

একটা পিঠে এক কামড় খেয়ে বলে–

'বাহ্, বেশ মজা হয়েছে। ক'টা পিঠে ঝাল মিশিয়ে ভাজো না মা।'

সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু চালের গুঁড়োতে মরিচ ও মশলা মিশিয়ে পিঠে ভেজে দেয় ওদের। পেট ভরে তৃপ্তি নিয়ে খায় ওরা। এবার বেশ ক'টা দিন বাবামায়ের সঙ্গে কাটিয়ে যায় বীতপাল। সেও এখন বুঝতে শিখেছে যে বাবামার বয়স হয়েছে। ওদের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো অনেক আনন্দ বয়ে নিয়ে আসে পরিবারের ভেতর। ওর বিয়ে নিয়ে কথা হয় ধীমান ও সুতন্বীর মধ্যে।

'বীতপার বিয়ে নিয়ে ভাবছ কিছু তুমি?'

'ভাবছি নিশ্চয়। পছন্দের কোনো পাত্রী আছে তোমার?'

'আমাদের বৈদিক প্রথায় তো আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হয় না। কিন্তু তোমাদের বৌদ্ধ নিয়মে বাধা নেই। আমাদের পরিবারেই তো একটা মেয়ে আছে। সব বিষয়ে সুলক্ষণা।'

'বুঝেছি কার কথা বলছ তুমি। বীতপাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার।'

'তার আগে তো মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'আমার মনে হয় পিতাজির সঙ্গে আগে কথা বলতে হবে। তিনি সম্মত হলে মনে হয় ওর বাবামায়ের সঙ্গে কথা বলে তিনিই ওটা ঠিক করে ফেলতে পারেন।'

'কথা বল তাহলে বাবার সঙ্গে।'

'তুমি বল। তোমাকে বরং অনেক সমীহ করেন তিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি বলব!'

'কেন অসুবিধে কী? সংসার ভাবনা অনেক ভালো বোঝ তুমি।'

'সত্যি?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'যাক, একটা কৃতিত্ব হলেও তুলে দিলে।'

'কোনটা দেইনি?'

'শিল্পী ধীমান মহাশয়ের স্ত্রী আমি, এটাই তো অনেক বড় কৃতিত্ব।'

'ওসব কথা থাক। বীতপা থাকতে থাকতে পিতাজির সঙ্গে কথা বল।'

'আচ্ছা বলব। তার আগে বিকেলে একটু ইঙ্গিত দেব বীতপাকে।'

'দিও। ওর মনের অবস্থানটাও জানা দরকার।'

ঐ বিকেলে বীতপাকে আর পাওয়া যায় না। দুপুরে খেয়ে এমন ঘুম দিয়েছে যে সন্ধ্যার পরও ডেকে তোলা যায় না। হঠাৎ বৃষ্টি প্রকৃতিতে শীতের আমেজ এনে দিয়েছে। ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো মাটির নিচ থেকে বেরিয়ে কর্কশ স্বরে ডেকে চলেছে। জলাশয়ের ব্যাঙগুলোও আবাস ছেড়ে বেরিয়েছে। নিচু জমিতে জমে থাকা নতুন জলে লাফিয়ে এসে একনাগাড়ে ডেকে চলেছে ঘ্যাঙর ঘ্যাং। রাতবিহারী পাখিগুলোর কুককুক ডাক শোনা যায় থেকে থেকে। নীরব প্রকৃতির মাঝে প্রাণীদের এই সব বিনম্র কলরব চুপচাপ শুনে ধীমান। সায়াহ্নের দিকে এগিয়ে চলেছে জীবন। মাঝে মাঝে খুব শূন্য হয়ে যায় বুকের ভেতরটা। কী অর্থ এই জীবনের! মনে পড়ে ঠাকুর্দা অভিনন্দের কথা। তিনি বলতেন, 'জানিস ধীমান, জীবন হল এক নৌকো, কত বিস্তৃত ও গভীর জলে ভাসাবি তুই এটা, তা তোর বিষয়। খুব বেশি স্রোতের জলে নৌকো না ভাসানোই ভালো। তাহলে হয়তো খুব দ্রুত অনেকটা দূরে চলে যাবি। কিন্তু ডুবে যাওয়ার ভয় অনেক বেশি। আর নিস্তরঙ্গ জলে নৌকো ভাসিয়ে কোনো আনন্দ নেই, লাভ নেই, ঠায় বসে থেকে বিরক্ত হয়ে যাবি। ছোটোখাটো কোনো নদীতে নৌকো ভাসানোই বুদ্ধিমানের কাজ। কখনো এগিয়ে যাবি স্রোতের টানে, আবার যখন স্রোত থাকবে না বইঠা বেয়ে এগিয়ে যাবি। এক সময় না এক সময় তোর ঘাটে পৌঁছে যাবি। তেমন কোনো লক্ষ্য যদি না থাকে তোর তবে খুব দূরের ঘাটের জন্য নৌকো না ভাসানোই ভালো।'

না ঠাকুর্দা, খুব দূরের ঘাটের জন্য নৌকো ভাসাইনি আমি। আর মনে হয় ঘাটের খুব কাছে পৌঁছেও গেছি।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে যাবার দিনক্ষণ ঠিক করার জন্য বলে বীতপাল। সুতন্বী বলে–

'এত তাড়া কেন বীতপাল বাবু! আর ক'টা দিন থাকেন। ভালোমন্দ খেয়ে যান।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসে বীতপাল।

'আজীবন থাকলেও তোমাদের ইচ্ছে পুরোবে না মা।'

'বলেছে তোকে।'

'কালই যাব আমি।'

'তোর বাবাকে বল।'

'তুমি বল।'

'ঠিক আছে বলব। এখন একটা কথা শুধোব তোকে?'

চোখ তুলে তাকায় বীতপাল। ধারণা করে নেয় মা কী বলবে। এ বয়সের ছেলেদের কাছে ঘটা করে কী বলতে চায় সব মায়েরা। বন্ধুদের কাছে অনেক শুনেছে। সুতন্বীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে–

'জানি তুমি কী শুধোবে।'

'জানিস? তাহলে তোর ইচ্ছে আছে।'

হেসে ফেলে বীতপাল।

'আমি বলেছি আছে?'

'বলতে হবে না।'

'না বললাম, নেই।'

ওর মুখের দিকে আবার তাকায় সুতন্বী। বলে–

'তোর বাবার কাছে বল।'

'না, বাবাকে ডেক না।'

'তোর বাবাকে জবাব দিতে হবে তো আমাকে।'

'এখনি দিতে হবে না।'

ওদের কথার মাঝখানে ধীমান এসে উপস্থিত হয়।

'কী কথা হচ্ছে বীতপা, আমি উপস্থিত থাকতে পারি?'

চুপ করে থাকে বীতপাল। সুতন্বী বলে–

'তোমার ছেলেকে শুধাও, ঘরে বউ আনবে নাকি?'

'মনে তো হয় তুমিই শুধিয়েছ।'

'শুধিয়েছি, ছেলের জবাবটা শোন।'

'কী বীতপাল বাবু?'

'আর ক'বছর অপেক্ষা করা যায় না?'

'আমরা বুড়িয়ে গেছি না? কতদিন আছি ঠিক আছে!'

বীতপালের মুখে আর কথা ফোটে না। ধীমান বলে–

'অপেক্ষা হয়তো করা যাবে। কিন্তু মেয়ে দেখা তো শুরু করা যায়।'

সুতন্তী বলে–

'আমাদের গাঁয়ের মেয়ে দেখি আমরা, চেনাজানার মধ্যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথা নিচু করে থাকে বীতপাল। ধীমান বুঝতে পারে এ গাঁয়ের মেয়ে ওর পছন্দ হবে না। বলে–

'অথবা সোমপুরেও দেখা যায়।'

বীতপাল ঘাড় হেলায় এবার। প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে–

'ঠিক আছে বাবা।'

নদীতে জল বেড়েছে বেশ। সোমপুর পর্যন্ত নদীপথে বীতপালের যাওয়ার ব্যবস্থা করে ধীমান। বেশ বড় একটা কেরায়া নৌকা বীতপালকে নিয়ে নদীতে পাল তোলে। অনকূল বাতাসে সাঁইসাঁই করে এগিয়ে চলে ওরা সোমপুরের পথে। কত যে নদী ও জলাশয় পেরোতে হচ্ছে তার কোনো হিসেব নেই। কোনো কোনো নদীর তীর এত সুন্দর যে চোখ জুড়িয়ে যায়। সবুজের যে এত ভিন্নতা, এসব নদীকূলগুলো না দেখলে বোঝার উপায় নেই। সবুজে সবুজ কারুকার্য দেখতে দেখতে এক অন্য জগত তৈরি হয় মনের ভেতর। নদীর বুকে অসংখ্য পালতোলা নৌকাও এক অপরূপ আল্পনা সৃষ্টি করে। বীতপালের মনে যেন এবার অন্য কোনো রঙের ছোঁয়া লেগেছে। বিয়ে করার বিষয়টি এর আগে কখনো মনে জাগেনি। এবার যখন বাবামা ওর মনে এটা উঠিয়েছে তখন সকল সুর ও ছন্দ নিয়ে মনের ভেতর বেজে চলেছে ওটা। সুখের এক ঝাঁক বলাকা যেন ওর মনের খোলা আকাশে পাখা মেলেছে। অসীম শূন্যতায় ভেসে কোন দূর দেশে পাড়ি জমাবে ওরা তা নিজেও জানে না বীতপাল।

গুরুকন্যা বসুধার সঙ্গে গত বছর থেকে এতটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছে ওর যে এখন মনে হয় ওকেই বিয়ে করা যায়। বাবামা যখন ওর বিয়ের কথা ওঠায় তখন অন্য আর কারো বিষয় মনে জাগেনি। সঙ্গে সঙ্গে বসুধার কোমল মুখের সরল ছবিটা ভেসে উঠেছিল মনের পর্দায়। হ্যাঁ, বিয়ে করা যায় ওকে। মনে মনে স্থির করে, সোমপুরে ফিরে প্রথম সুযোগেই কথাটি ওঠাবে বসুধার কাছে। বীতপালের বিশ্বাস বসুধা ওকে ফেরাবে না। এখন মনে হয়, বসুধার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা গড়ে উঠেছে ভালোবাসার বন্ধনে। নিজেকে জিজ্ঞেস করে বীতপাল, সে ভালোবাসে কিনা বসুধাকে। ভেতর থেকে জবাব পায় সে 'বাসি, বাসি, অনেক ভালোবাসি ওকে আমি।' এবার শুধু বসুধার কাছ থেকে জবাব নেয়ার পালা।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে নৌকাটা। নদী প্রশস্ত হওয়ায় অনেকটা সোজাসুজি এগিয়ে যেতে পারছে ওরা সোমপুরের দিকে। অথচ বীতপালের মনে হয় অনেক ধীরে এগোচ্ছে ওরা। সারেংকে জিজ্ঞেস করে 'নৌকায় দাঁড় টানা যায় না?'

অবাক হয় সারেং।

'বলেন কী বাবু, পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মতো উড়ে চলেছে নৌকাটা!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও আচ্ছা।'

সারেং জিজ্ঞেস করে–

'কোনো তাড়া আছে বাবু?'

কি জবাব দেবে ওকে? এমন এক অজানা তাড়া এসে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে যার কোনো ব্যাখ্যা এখনও তৈরি হয়নি ওর ভেতর। মনের এ অবস্থাটা অভূতপূর্ব। জীবনের অন্য এক রূপ ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এটাই কী তবে প্রেম? মানবমানবীর এক অমোঘ আকর্ষণ!

এত বছর একসঙ্গে রয়েছে বসুধাদের ওখানে, এমন আকুলতা জন্ম নেয়নি তো কখনো, মনে হয়নি এক্ষুণি, এই মুহূর্তে ছুটে যেয়ে দাঁড়ায় ওর সামনে। চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। স্পর্শ করে ওর শরীর। আলিঙ্গন করে ওকে।

অচেনা, একেবারে নতুন এক তীব্র কামনা জন্ম নেয় ওর ভেতর। ঘুমোতে পারে না সারারাত। মুহূর্তের জন্য ওর মনোজগত থেকে সরাতে পারে না বসুধার কমনীয় লাবণ্য-ভরা রূপটাকে। এ যেন অন্য বসুধা। শরীরে অন্য এক আলো জ্বেলে বসে আছে আলোপিপাসী পতঙ্গের জন্য।

নৌকাটা ঘাটে ভিড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নামে বীতপাল। সামনের পথটুকু প্রায় দৌড়ে পেরিয়ে আসে। ঘরের আঙ্গিনায় ঢুকে দেখে সামনেই বসুধা। চোখ তুলে তাকায় সে। সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায় ওর ভেতরের প্রণয়াকুল ঐ ঝড়।

সেইতো পুরোনো বসুধা!

একেবারে হাতের নাগালে। ইচ্ছে করলেই ছোঁয়া যায়। কীসের আকর্ষণে প্রচণ্ড ঝড়ের মতো ছুটে এসেছে সে! ওর এই অবাক নতুন দৃষ্টি দেখে বসুধাও যেন একটু ভাবনায় পড়ে। জিজ্ঞেস করে–

'ভালো আছ বীতপা?'

মাটি ও জলের বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসে বীতপাল। জবাব দেয়–

'হ্যাঁ, ভালো বসুধা। তোমরা কেমন?'

'সবই ভালো। এবার যেন একটু বেশি দিন কাটালে বাড়িতে?'

'হ্যাঁ বসুধা।'

'যাও, ঘরে যেয়ে বিশ্রাম নাও। বাবা বাড়ি নেই। এলে বলব যে তুমি এসেছ।'

'ঠিক আছে।'

ঘরে ঢুকে একটু বিশ্রাম নেয় বীতপাল। স্নান করে এসে জলখাবার খায়। নিজের মনেই ভাবে বীতপাল, কী হয়েছিল ওর? ক'টা দিনের জন্য মনে হয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিল। বসুধার কাছে এসে আবার পুরোনো রূপ ফিরে পেয়েছে। কাজের মধ্যে ডুবে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলে বীতপাল। কিন্তু যে আগুন জ্বলে উঠেছে ওর বুকের ভেতর তার আঁচ অনুভব করে খুব গভীরভাবে। সিদ্ধান্ত নেয়, প্রথম সুযোগেই আহ্বান জানাবে সে বসুধাকে। বেশ কিছুদিন কেটে যায় এই আচ্ছন্নতার ভেতর।

কষ্টিপাথরের একটা প্রতিমার কাজে মগ্ন হয়েছিল বীতপাল। কখন বসুধা এসে পাশে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করেনি। ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখে চমকে উঠে বীতপাল। বসুধার চোখে অন্য এক রঙের অনন্য বিন্যাস! কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চোখে চোখে। তারপর বলে–

'বসুধা!'

স্বতস্ফূর্তভাবে জবাব দেয় বসুধা–

'বল।'

একটু প্রস্তুতি নেয় বীতপাল। তারপর সরাসরি বলে–

'তোমার পাণিপ্রার্থী আমি, বসুধা।'

চোখ নামিয়ে নেয় বসুধা। চুপ করে থাকে। বীতপাল বুঝে নেয় যে ওর সম্মতি রয়েছে। আবার জিজ্ঞেস করে–

'গুরুদেবের কাছে কথা ওঠাব?'

লাজুক হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় বসুধা। ওই হাসির অর্থ এখন বোঝে বীতপাল। ওর অন্তরের চোখ খুলেছে এ ক'দিনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহারাজ ধর্মপাল রাজ্যশাসনকেন্দ্র হিসেবে সোমপুরকে প্রাধান্য দিতেন। যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ফাঁকে যে সময়টুকু পেতেন সোমপুর মহাবিহারের আচার্যদের সঙ্গে কাটাতে পছন্দ করতেন। জায়গাটির ভূপ্রকৃতিও মনোরম। কিন্তু দেবপালের কাছে মনে হয় এটার অবস্থান অনেক দূরবর্তী। পালরাজ্য এখন আর গৌড় পর্যন্ত সীমিত নেই। পশ্চিমের সিন্ধু অববাহিকা পেরিয়ে পার্বত্য দুর্গম পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এত বিশাল রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্র বরং যথাযথ।

রাজ্যাভিযানে ক্লান্ত হয়ে উঠে একটু নিরিবিলি কোথাও অবস্থান করার সুযোগ পাওয়া দেবপালের মনের বাসনা। মঞ্জীর নগরটিকে বেশ ভালো লাগে তাঁর। কিছু সময় এখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পশ্চিমের রাজ্যগুলো শিথিল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আপাতত। দক্ষিণ ও পশ্চিম, এ দুটো দিক একসঙ্গে সামলানো একটু সমস্যাসঙ্কুল। মহামন্ত্রী দর্ভপাণিকে সঙ্গে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে দু'জন রাজার সঙ্গে সব সময় যুদ্ধ না করে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে একজনের ক্ষমতা স্থায়ীভাবে খর্ব করা সম্ভব হলে প্রতিপক্ষ থাকবে একটা। ওটা সামলানোর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি থাকবে তখন। এ পৃথিবীতে কোনো রাজ্য শত্রুহীন অবস্থায় নেই। শত্রুর সংখ্যা কমিয়ে রাখা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ দক্ষিণের রাজাদের বিপক্ষে নেয়া যায়। পালরাজ্যের দক্ষিণ দিকটা বিন্ধ্যপর্বত দিয়ে সুরক্ষিত। পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ শুরু না করে যদি দক্ষিণ ভারতের পুব দিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে ওদেরকে পশ্চিমে ঠেলে দেয়া সম্ভব। ভবিষ্যতের সংঘাতগুলো তখন শুধু পশ্চিমের কনৌজ ত্রিকোনে সীমাবদ্ধ থাকবে।

মহারাজের এ সিদ্ধান্তটার প্রশংসা করে সবাই। আগামী হেমন্ত মওসুম আসার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে উৎকল অভিমুখে। তাম্রলিপ্তি বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে দেবপালের সেনাপতিদের। ওখানের নৌঘাঁটির শক্তিবৃদ্ধি করা হয়েছে। সমরনায়ক জয়পালকে উৎকল অভিমুখে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। মহারাজ মঙ্গীর ও পাটলিপুত্র, এই দুই নগরীতে অবস্থান করবেন। দূতিয়ালীর মাধ্যমে যা জেনেছেন দেবপাল তাতে মনে হয় আগামী বছরগুলো যুদ্ধবিগ্রহের ভেতরই কাটাতে হবে।

প্রতিহাররাজ নাগভট্টের পৌত্র ভোজদেবের সঙ্গে সংঘর্ষটা মনে হয় অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কনৌজের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। প্রতিহাররাজের সঙ্গে এ মুহূর্তে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছে নেই দেবপালের। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষকে বরং কোনঠাসা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তিনি। উৎকল রাজ্যটা নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে ওটা সহজ হবে।

বঙ্গোপসাগরতীরের এই রাজ্যটির প্রকৃতি অনন্যরূপা। ভূমি খুব উর্বর। পার্বত্যাঞ্চল ও বিস্তীর্ণ সমভূমি, অঢেল বৃষ্টিপাত প্রভৃতির কারণে প্রচুর ফসল ফলে এখানে। জনসংখ্যাও অনেক ঘনসংবদ্ধ। হাজার বছর আগে মহাসম্রাট অশোক প্রাচীন এই কলিঙ্গ রাজ্যটিকে রক্তসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কথিত আছে যে প্রায় এক লক্ষ মানুষ হত্যা করেছিলেন। দেড় লক্ষ মানুষকে আহত করেছিলেন। প্রায় বারো লক্ষ মানুষ চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছিল। এখানের মানুষেরা ছিল প্রকৃত অর্থেই স্বাধীনচেতা। ঐ পরাজয়টা জাতিগতভাবে ওদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল।

জয়পালকে নির্দেশ দেন মহারাজ যেন যত কম সম্ভব রক্তক্ষয় করে যুদ্ধ পরিচালনা করে সে। প্রয়োজনে বীরত্ব প্রদর্শন করে ও ভয়ভীতি দেখিয়ে প্রতিপক্ষ সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে যুদ্ধটা যেন জয় করে নেয়। অতিরিক্ত, দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন দেবপাল। উৎকল রাজারও রয়েছে বিশাল হাতির বহর। ওদের অরণ্য জুড়ে রয়েছে অসংখ্য হাতি। কিন্তু ওদের অশ্বারোহী বাহিনী ততটা শক্তিশালী না। দেবপালের পরিকল্পনা, দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শত্রুসৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বিশাল সৈন্য সমাবেশ করে ওদের ভয় দেখিয়ে মনোবল ভেঙে দেয়ার কাজটি করা।

মহারাজের সকল পরামর্শ অনুসরণ করে যুদ্ধযাত্রা করে সেনাপাতি জয়পাল। উৎকলরাজের বিশাল পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য জয়পালের পদাতিক বাহিনীকে মহানদী পথে দণ্ডভুক্তি পাঠিয়ে দেয়। মগধ সীমান্ত দিয়ে বিশাল অশ্বারোহী বাহিনী পাঠায় সেনাপতি ধ্রুবজ্যোতির নেতৃত্বে। সবাই যখন কপিলাশ পর্বতের পাদদেশে পৌছায় তখন এক মহাযজ্ঞাবস্থা সেখানে।

যুদ্ধযাত্রার আগে সৈন্যদেরকে দুটো দিনের জন্য পূর্ণ বিশ্রাম নেয়ার অবকাশ দেয় সেনাপতি জয়পাল। দিনশেষে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠায় সব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাপতি ও উপসেনাপতিদের। প্রস্তুত করে যুদ্ধ পরিকল্পনা। তারপর মেতে উঠে সাধারণ আলাপচারিতায়। জয়পাল বলেন–

'পিলুপতি শরদিন্দু মহাশয়ের হাতিগুলোর খবর কী, যথেষ্ট উদরপূর্তি হয়েছে তো ওদের?'

'তা হয়েছে মহাসেনাপতি মহাশয়। মহারাজ তো দু'মাস আগেই এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের।'

'হ্যাঁ, আপনার হাতিগুলো যে-গতিতে এগোয় তাতে তো একসঙ্গে যাত্রা করা যায় না।'

পদাতিক বাহিনীর উপসেনাপতি ভাওয়ালদেব ফোড়ন কেটে বলে–

'গজগামিনী শব্দটা তো আর এমনিতে মানুষের মুখে উঠে আসেনি।'

হেসে ওঠে সবাই। পিলুপতি বলেন–

'তা মহাশয় বলতেই পারেন। তবে হাতির এই ধীরে চলাটাই শক্তি। ওর সামনে দাঁড়ানোর সাহস তো সাধারণ সৈন্যদের থাকে না।'

জয়পাল জিজ্ঞেস করেন–

'হাতির খোরাক কেমন আছে পিলুপতিজি?'

'যথেষ্ট আছে সেনাপতি মহাশয়। প্রায় মাসখানেক জঙ্গলে চরেফিরে খেয়েছে ওরা। কোনো অসুবিধে হয়নি। এখানের সবুজ বনাঞ্চল যথেষ্ট উর্বর। একদিক শেষ করে অন্যদিকে যেতে যেতে আগের দিকটা আবার গজিয়ে যায়।'

'বাহ্।'

'আজ্ঞে মহাশয়।'

ভাওয়ালদেব বলে–

'শুনেছি ওরা নাকি এরিমধ্যে স্থানীয় জঙ্গলের হাতিদের সঙ্গে জুটিও বেঁধে ফেলেছে। ফেরার পথে ওদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে তো?'

ওর কথায় জয়পাল সহ সবাই হেসে ওঠে। প্রশ্রয় পেয়ে সে আবার বলে–

'শুনেছি ওদের কেউ কেউ গর্ভও ধারণ করে নিয়েছে?'

পিলুপতি গোঁফ চুমরে বলে–

'তাতে তোমার কী হে? ওটা তো বরং ভালোই হলো। মহারাজের হাতির সংখ্যা বাড়বে।'

'ঐ খুশিতেই এসব বলছি পিলুপতিজি।'

এ রকম হাসি-উল্লাসে সময় কাটিয়ে দু'দিন পর দক্ষিণ দিকে যুদ্ধযাত্রা করে ওরা। মহানদীর উত্তর দিকে সৈন্য সমাবেশ করে জয়পাল। ওখানে আরও দু'দিন কাটানোর পরও প্রতিপক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। দূত খবর নিয়ে আসে যে মহানদীর ওপারে উৎকল রাজার কোনো প্রতিরোধ নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহানদীর অপ্রশস্ত অংশ দিয়ে ভেলা ও অন্যান্য বাহনে করে সৈন্যবহর পার করে আরও দক্ষিণে অগ্রসর হতে থাকে জয়পাল। নদীপথে শক্তিশালী নৌবহরও এগিয়ে যেতে থাকে বিনা বাধায়। একটু অবাক হয় জয়পাল। কোনো ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে কিনা ভেবে যাত্রা শ্লথ করে। গুপ্তচর পাঠাতে থাকে চারদিকে। উৎকল রাজ্যের দিক থেকে কোনো প্রতিরোধের খবর পাওয়া যায় না। বিষয়টা একটু ভাবনায় ফেলে জয়পালকে। রাজধানীতে থেকে এতদিন শুনে এসেছে উৎকলরাজ যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিপুল শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এর কোনো চিহ্ন দেখতে পায় না জয়পাল। আরও কিছুদিন বিনা যুদ্ধে কাটানোর পর উৎকলের রাজধানী দন্তপুর নগরীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে জয়পালের সৈন্যবাহিনী। তারপর কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই দন্তপুরে প্রবেশ করে সেনাপতি জয়পাল। উৎকলরাজ রাজধানী ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেছেন। এত সহজ বিজয় জয়পালের ভেতর এক অন্য রকম উত্তেজনা নিয়ে আসে। মহারাজের সৈন্যদলের বিপক্ষে দাঁড়ানোর মতো সাহস তাহলে প্রতিবেশী রাজারা হারিয়ে ফেলেছে!

দ্রুতগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী দূত পাঠিয়ে মহারাজ দেবপালকে এ সুসংবাদ পাঠান জয়পাল। এ সুসংবাদ যখন দেবপালের কাছে এসে পৌঁছে প্রতিহাররাজের সঙ্গে যুদ্ধ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন। প্রতিহাররাজকে এখনি দমন করা না গেলে কম্বোজ নিয়ে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে বিপুল শক্তিশালী হয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা সম্ভব হলে হতাহতের সংখ্যা কম রাখা সম্ভব হয়। স্বল্প যুদ্ধেই পরাজয় মেনে নেয় প্রতিপক্ষ। জয়পালকে দক্ষিণ দিক হতে সরিয়ে আনাও এখন ঠিক হবে না। আত্মগোপনে থাকা উৎকলরাজ আবার রাজধানীতে ফিরে এসে রাজ্যের দখল নিয়ে নেবে। পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধে না জড়িয়ে বরং দক্ষিণ দিকটা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারলে অনেকটা স্বস্তি পাওয়া যায়।

রাজ্যের হাতিবাহিনীকে দ্রুত যুদ্ধাবস্থার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেন দেবপাল। গণ্ডক নদীর পশ্চিমতীরে প্রতিরক্ষামূলকভাবে বিশাল পদাতিক বাহিনী পাঠিয়ে দেন। রামাবতী নৌঘাঁটি থেকে দ্রুত শক্তিশালী নৌবহর মুদ্গগিরি নৌঘাঁটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করান দেবপাল। আক্রান্ত হলে যেন ওদের সমুচিত জবাব দেয়া যায় সে-বিষয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তিনি।

এরপর দন্তপুর পৌঁছালে মহারাজ দেবপালকে বিপুল সম্বর্ধনা দেয়া হয়। উৎকলবাসী দেবপালের আনুগত্য স্বীকার করে। রাজ্যের উন্নয়নে ও রাজ্য রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় আশ্বাস দেন তিনি।

যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছে জয়পালের বাহিনী। এদের এই যুদ্ধলিপ্সা অব্যাহত রাখার জন্য দেবপাল দন্তপুর অবস্থান করে জয়পালকে আরও দক্ষিণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্রের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। চোলরাজাদের পূর্ব দিকটা যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় তাহলে ওদের উত্তর ও পূর্ব, দু'দিক থেকে চেপে রাখা যায়। গোদাবরী নদীর অববাহিকা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সৈন্য পরিচালনা করার আদেশ দেন দেবপাল।

জয়পালের সৈন্যদল অন্ধ্র উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে পাণ্ড্যরাজ্যের সীমানা পর্যন্ত দখল করে নিতে সমর্থ হয়। রাজধানী থেকে এত দূরে সরে এসে এখনি পাণ্ড্যদেশের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত নেন রাজা দেবপাল। তাঁর বিজয় অভিযাত্রা দেখে বিচলিত হয়ে পড়ে চোলরাজা। বিপুল সৈন্য নিয়ে পাণ্ডরাজ্য দখল করে নেন তিনি। বিষয়টা মেনে নেন দেবপাল। অন্ধ্র উপকূল দেবপালের নিয়ন্ত্রণে থাকলে দক্ষিণের চোলরাজাদের সঙ্গে কুলিয়ে ওঠা সম্ভব। এর বেশি আপাতত কোনো ইচ্ছে নেই দেবপালের। রাজকীয় সেনাবহর নিয়ে পাণ্ড্যরাজার সীমানা পর্যন্ত একবার ঘুরে যান তিনি। বিজিত অঞ্চল করায়ত্ব করে দ্রুত পাটলিপুত্রে ফিরে আসেন। প্রায় মাসখানেক ব্যস্ত থাকেন প্রশাসনিক কাজে। তারপর ফিরে আসেন তাঁর মজ্ঞীর প্রাসাদে।

গণ্ডক নদীর তীরে দেবপালের বিশাল সৈন্য সমাবেশ ও তাঁর সকল যুদ্ধ-বিজয় অভিযানগুলোর সংবাদ সম্ভবত প্রতিহাররাজকে নিরত রেখেছে আপাতত কোনো যুদ্ধে নিয়োজিত হতে। বর্ষাকাল প্রায় এসে গেছে। মনে হয় না এ বছর আর কোনো যুদ্ধে জড়াতে হবে। মজ্ঞীর প্রাসাদে কিছুটা অবসর যাপনের সিদ্ধান্ত নেন দেবপাল। মহামন্ত্রী দর্ভপাণি মহাশয়কে এ সময়ে মজ্ঞীরে কাটানোর অনুরোধ জানান।

বৃষ্টিস্নাত এক বিকেলে দেবপালের প্রাসাদে মন্ত্রী ও সেনানায়কদের এক সভা ডাকেন দেবপাল। বিশাল সমাগম। অনেক সামন্তরাজাও ছুটে এসেছেন মহারাজের আমন্ত্রণে। মহাসেনাধ্যক্ষ লাউসেন সভার সম্মানিত অতিথি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে দেবপাল বলেন–

'আজকের এই সভাটি আমাদের মহাসেনাধ্যক্ষ লাউসেনের প্রতি সম্মান জানিয়ে শুরু করার ঘোষণা দিচ্ছি।'

সবাই নত মস্তকে প্রথমে মহারাজকে তারপর লাউসেনকে অভিভাদন জানিয়ে সভাকক্ষে আসন গ্রহণ করেন। মহাসেনাধ্যক্ষ লাউসেনও মহারাজ ও অভ্যাগত অতিথিদের প্রত্যাভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করেন। মহারাজ জিজ্ঞেস করেন–

'রহস্যটা কী সেনাপতি লাউসেন, প্রাগজ্যোতিষরাজ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলেন গেলবার, আর এবার উৎকলরাজ রাজ্য ছেড়ে অজ্ঞাতবাসে চলে গেলেন, পেছনের কারণটা কী?'

'এই অধমের কোনো কৃতিত্ব নেই এতে মহারাজ। কোনো যুদ্ধই করতে হয়নি আমাদের। বিনাযুদ্ধে জয়ী হওয়ার কৃতিত্ব সেনাপতির নয়। মহারাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তিমত্তার প্রতি প্রতিপক্ষের ভীতি এটা। মহারাজের 'নয় লক্ষ সৈন্য' ও হস্তি বাহিনীর তুলনা ভূ-ভারতে নেই। এর সামনে দাঁড়াতে পারে এমন রাজা কই মহারাজ?'

'বিষয়টা কী সঠিক মহামন্ত্রী দর্ভপাণি?'

'পুরোপুরি সঠিক মহারাজ। এমনই রব রয়েছে পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে।'

'রব রয়েছে। রব ও প্রকৃতাবস্থা তো একই বিষয় না মহামন্ত্রী!'

'তা না মহারাজ। তবে রবেরও গুরুত্ব রয়েছে। এটা সপক্ষের মনোবল তৈরিতে বা বিপক্ষের মনোবল ভেঙে দিতে কাজ করে।'

'যাহোক, লাউসেনকে আমাদের অভিনন্দন। রাজ্যের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব তাঁকে প্রদান করা হলো। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত পালরাজ্যের অধীনে যত ভূখণ্ড আছে, সেসবের সকল সৈন্যবহর ও সেনাপতিগণ তাঁর অধীনে ন্যস্ত করা হলো।'

আসন হতে উঠে মহারাজের পদপ্রান্তে এসে তাঁকে প্রণাম জানান সেনাপতি লাউসেন। সমবেত করতালিতে মুখর হয়ে ওঠে রাজসভা। মহাসেনাপতির সম্মানে পানভোজনপর্ব শুরু হয়। এ পর্বের পর শুরু হয় বিবিধ আলোচনা পর্ব। সামন্ত ও মহাসামন্তদের সাফল্য ও কৃতিত্ব, অভাব অভিযোগ, সব শোনেন মহারাজ। দর্ভপাণি মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু কিছু বিষয়ে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত জানান। রাজ্যের প্রজাগণের সুখশান্তির খোঁজখবর নেন। দানদক্ষিণার বিষয়ে উদারহস্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। সমরমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন–

'মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কী হিসেব আছে যে দু'দুটো যুদ্ধ থেকে বাঁচিয়ে দিয়ে রাজকোষাগারের কত অর্থ সাশ্রয় করেছেন লাউসেন মহাশয়?'

'আজ্ঞে মহারাজ। দুটো যুদ্ধের ব্যয় সাশ্রয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিজিত রাজ্যগুলো হতে পাওয়া কর ও উপঢৌকন। সব মিলিয়ে ওরকম চারটে যুদ্ধ পরিচালনা করার মতো উদ্বৃত্ত জমেছে।'

'তাহলে অন্তত একটা যুদ্ধের খরচ প্রজাসাধারণের জন্য বিলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করুন মন্ত্রী মহোদয়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'এ অর্থ শুধু বিজিত রাজ্যের জনগণের কল্যাণেই ব্যয় করা হয় যেন। প্রাগজ্যোতিষ, উৎকল ও অঙ্গ উপকূলে এসব অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা নিন।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'দর্ভপাণি মহাশয় কী জানেন ব্রহ্মপুত্র নদী তীরবর্তী কিছু মানুষ প্রতি বছর দুর্ভিক্ষে পড়ে?'

'শুনেছি মহারাজ।'

'ব্রহ্মপুত্রের কোন দিকটা, জানেন মন্ত্রী মহাশয়?'

'পশ্চিম দিকটা।'

'তাহলে ওখানে বেশি অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা নিন। দুর্ভিক্ষের কারণটা দূর করা যায় কিনা আশা করি দেখবেন মহামন্ত্রী।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'উৎকলের কিছু অঞ্চল রয়েছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত। শুনেছি ওখানে বন্যায় অনেক ক্ষতি হয়।'

'তাই শুনেছি মহারাজ।'

'ওখানের নদীগুলোর তীর উঁচু করে বাঁধ দেয়ার ও প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিন মন্ত্রী মহাশয়। তাহলে দুটো কাজ হবে, মানুষের উপার্জনের একটা সুযোগ সৃষ্টি হবে, আর আমাদের সৈন্য চলাচলে সুবিধে হবে। পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত যতটুকু আমাদের করতলগত হয়েছে তা যেন সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তার জন্য রাজকোষ হতে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা নেবেন।'

'মহারাজের নির্দেশ প্রতি অক্ষরে পালিত হবে।'

'প্রজাগণের সুখশান্তি প্রতিষ্ঠা যেন রাজ্যের মূলমন্ত্র হয়। ঠাকুর্দা গোপালদেবের রাজ্যাভিষেক করিয়েছিলেন জনগণের নির্বাচিত রাজপ্রতিনিধিগণ। পিতাজি ধর্মপালদেব জীবনের অন্তিমদিন পর্যন্ত এটা ভোলেননি। আমার কাছেও প্রজাদের মঙ্গলই হল জীবনের সব চেয়ে বড় ব্রত।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

মহারাজের সভা প্রায় শেষদিকে এলে সেনাপতি লাউসেন একটা প্রস্তাব উঠান।

'মহারাজের অনুমতি পেলে আগামী বছর পাণ্ড্যরাজ্যটা মহারাজের পদতলে এনে দেয়ার চেষ্টা করা যায়।'

একটু ভাবেন দেবপাল। পাণ্ড্যরাজ্যটি ভারতবর্ষের সর্বদক্ষিণে। চোলরাজা এখন এটা দখল করে নিলেও পাণ্ড্যরা যথেষ্ট শক্তিশালী। তাছাড়া সমুদ্রের খাড়ি পেরোলেই সিংহল দ্বীপ। চোলরাজাদের কর্তৃত্ব এক সময় প্রসারিত হয়েছিল ঐ দ্বীপ পর্যন্ত। পাণ্ড্যরাজা ও সিংহলী রাজার সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। সব সময়ের জন্য ওটা দখলে রাখার জন্য অসংখ্য সৈন্যসামন্ত নিয়োজিত রাখতে হবে ওখানে। এদিকে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিহাররাজাদের সঙ্গে আগামী বছরের যুদ্ধটা মনে হয় অনিবার্য। এমন অবস্থায় দুটো দিক সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে। উৎকল ও অন্ধ্র উপকূল নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাষ্ট্রকূটরাজাদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবে নিশ্চিত। প্রস্তাবটা এড়িয়ে যান মহারাজ। বলেন–

'নিঃসন্দেহে একটা কার্যকর অভিযান হবে ওটা। কিন্তু আগামী বছরটা তার জন্য সঠিক নাও হতে পারে। আমার মনে হয় আপাতত স্থগিত রাখা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়টা। তার চেয়ে বরং বিজিত অঞ্চলগুলো সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করান সেনাপাতি মহাশয়। আমার ধারণা শরতের শুরুতে লাউসেন মহাশয় যদি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে প্রাগজ্যোতিষের পার্বত্য অঞ্চলে যেয়ে কিছুদিন অবস্থান করে আবার নিচে নেমে আসেন তাহলে দক্ষিণের পাণ্ড্যরাজ্য পর্যন্ত এসে পৌছাতে বর্ষা এসে যাবে। পরের বছর আবার উত্তর অভিমুখে যাত্রা করলে আরও এক বছর পেরিয়ে যাবে। এ দুটো বছর না হয় পূর্বাঞ্চলটায় মহড়া দিয়ে কাটান লাউসেন মহাশয়।'

দেবপালের সুরসিক ভঙ্গিতে বিষয়টা হাল্কা করে দেয়ায় লাউসেন সহ মন্ত্রিসভার সবাই হৃষ্টচিত্তে মেনে নেন ওটা। লাউসেন বলেন–

'মহারাজের প্রজ্ঞা অপরিসীম। নিশ্চয় এটা করব আমি, প্রভু।'

বিজিত রাজ্যগুলো হতে পাওয়া মূল্যবান উপঢৌকনসমূহ রাজদরবারে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দেন দেবপাল। এসব মণিমাণিক্য দেখে সভাসদদের চোখ জুড়িয়ে যায়। মহারাজ লাউসেনকে বলেন ওর পছন্দমতো যে কোনো রত্নরাজি বেছে নিতে। সভার সকলকে মণিমাণিক্য উপহার দেন মহারাজ। সবাই খুশি মনে রাজপ্রশস্তি গাইতে থাকে।

মহামন্ত্রী দর্ভপাণিকে অনুরোধ জানান দেবপাল সভার কার্যক্রমে সমাপ্তি টানতে। সভাশেষে সবাইকে রাজঅতিথি হিসেবে আহারাদি করে যেতে আমন্ত্রণ জানান।

মহারাজ দেবপাল যে একজন সফল ও শক্তিমান সেনাপতি ও যোদ্ধা ছিলেন, তাই না, তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও কূটকৌশল ছিল অসাধারণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পিতা ধর্মপালের কাছ থেকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন রাজনীতি। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে যখনই সুযোগ পেয়েছেন বৌদ্ধ আচার্যদের সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। ধর্মজ্ঞানে বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন এঁরা। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নাবিকেরা আসে এসব মহাবিহারে। এদের সংস্পর্শে এসে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যের আদান প্রদান করে অনেক কিছু জানা যায়। যখনই সুযোগ পেয়েছেন দেবপাল এই আচার্যদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। তাঁর প্রজ্ঞা তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। তাঁর সাফল্যের একটা সূত্র রয়েছে এখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫

সোমপুর এসে কাজে ডুবে যেতে হয় বীতপালকে। অনেক কাজ জমিয়ে রেখেছে ওর জন্য গুরুদেব। পাথর কাটার ঠুকঠুক শব্দ গত কিছুদিন কানে না আসায় এখন এটাকে বেশ প্রবল মনে হয়। পাথর সমান করে চৌকো ও মসৃণ করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। মনে হয় এ বছর বেশ ক'টা প্রতিমা গড়তে হবে। গুরুদেব বলেন–

'তোমার জন্য অপেক্ষায় ছিলাম বীতপাল। মহারাজ দূত পাঠিয়েছেন। এবারের বৌদ্ধপূর্ণিমায় অনেক ক'টা বিহারে নতুন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। কঠিন চীবরদান উৎসবের আগে ছোটো বড়ো অনেক ক'টা কাজ শেষ করতে হবে।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'অবলোকিতেশ্বরের একটা প্রতিমা সঙ্গে করে উৎকল নিয়ে যাবেন মহারাজ। প্রায় শেষ করে এনেছি ওটা। বাকি কাজটুকু তোমাকে করতে হবে বীতপাল।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'এখন থেকে ছোটো ছেনির কাজ করবে তুমি। সূক্ষ্ম কাজগুলো কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে হয় দেখিয়ে দেব তোমাকে।'

'পারব গুরুদেব?'

'কেন পারবে না? হাত প্রস্তুত না হলে তোমাকে ওটা করতে দেব নাকি আমি?'

'ঠিক আছে গুরুদেব।'

'এই যে ছেনিগুলো দেখছ, এর প্রতিটার জন্য ভিন্ন হাতুড়ি রয়েছে। ওগুলোর ব্যবহার দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

প্রায় মাসখানেক চলে ওর প্রশিক্ষণ কাজ। সূক্ষ্ম কাজের জন্য বিভিন্ন ছেনির ব্যবহার ভালোভাবে রপ্ত করে নেয় বীতপাল। বেশ বড় একটা ধূসর পাথরের গায়ে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে। লম্বালম্বি কাটা পাথরটা। নিচের দিক সরলরেখায় আর উপরটা গোলাকার। আয়তাকার গোল পাথরটার একটা দিক কাটা হয়নি।

দ্বাদশভুজা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ফুটিয়ে তুলবেন ওখানে গুরুদেব। পাথরের গায়ে ছেনি ঠুকে ঠুকে মূর্তিটার গড়ন ফুটিয়ে তোলেন প্রথমে। দু'পাশে অবলোকিতেশ্বরের দুই শিষ্যের মূর্তি আঁকেন। পায়ের নিচে ত্রিদল পদ্ম ও তার নিচে আড়াআড়িভাবে আঁকা অর্চনারত ভক্তের চারটি ছোটো ছোটো মূর্তি। এর যেখানে যেটুকু খোদাই করতে হবে প্রতিদিন একটু একটু করে শিখিয়ে দেন দেবজ্যোতি। মাস চারেকের দিবারাত্র পরিশ্রমের পর মূর্তিটা পরিপূর্ণ রূপ পায়। খুশি হয় ওর গুরুদেব দেবজ্যোতি। বীতপালের হাতে শিল্পগুণ রয়েছে। এভাবে কয়েক বছর চালিয়ে যেতে পারলে প্রতিমা নির্মাণের সম্পূর্ণ শিল্পকৌশল ওর আয়ত্তে এসে যাবে।

এবার এখানে আসার পর থেকে বসুধার বিষয়টা গুরুদেবের কাছে বলার সুযোগ খুঁজছে বীতপাল। কোনোভাবে হয়ে উঠছে না ওটা। কাজের ভেতর এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতে হয় যে কাজের বাইরে অন্য যে প্রসঙ্গ এসে উপস্থিত হয় তা হলো ধর্ম। কারণ প্রতিমা যা গড়া হয় তা সব দেবদেবীদের। স্বভাবতই ধর্ম এসে যায়, প্রসঙ্গক্রমে।

অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা নির্মাণ যেদিন সম্পূর্ণ হয় দেবজ্যোতি বলেন–

'জান বীতপাল, তোমাদের ধর্মে অবলোকিতেশ্বর আর সনাতন ধর্মের শিবের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।'

'তা কেমন করে হয় গুরুদেব, শিব তো ভিন্ন দেবতা।'

'হ্যাঁ, ভিন্ন দেবতা নিশ্চয়। কিন্তু পূজিত হয় একই রকমভাবে। শুধু তাই না, বৈদিক ধর্মে যেমন বিষ্ণু, বৌদ্ধ ধর্মে তেমনি বুদ্ধদেব।'

'তাই কী গুরুদেব?'

'হ্যাঁ বীতপাল, এমনকি তারাদেবী ও পার্বতীর মধ্যেও বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।'

'বৈদিক ধর্মের অনেক কিছু মায়ের মুখে শুনেছি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ কিছু জানি না গুরুদেব।'

'প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মে বৈদিক ধর্মের মূল বিষয়গুলো এমনভাবে মিশে গেছে যে ওগুলোকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না। গৌতমবুদ্ধকে মহাপ্রভু বিষ্ণুর সঙ্গে সমীকরণ করে হিন্দু পণ্ডিতেরা বৌদ্ধধর্মকে প্রায় বিলুপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ফেলেছে। এমনকি বুদ্ধকে ওরা বিষ্ণুর একজন অবতার হিসেবেও বর্ণনা করেছে। বৌদ্ধধর্মের শুরুতে তান্ত্রিকতা ছিল না। তিব্বতের সংস্পর্শে এসে এবং তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মেও তান্ত্রিকতা অনুপ্রবেশ করেছে। তান্ত্রিক হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে তেমন কোনো প্রভেদ নেই। তারাদেবী বা পার্বতীদেবী উভয় ধর্মেই রয়েছে। এরকম একই নামে অসংখ্য দেবদেবীও দুটো ধর্মেই রয়েছে।'

'তাহলে ধর্ম দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায় গুরুদেব?'

'আচার ও আচরণে, পন্থায় ও পালনে।'

'বুঝিনি গুরুদেব।'

'বৌদ্ধধর্মের মহাযানী মতে প্রতিমাপুজো, মন্ত্রপাঠ, প্রার্থনা, জাঁকালো উৎসব, পালাপার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যা আদিতে ছিল না। এগুলো এসেছে বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে। আবার ভারতবর্ষের লৌকিক ধর্মাচারগুলোও বৈদিক ধর্ম সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছিল। ঐসব লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কারগুলো মহাযানীদের ভেতর মিশে গেছে। সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের আবেগসঞ্জাত চাহিদাগুলো ধর্মের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। এভাবে বৌদ্ধধর্মটি বৈদিক ধর্মের এত কাছাকাছি চলে আসে যে অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।'

'বিষয়টা একটু জটিল হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য গুরুদেব।'

'হয়তো আর কোনোদিন এ নিয়ে কথা হবে না তোমার সঙ্গে, শেষ করে ফেলি। ধর্ম নিয়ে কথা বলা সব সময় হয়ে ওঠে না।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

'এমন কী হীনযানপন্থি বৌদ্ধদের পৌরাণিক কাহিনি যদি কখনো পড়, দেখবে বৈদিক দেবদেবীদের কাহিনি দিয়ে সব ভরে রয়েছে।'

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

অনেকক্ষণ একনাগাড়ে কথা বলার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে দেবজ্যোতি। তারপর বলে–

'দেখ দেখি বীতপাল, আমি হলাম পৈতেধারী ব্রাহ্মণ, আর তোমাকে শোনাচ্ছি বৌদ্ধধর্মের কথা।'

হঠাৎ যেন একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠে বীতপালের ভেতর। টুক করে বলে বসে–

'একটা প্রার্থনা ছিল গুরুদেব।'

ওর মুখের দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকায় দেবজ্যোতি। মাথা নিচু করে বীতপাল। সরাসরি বলে ফেলে–

'বসুধার পাণিপ্রার্থী আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতবাক হয়ে যায় দেবজ্যোতি। মুখে কথা সরে না। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি এমন কিছু। আর কিছু বলে না ওকে। চুপচাপ কাটে কিছু সময়। উঠে যাওয়ার সময় দেবজ্যোতি বলে–

'আমাকে ভেবে দেখতে দাও।'

কর্মশালা ছেড়ে ওর বেরিয়ে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে বীতপাল। তারপর হৃৎকম্প শুরু হয় ওর। কীভাবে যে ওটা বলে ফেলেছে সে নিজেও বুঝতে পারে না।

ঐদিন আর কিছু বলেন না দেবজ্যোতি। তার পরের দিনও না। স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যায় ওরা। ভেতরে ভেতরে বীতপালকে লক্ষ্য করে সে। যখন বুঝতে পারে যে প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সে তখন একদিন বলেন–

'বীতপাল, তুমি একদিন সরাসরি একটা প্রার্থনা জানিয়েছিলে আমার কাছে। তাৎক্ষণিকভাবে অবাক হয়েছিলাম। বিষয়টা নিয়ে পরে অনেক ভেবেছি। আমরা দু'জনেই শিল্পী গোত্রের। হয়তো ভিন্ন এক বিশ্বে বাস করি আমরা। কিন্তু কখনো কখনো আবেগ ও আবেদন আমাদের ভেতরও দেখা দেয়। এটাই স্বাভাবিক।'

চুপচাপ মন দিয়ে শোনে বীতপাল। বুক দুরু দুরু করে। দেবজ্যোতি বলেন–

'আমিও সরাসরি বলি তোমাকে, ওটা সম্ভব না।'

হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়ে ওর মাথায়। মাটির দিকে চেয়ে থাকে। কী বুঝেছে সে এতদিন গুরুদেবকে। কোথায় ওর শঙ্কা?

'বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করে বলা দরকার তোমাকে।'

সামলে নেয় নিজেকে বীতপাল। বলে–

'না গুরুদেব, কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।'

'আমি জানি ওটা মেনে নেবে তুমি, কিন্তু আমার প্রয়োজনেই বিষয়টা বলা দরকার তোমাকে।'

আর কিছু বলে না বীতপাল। দেবজ্যোতি বলেন–

'বসুধার সঙ্গে কথা বলেছি। সম্মতি জানিয়েছে সে। বুঝতে পেরেছি বিষয়টা আমি।'

প্রশ্ন নিয়ে চোখ তুলে তাকায় বীতপাল। তবে?

'বসুধার মায়ের সম্মতি নেই। ব্রাহ্মণ হলেও কোনো ধর্মাচারই পালন করি না আমি। সে তো তুমি দেখছই। কিন্তু ওর মা খাঁটি ব্রাহ্মণী। কোনোভাবেই কন্যাকে অন্য গোত্রে দেবেন না।'

'ঠিক আছে গুরুদেব। বুঝতে পেরেছি আমি।'

'আমার দোষ ধরো না বীতপাল। কন্যাটি তো ওরও। আমি তো রাজা নই যে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেব। সামান্য কারিগর মাত্র। একজন শিল্পী যেমন নিজের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তেমনি অন্যের স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আজ্ঞে গুরুদেব।'

এ নিয়ে আর কোনো কথা হয় না ওদের ভেতর। কাজের মধ্যে ডুবে থাকে বীতপাল। ওদের গড়া অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমাটি দেবপালের এত পছন্দ হয়েছে যে রাজকর্মচারী দিয়ে অনেক উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছেন দেবজ্যোতির জন্য। দূতের মাধ্যমে মহারাজের কাছে সে জানায় যে এটা নবীন শিল্পী বীতপালের গড়া। সঙ্গে সঙ্গে বীতপালকে মঞ্জীরে ডেকে পাঠান মহারাজ। কষ্টিপাথরের কিছু মূর্তি তৈরি করার নির্দেশ দেন। বড় অঙ্কের সম্মানী ও সোমপুরে নিজের কর্মশালা গড়ে তোলার জন্য কুড়ি একর সম্পত্তি দেয়ার জন্য স্থানীয় সামন্তকে নির্দেশ দিয়ে পাঠান। সোমপুরে এসে বীতপালও ডুবে যায় কাজের ভেতর। নিজের জন্য ভিন্ন কর্মশালা নির্মাণ করেও গুরুদেব দেবজ্যোতির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চালিয়ে যায়। পুত্রের মতো স্নেহ করেন ওকে গুরুদেব। তাঁকে ছেড়ে যেতে পারে না কোনোভাবে বীতপাল। এমনকি বসুধার জন্যও না।

বসুধার জন্য পাত্র দেখা শুরু করেছে দেবজ্যোতি। কিন্তু একে একে সব পাত্র ফিরিয়ে দেয় বসুধা। বিষয়টা বুঝতে পারে বীতপাল। সুযোগ পেয়ে একদিন ওকে জিজ্ঞেস করে–

'এমন করছ কেন বসুধা?'

ছোট্ট করে জবাব দেয় সে–

'আমার সম্মতি দেয়া আছে অন্য একজনকে।'

বীতপাল বুঝতে পারে যে ওকে বুঝিয়ে কোনো কাজ হবে না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আছে সে। বীতপালও সিদ্ধান্ত নেয় যে সেও বিয়ে করবে না। শিল্পকর্মে ডুবে সব ভুলে থাকবে। মনের সকল মাধুরী মিশিয়ে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে সে। সেসব দেখে মুগ্ধ হয়ে রাজশিল্পীর মর্যাদা দিয়ে নতুন নির্মাণশালা গড়ে দেয়ার প্রস্তাব দেন দেবপাল। বীতপাল জানায় যে যমুনেশ্বরী নদীর তীরে যে কুড়ি একর জমি দিয়েছেন ওকে মহারাজ সেখানে একটা বিহার প্রতিষ্ঠা করে দিলে ওটার অলঙ্করণ ও ওখানে প্রতিমা স্থাপনের কাজ করার অনুমতি দিলে কৃতার্থ হবে সে। সানন্দে সম্মতি জানান দেবপাল।

দীর্ঘ সময় ধরে লেগে থাকে বীতপাল ঐ বিহার নির্মাণের কাজের সঙ্গে। ধীমান এসে বারবার ফিরে যায় ওর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। কোনোকিছুতেই সাড়া দেয় না বীতপাল। কাজ ছাড়া এখন অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই ওর জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬

প্রতিটা যুদ্ধযাত্রার আগে ঘটা করে মাতৃ-প্রণাম সেরে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন দেবপাল। রাষ্ট্রকূট রাজকন্যা রন্নাদেবীকে এবার খুব বেশি বয়োবৃদ্ধা মনে হয় দেবপালের। ওর চোখের দিকে চেয়ে দেখে ওদুটো ছলোছলো। দৃঢ়চেতা এই নারীর ভেতরটা যেন কোমল হয়ে উঠেছে এখন। পিতাজি গত হওয়ার পর রাজনীতি নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে যত পরামর্শ তার সবই দেবপাল করেছে রন্নাদেবীর সঙ্গে। পিতাজি ধর্মপালদেবকেও দেখেছে ওর সঙ্গে পরামর্শ করতে। স্থিতধী এই নারী পর্দার অন্তরালে থেকে অনেক সুপরামর্শ দিয়ে গেছেন পালরাজাদের। রাষ্ট্রকূটরাজারা বংশ পরম্পরা রাজত্ব করে আসছে ভারতবর্ষে। সে তুলনায় পালরাজ্য মাত্র তিন পুরুষে এসে দাঁড়িয়েছে। অভিজ্ঞতার দিক থেকে রাষ্ট্রকূটরাজারা অনেকটা এগিয়ে। মায়ের সঙ্গে আলোচনা করে এর সুস্পষ্ট পরিচয় অনেকবার পেয়েছে দেবপাল।

দক্ষিণের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে অনেক সময় বিব্রত হয়েছে দেবপাল মায়ের দিকটা ভেবে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্য দুটো দিকের মতো দক্ষিণের অংশটায়ও অনেক রাজা। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এসব রাজারা পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে এসেছে। শুধু যে 'কারণে' এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাই না, অকারণে বা তুচ্ছ কোনো কারণেও যুদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তি বা পরিবারের কলহের সূত্র ধরে, নদীর জল নিয়ে, নারী নিয়ে, এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আম্রপালীর জন্য প্রাচীন নগরী বৈশালী ভস্মীভূত হয়েছিল। কথিত ন্যায়যুদ্ধের নাম ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছে। এমন শত শত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এখনও হচ্ছে। এটা থেকে ভারতবর্ষের নিষ্কৃতি নেই। কঠোরভাবে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হলে হয়তো এসব অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ হতে নিরত থাকা যেতে পারে। কিন্তু এটা কেবল সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাসম্রাট অশোকের মতো শক্তিশালী ও নিষ্ঠুর কোনো লৌহকঠিন মানবের নেতৃত্বে। এত নিষ্ঠুরতা মানুষকে মানায় না। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা দিয়ে অন্য সব নিষ্ঠুরতা দমন প্রকৃতপক্ষে এটার অর্থ ও কার্যকারণ হারিয়ে ফেলে।

দেবপালের এ যুদ্ধযাত্রাটা রাষ্ট্রকূটদের বিপক্ষে। এ কারণেও মায়ের চোখ ছলছল করে উঠতে পারে। অথবা বয়সের কারণেও হতে পারে। রাজাবেগ দমন করাও রাজধর্ম। মায়ের কাছ থেকে সরে আসেন দেবপাল।

যে যুদ্ধপরিকল্পনা এবার করেছেন দেবপাল তাতে সফল হলে আশা করা যায় আগামী বছরগুলোয় অনেকটা নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করা সম্ভব হবে। দাক্ষিণাত্যের রাজাদের পূর্ব দিকের সমুদ্রবন্দরগুলো হতে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাবে ওরা। সমুদ্রের পূর্ব উপকূলের এই বন্দরগুলো পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্র উপকূল বেয়ে পণ্য আনা নেয়া করে যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছে। সমুদ্রতীরবর্তী রাজাদের আয়ের একটা বড় অংশ আসে এই বন্দরগুলো হতে। আশা করা যায় এখন এসব রাজ্যের কর আসবে পালরাজাদের কোষাগারে। সেনাপতি লাউসেন ভালোভাবেই এই রাজ্যগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে। কোনো রাজ্য দখল করার পর স্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় সৈন্যদল ওখানে রাখার প্রয়োজন সব সময় পড়ে না। বশ্যতা স্বীকার করে রাজারা নিয়মিত কর দিয়ে গেলেই হয়। কর আদায়ের কাজটি পালরাজাদের কেন্দ্রীয় সাস্থাধিকর্তা, শলকাকা, তরিকা, দশারাধিকা প্রভৃতি কর্মকর্তাগণ খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করছে। এখন পশ্চিমের সুরাষ্ট্র রাজ্যটিকে যদি পালরাজ্যের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে দুদিক থেকে লাভবান হওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের রাজাদের উত্তর অভিমুখী অভিযান থামিয়ে রাখা যায়। পূর্ব ও উত্তর, দু'দিক থেকে যদি ওদের চেপে রাখা যায় তাহলে ওদের রাজ্য জয়ের অভিলাষ অবদমিত হয়ে থাকবে। শুধু তাই না, এখন যেমন ওদের দুটো শত্রু নিয়ে ভাবতে হয়, তখন তা আর করতে হবে না। পশ্চিমের শক্তিটি পালদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে এরা নিজেদের ঘরে সীমিত শক্তি নিয়ে শান্তিতে থাকার বিষয়টি ভেবে দেখতে পারে। এটা পশ্চিম দিকের শক্তিকেন্দ্রটির বিষয়েও একইরকমভাবে প্রযোজ্য। দক্ষিণের আক্রমণ নিয়ে আর ভাবতে হবে না ওদের। শুধু পুবের দিকটা সামলালেই হবে। এই সমীকরণে এবার যুদ্ধের ছক সাজিয়েছেন মহারাজ দেবপাল। দক্ষিণ ও পশ্চিম, উভয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষে যতটা সম্ভব যুদ্ধ কমিয়ে আনা। অকারণ রক্তক্ষয় রোধ করা।

যে নিষ্ঠুরতা দিয়ে সম্রাট অশোক ভারতবর্ষকে একত্রিত করেছিলেন তার বিপরীতে এই গৌরাধিপতি বঙ্গাল কৌশল প্রয়োগ করে কাজটা সম্পন্ন করতে চান। কারণ তিনি প্রজাগণের প্রতিনিধি। একবারের জন্যও ভুলে যান না যে তাঁর প্রপিতা গোপালদেবকে রাজাসনে বসিয়েছিলেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চূড়ান্তভাবে যুদ্ধযাত্রার আগে পশ্চিমাঞ্চলের মহাসমরনায়ক জয়পালের সঙ্গে যুদ্ধের মহড়াটা দেখতে চান মহারাজ দেবপাল। প্রথমে দেখেন জয়পালের ঘোড়সওয়ার বাহিনী। কনৌজ হতে সংগ্রহ করা বিশালাকার ঘোড়াগুলোর সজ্জিত রূপ দেখে অভিভূত হন দেবপাল। সমতল যুদ্ধক্ষেত্রে এসব ঘোড়ার গতি নাকি বিদ্যুতকেও হার মানায়। তারপর একে একে পশ্চিমদেশীয় পার্বত্য ঘোড়া ও দক্ষিণদেশীয় কালো রঙের ঘোড়ায় সজ্জিত বাহিনীগুলো পরিদর্শন করেন। এসব ঘোড়াগুলো দু'পায়ের উপর দাঁড়িয়ে অশ্বারোহী যোদ্ধাকে কিছু সময়ের জন্য এমন একটা অবস্থানে ধরে রাখে যে মুহূর্তের ভেতর পদাতিক সৈন্যদের ধরাশায়ী করে ফেলতে সমর্থ হয় ওরা। অশ্বারোহী যোদ্ধাদের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করে দুটো দিন অতিবাহিত করেন মহারাজ।

এরপর দেবপাল পরিদর্শনে আসেন জয়পালের অধীন উটবাহিনীর সেনাপতি জয়ভুবনের যুদ্ধমহড়ায়। আরাবল্লি, উজ্জয়নী প্রভৃতি মরুময় অঞ্চলের যুদ্ধে উটবাহিনীর এক বিশাল ভূমিকা রয়েছে। শুষ্ক ও মরুময় অঞ্চলে যুদ্ধ করতে হলে প্রতিপক্ষ দলের উটবাহিনীর সঙ্গে সংঘাত হয়। উটবাহিনীর মহড়া দেখে মনে মনে অনেকটা কৌতুক অনুভব করেন দেবপাল।

এরপর তীরন্দাজ বাহিনী, বর্শাবাহিনী, পদাতিক বাহিনী প্রভৃতির মহড়া দেখেন সপ্তাহ জুড়ে। এদের প্রস্তুতি দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধযাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করার সিদ্ধান্ত নেন। তার আগে একবার রাজকীয় অস্ত্রাগার পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত নেন দেবপাল। সঙ্গে রয়েছে রসায়নবিদ্যাবিশারদ সচ্চিদানন্দ মহাশয়।

অস্ত্রনির্মাণশালায় যাওয়ার পথে ছোট্ট একটা নদী পেরোতে হয় মহারাজের। ঐ নদীতীরে গড়ে উঠেছে সারি সারি কামারশালা। অনেক দূর থেকে লোহা পেটানোর ঠক ঠক শব্দ কানে ভেসে আসে। বিশাল অস্ত্রাগারে ঢুকে সচ্চিদানন্দকে বলেন মহারাজ–

'সচ্চিদানন্দ মহাশয়, এবার দেখান তো আপনার ধাতুবিদ্যার অগ্রগতি।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

দু'জন সৈনিককে সে ইঙ্গিত করে একই রকম দেখতে দুটো তরবারি নিয়ে এগিয়ে আসতে। বর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরিহিত সৈন্য দু'জন পরস্পরের দিকে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে একে অপরের তরবারিতে আঘাত করে। একটা তরবারি দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভেঙে পড়ে। দেবপাল জিজ্ঞেস করেন–

'কীভাবে পার্থক্যটা বোঝেন সচ্চিদানন্দ মহাশয়?'

'তরবারিগুলোর আঘাত সওয়ার ক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখি। ধাতুর মিশ্রণটা নির্মাণ করি সেভাবে। যে তরবারিটা ভেঙে গেছে যুদ্ধে ওটা ব্যবহৃত হতো দশ বছর আগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার ঐ নতুন তরবারিটা থেকে বেশি শক্তিশালী তরবারি যে প্রতিপক্ষ নির্মাণ করছে না তা বুঝবেন কীভাবে?'

'তাও বোঝার চেষ্টা করি মহারাজ। আমাদের চরেরা নিয়মিতভাবে ওদের সৈন্যদের কাছ থেকে বেশি মূল্য দিয়ে নতুন নতুন তরবারি কিনে আনছে। ওগুলোর সঙ্গে পরীক্ষা করে দেখি আমাদেরগুলো।'

'আমাদের চেয়ে বেশি শক্তিসম্পন্ন অস্ত্র পেয়েছেন?'

'দু'একটা যে পাইনি তা নয় মহারাজ। তারপর আমরা চেষ্টা করেছি তার থেকেও বেশি শক্তিশালী অস্ত্র নির্মাণ করতে।'

'সফল হয়েছেন?'

'ওটাই তো আমাদের কাজ মহারাজ।'

'কীভাবে করেন ওটা?'

'ধাতুরসায়নবিদ্যাবিশারদের কাজই ওটা। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি মহারাজ। মাটি দিয়ে কোনো কিছু নির্মাণ করে পোড়ানোর আগে মাটির মিশ্রণটা সঠিকভাবে প্রস্তুত করতে হয়। না হয় ওটা ফেটে যায় বা বিকৃত হয়ে যায়। ধাতুর বেলায়ও তাই। ধাতুর মিশ্রণটা হতে হয় সঠিক। না হয় ওটা ভঙ্গুর হয়ে যায়, নয়তো নরম।'

'আচ্ছা।'

'মূল ধাতুগুলোকেও বারবার পুড়িয়ে বিশুদ্ধ করতে হয়। তারপর আনুপাতিক মিশ্রণের কাজটা করতে হয় খুব যত্ন নিয়ে।'

'আকর ধাতুর সরবরাহ যথেষ্ট আছে তো আমাদের?'

'তা আছে মহারাজ। তা ছাড়া ধাতুগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার করি আমরা।'

'যেমন?'

'তরবারি প্রস্তুত করি শ্রেষ্ঠ ধাতুর মিশ্রণে থেকে। বর্শায় ব্যবহৃত লোহার ততটা শক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। পুরোনো অস্ত্র পিটিয়ে ওটা তৈরি করে নেই। একেবারে শেষ দিকে ধাতুর যেসব ছোটো ছোটো টুকরো ও গুঁড়ো থাকে সেগুলো ফেলে না দিয়ে ঘোড়ার নাল, লাগামের শেকল প্রভৃতি বানাই।'

অস্ত্রাগার পরিদর্শন শেষে খুশি মনে প্রাসাদে ফিরে আসেন দেবপাল। পরদিন রাজকীয় তীরন্দাজ বাহিনী পরিদর্শনে যান দেবপাল। এই তীরন্দাজ বাহিনীর গুরুত্ব তাঁর কাছে অপরিসীম। যুদ্ধের শুরুতে তীরন্দাজ বাহিনীর সাফল্য যুদ্ধজয়ে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার আগে মুখোমুখি হয় অশ্বারোহী বাহিনী। কিন্তু যুদ্ধটা শুরু করে তীরন্দাজ বাহিনী। অশ্বারোহী বাহিনী ছুটে আসার আগে যত বেশি তীর ছুঁড়ে প্রতিপক্ষের অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য নির্মূল করা যায় সম্মুখ যুদ্ধটা জয়ের সম্ভাবনা তত বেড়ে যায়। এজন্য অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে তীরন্দাজের সংখ্যা অনেক বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখেন দেবপাল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর যদিও এদের ভূমিকা তেমন আর থাকে না। হতাহত পদাতিক বাহিনীর শূন্যস্থান পূরণ করে এরা। এদেরকে দক্ষভাবে গড়ে তোলার জন্য তীরন্দাজ সেনাপতি হিসেবে তীরভুক্তির এক সাঁওতাল প্রধানকে নিয়োগ দিয়েছেন মহারাজ দেবপাল। ধনুর্বিদ্যায় এদের পারদর্শিতা প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে স্বীকৃত। তীরন্দাজ বাহিনীর জন্য তীরধনুক সংগ্রহ করেন উত্তরবঙ্গ ও তীরভুক্তির সাঁওতাল পরগনা থেকে। এদের তীর যেমন লক্ষ্যভেদী, তেমনি অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে সক্ষম। ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতির ভেতর এমন সক্ষমতা নেই। সাঁওতাল সেনাপতি রাজবংশীকে জিজ্ঞেস করেন–

'একটা তীর ছুঁড়ে দেখাবেন সেনাপতি রাজবংশী মহাশয়?'

'আজ্ঞে মহারাজ।' বলেই একটা তীর ছুঁড়ে দেয় নদীর উপরের আকাশের দিকে। সবাই তাকিয়ে থাকে ওটার দিকে। কিন্তু ওটা যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে! দেবপাল জিজ্ঞেস করেন–

'কোথায় গেল ওটা রাজামশায়?'

'এখনও যাচ্ছে ওটা, মহারাজ।'

'বলেন কী রাজবংশী! কদ্দূর যাবে ওটা?'

'যে-পর্যন্ত শত্রুর ঠিকানা খুঁজে না পায়, মহারাজ।'

সবার সঙ্গে হেসে উঠেন মহারাজ দেবপাল। মনে মনে ভাবেন ধনুর্বিদ্যায় একলব্যের পারদর্শিতার কথা। মহারাজের জন্য ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনের বিভিন্ন কৌশলের আয়োজন করেছে সেনাপতি রাজবংশী।

বিশাল মাঠের একদিক থেকে আকাশে তীর ছুঁড়ে দেয় একজন তীরন্দাজ। ওর প্রতিপক্ষ তীর ছুঁড়ে আকাশে থামিয়ে দেয় ওটা। মাথার উপর একটা নাসপাতি রেখে তীর ছুঁড়ে ওটা গেঁথে ফেলে আরেকজন। দু'আঙুলের ফাঁকে একটা লেবু রেখে ওটাকে বিদ্ধ করে। গাছের গায়ে একঝাঁক তীর ছুঁড়ে মুহূর্তের ভেতর একটা বৃত্ত আঁকে। বিভিন্নরকম ছবি ফুটিয়ে তোলে। মুগ্ধ হয়ে এসব দেখেন দেবপাল। এদের অসাধারণ পারদর্শিতায় বিস্মিত হন তিনি।

দীর্ঘ যুদ্ধযাত্রার সফল মহড়া দেখে সন্তুষ্ট হয়ে যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি নেন মহারাজ দেবপাল। কিন্তু যুদ্ধযাত্রার দিক পরিবর্তন করতে হয় তাঁকে। আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলের সুরাষ্ট্র রাজ্যটি জয় করে মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা হতে পশ্চিমের গুর্জার-প্রতিহার বংশের রাজা ভিন্নমলকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন দেবপাল। আপাতত ঐ পরিকল্পনাটা স্থগিত রাখতে হয়। গুর্জার-প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় তার আগেই। দীর্ঘ প্রায় চার মাস ধরে চলে ভয়াবহ যুদ্ধ। কিন্তু জয়-পরাজয় থেকে যায় অনিশ্চিত মৌসুমী বর্ষা এসে যাওয়ায় প্রাকৃতিক কারণে থেমে যেতে হয় উভয়পক্ষকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষাঋতুটা ইন্দ্রপ্রস্থে কাটিয়ে দেন দেবপাল। পরবর্তী যুদ্ধের জন্য অশ্বারোহী সৈন্যের শক্তি বাড়ানোর উদ্যোগ নেন। যুদ্ধে যে শক্তিক্ষয় হয়েছে তা পূরণের জন্য নির্দেশ দেন জয়পালকে। স্থানীয় সামন্তরাজাদের বশ্যতায় এনে এদের মধ্য থেকে বিশ্বস্ত ও পেশাদার সৈন্য সংগ্রহ করেন।

পরের বছর যুদ্ধক্ষেত্রে আর এগিয়ে আসেন না প্রতিহাররাজ। দেবপালও থাকেন অপেক্ষায়। অকারণে ওদের উপর একটা যুদ্ধ চাপিয়ে দিতে চান না তিনি। সিন্ধু অববাহিকার রাজারা দেবপালের আনুগত্য স্বীকার করে চলেছেন। এর চেয়ে বেশি দূর পশ্চিমে অগ্রসর হওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই দেবপালের।

বিজিত কোনো রাজাকে উচ্ছেদ করে রাজ্যগুলোয় নতুন রাজা বসানোর কোনো বাসনাও নেই দেবপালের। যদি না ঐ রাজা একজন প্রজাপীড়ক হয়। আনুগত্য স্বীকার করে পালরাজ্যে নিয়মিত কর পাঠালেই দেবপাল খুশি। পালরাজাদের বিজিত রাজ্যগুলো মেনে চলেছে এটা। কোথাও কোনো রাজা মাথাচাড়া দিয়ে পালরাজার আনুগত্য অস্বীকার করলে যুদ্ধাভিযানে সৈন্য পাঠাতে হয়। গুর্জার-প্রতিহারদের আনুগত্য দেবপাল প্রত্যাশা করেন না। নিজেদের ভূখণ্ডে ওরা সীমিত থাকলেই দেবপাল খুশি। ফলে প্রতিহারদের সঙ্গে যুদ্ধটা আর করতে হয় না এ বছর।

বড় কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ায় সৈন্যবাহিনীও যথেষ্ট বিশ্রাম পেয়েছে। স্থগিত যুদ্ধ-পরিকল্পনাটা বাস্তবায়নের জন্য আবার প্রস্তুতি নেন দেবপাল। দীর্ঘ সাত মাস যুদ্ধের পর আরব সাগরের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হন তিনি। স্থানীয় রাজাগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে। দাক্ষিণাত্যের রাজারাও এসব অভিযানের পর অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী বছরগুলো অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাট হয় দেবপালের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭

একেবারে অনাহুত একটা ঝড় এসে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলে বীতপালের আপাতশান্ত জীবন। আকস্মিক অসুস্থতায় দু'দিনের ব্যবধানে গুরুপত্নী ও গুরুদেব দেহত্যাগ করেন। এক মহাপ্লাবন এসে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বীতপালের সবকিছু। গুরুদেবের তিরোধানের সময় কেউ উপস্থিত না থাকায় বসুধাকে সঁপে দিয়ে যান তিনি ওর হাতে। ওকে অনুরোধ জানান যেন সুপাত্রে পাত্রস্থ করা হয় বসুধাকে। আশ্বস্ত করে ওকে বীতপাল।

দ্রুত খবর পাঠিয়ে ধীমানকে আনিয়ে নেয় বীতপাল। ধীমান এসে কিছুটা হাল ধরে। কিছুদিন পর ওর মাকেও আনিয়ে দেয় বীতপাল। কয়েকমাস ওখানে কাটায় ওরা।

বসুধা এবার নিজেই এগিয়ে আসে। কিন্তু বেঁকে বসে বীতপাল। গুরুদেবের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সে। ওটা ভঙ্গ করে কীভাবে।

'তোমার সমস্যাটা কী বীতপাল?'

'সমস্যাটা আমার নয়, সুতন্বী। তোমার পিতার সঙ্গে যে প্রতিজ্ঞা করেছি ওটা ভঙ্গ করি কী করে?'

'বাবার তো অমত ছিল না। ওটা ছিল মায়ের।'

'এবং ওটার কারণ কী ছিল?'

'কারণটা ধর্মের নিয়ন্ত্রণ। অন্য গোত্রে ব্রাহ্মণ কন্যার বিয়ে বারণ রয়েছে।'

'কিন্তু ওটা তো অনেকে অমান্য করছে।'

'মা চায়নি।'

'তাহলে তোমার মায়ের ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যাই কী করে?'

'তাহলে কী ধর্মের দোহাই দিয়ে আমাকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকছ তুমি?'

'না, তা না। ওটা ছিল তোমার মায়ের ইচ্ছে।'

'তুমি ওটা রক্ষা করছ তাহলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মনে হয় আমাকে ভুল বুঝছ। তাঁর ইচ্ছে আমি যেমন পালন করতে পারি না, তেমনি ভঙ্গ করতেও পারি না। তাঁর ইচ্ছে তাঁরই।'

'এই তোমার শেষ কথা?'

চুপ করে থাকে বীতপাল। স্বল্পভাষী বসুধা যে হঠাৎ এমন প্রগলভ হয়ে উঠতে পারে কল্পনাও করেনি সে। অনেকক্ষণ আর কোনো কথা হয় না ওদের ভেতর। তারপর বসুধা বলে–

'ঠিক আছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে সম্পর্কটা গড়ে নিতে পারছি না আমরা। ধর্ম ত্যাগ করছি আমি। তোমাদের বিহারে যেয়ে সেবাদাসী হব কাল থেকে।'

'তুমি তা পার না বসুধা। তোমার পিতাজি আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তোমাকে।'

'তুমি আমার পিতা নও।'

এতটা দৃঢ়তা দেখাতে পারে বসুধা কল্পনাও করেনি বীতপাল। পরদিনই যেয়ে ঐ বিহারে ঢোকে বসুধা। কীংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায় বীতপাল। সব কিছু ছেড়েছুড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে। এ কেমন বিপাকে জড়িয়ে পড়েছে সে জীবনের শুরুতে!

কর্মশালা বন্ধ করে দেয় কিছুদিনের জন্য। বিভিন্ন জায়গা থেকে এমনভাবে কাজের চাপ আসতে থাকে যে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না বীতপাল।

যমুনেশ্বরী নদীতীরের ঐ বিহারের সেবাদাসীর জীবনটাকে মনে হয় মানিয়ে নিয়েছে বসুধা। জীবনের অনেক ক'টা বছর কাটিয়ে দেয় ওখানে। বীতপালকেও আর বিয়ের জন্য রাজি করাতে পারে না ধীমান। বার্ধক্যে ওর শরীরও ভেঙে পড়েছে। বীতপালের এখানেও আর আসতে পারে না।

এক ধরনের নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করে চলে বীতপাল পাথরে ছেনি ঠুকে দিনের পর দিন পার করে দেয়। বিভিন্ন দেবদেবীর যে মূর্তি সে নির্মাণ করে তার সবই যেন বসুধার। ওর কল্পনার ছোঁয়া হাতের কারুকার্যে ফুটে ওঠে প্রতিমাগুলোর মধ্যে বাঙময় হয়ে থাকে অনেক বসুধা। ওসব প্রতিমা কত কত দূর রাজ্যে পাড়ি জমায় নিজেও জানে না বীতপাল। অথচ ঘরের কাছে, হাতের নাগালেই রয়েছে জীবন্ত বসুধা। তবুও যেন অন্য কোনো রাজ্যে। অন্য কোনো জগতে ওর অবস্থান!

বসুধাকে কিছুটা নমনীয় করে ওর জন্য আবার পাত্র দেখার অনুরোধ জানায় বাবামাকে। ওরাও পাত্র দেখা শুরু করে। কিন্তু বসুধার একগুঁয়ে মনোভাবের কোনো পরিবর্তন হয় না শেষ পর্যন্ত। বিয়ের ভাবনা একেবারে দূর করে দিয়েছে মাথা থেকে।

সবই মেনে নিতে হয় ওদের। ধীমান ও সুতন্বী ফিরে যায় ওদের গ্রামে। মনের কথাটা কাউকে বোঝাতে পারে না বীতপাল। নিজের জন্য না, বাবামায়ের জন্য খুব মন খারাপ হয়। শেষ বয়সে এসব মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে ওদের। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য বাবামায়ের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে আসে বীতপাল। মহারাজ দেবপাল দূত পাঠিয়ে রাজধানীতে ডেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয় কখনো কখনো। বিস্তৃত পালরাজ্য জুড়ে অসংখ্য বিহার ও মহাবিহার গড়ে তুলছেন দেবপাল। শত শত বিষ্ণু ও শিবমন্দির গড়ার জন্য অর্থ বিতরণ করে চলেছেন। নতুন নতুন বিহারের দেয়াল অলঙ্করণ ও সৌন্দর্য বর্ধনে ডাক পড়ে বীতপালের। ওর পরামর্শ মতো শিল্পনির্মাণ এগিয়ে চলে বিভিন্ন রাজ্যে। শত শত শিল্পী জন্ম নিয়েছে পালরাজ্যে। ওদের সঙ্গে ঘুরেফিরে ও শিল্পসাধনায় ডুবে থেকে দিন এগিয়ে যায় বীতপালের। বিয়ের কথা আর মনেও ওঠে না। বিহারের আচার্য ও ভিক্ষুদের সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়ে নিজেও প্রায় নির্মোহ হয়ে উঠেছে। ঘর সংসার বা অন্য কোনো জাগতিক প্রাপ্তির প্রতি কোনো আকর্ষণ অনুভব করে না।

এভাবে কেটে যায় বেশ অনেক বছর। আরেকটা তীব্র আঘাত বীতপালের প্রায়-নির্মোহ জীবনে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে আনে আবার। মন্দিরের সেবাদাসী হয়ে শুরুতে নিজেকে অন্যরূপে আবিষ্কার করেছিল বসুধা। ধরে নিয়েছিল যে বাকি জীবন কেটে যাবে ওভাবে। হয়তো কিছুটা শিথিলও হয়ে পড়েছিল। অসংলগ্ন অবস্থায় কোনো এক রাতে প্রথম শরীরের আস্বাদ পায় সে। ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠেছিল ওর জীবন ও জগত।

দিনের বেলা মনের অপ্রতিরোধ্য পাপচিন্তা আতঙ্কিত করে রাখত ওকে। কিন্তু রাত হলে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারত না। সঁপে দিত প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে। এভাবে কাটিয়ে দেয় কিছুদিন। তারপর যখন বুঝতে পারে যে সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছে তখন দিশে হারিয়ে ফেলে।

সবকিছু খুলে বলে বীতপালের কাছে। শেষ পর্যন্ত ঐ সন্তান সহ ওকে বিয়ে করতে চায় বীতপাল। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার চেয়ে মানুষের জীবন অনেক বেশি বড়। কিন্তু বসুধা আত্মবিসর্জন দিবে বলে সিদ্ধান্ত জানায়। দ্রুত বাবামায়ের কাছে ফিরে যায় বীতপাল। অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওকে বিয়ে করে ঘরে তুলে নেয়।

ওখানেই শেষ হয় না ঐ অঘটনের। সন্তান জন্ম দিতে যেয়ে মারা যায় বসুধা। শুরু হয় বীতপালের জীবনের কঠিন অধ্যায়। এমন এক শিশুর ভার এসে পড়ে ওর উপর যে শিশুটি ওর ঔরসজাত না। অনেক ধৈর্য নিয়ে শিশুটিকে লালন-পালন করে সে। নিস্তরঙ্গ অনেক বছর পেরিয়ে সে বড় হলে দেয়াল অলঙ্করণ শিল্পী হিসেবে ওকে গড়ে তোলার ব্যবস্থা নেয় বীতপাল। মন্দিরের দেয়ালগাত্র চিত্রণের কাজে লাগিয়ে দেয় ওকে। বেশির ভাগ সময় সে মন্দিরে কাটায়।

কোনো এক দুর্বল মুহূর্তে একদিন এক ভান্তের কাছে ওর জীবনের কাহিনিটা বলে। ওর মায়ের নাম শুনে চমকে উঠে ঐ ভান্তে। এখান থেকে বেরিয়ে বসুধা যে একটা সন্তান জন্ম দিয়েছিল তা জানত না সে। এবং ঐ সন্তানটি যে ওরই ঔরসজাত! মনের ভেতর নেমে আসে ভীষণ অশান্তির প্রবল এক বন্যা। হায় ভগবান, সারা জীবন কাটিয়ে দিলাম ঐ ভজনায়। অথচ যৌবনের এক অতিদুর্বল মুহূর্তের ভুলের মাশুল এখন ওর চোখের সামনে! কী করবে সে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধ বয়সে, মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবে এই ছেলের হাত ধরে, এবং সমাজে ওকে পুত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে, না এই ভান্তের ভুল জীবন চালিয়ে যাবে? শেষ পর্যন্ত বীতপালের শরণাপন্ন হয় সে। বীতপাল ওকে জানায় যে সমাজ নিয়ে না ভাবলেও ভান্তের চলবে। সমাজে বীতপাল ওকে পুত্র হিসেবেই পরিচয় দিয়েছে। সত্য গোপনের চেষ্টা না করে সে এটা ছেলের কাছে প্রকাশ করেছে। অন্য কেউ জানে না এটা। হয়তো কোনো দুর্বল মুহূর্তে সে ভান্তের কাছে বলে ফেলেছে ওটা। ভান্তে বলেই ওকে বিশ্বাস করে কাজটা করেছে সে। মানুষ তো তার গোপন খুব বেশিক্ষণ বা বেশিদিন চেপে রাখতে পারে না। ভান্তেকে ফিরিয়ে দেয় বীতপাল।

ছেলেটির জীবনে আশ্চর্য এক পরিবর্তন নেমে আসে। নিজেও ফিরে যেতে চায় সে মন্দিরের সেবায়েত হতে। বীতপাল বোঝায়, এতে লাভ হবে কি? কী লাভ হয়েছে ওর মায়ের, বা জন্মদাতা পিতা বা পালক পিতার। মন্দিরের সংস্পর্শে এসে সবারই তো জীবন খোয়াতে হয়েছে। খুব সরল অথচ গভীর এক দার্শনিক কথা বলে ছেলেটি। কেউ যদি না খোয়ায় তাহলে অন্যেরা পাবে কীভাবে? বীতপাল বোঝায় ওকে যে ওর এই খোয়ানোটাতে অন্যের প্রাপ্তি নেই। তবুও বোঝে না সে। শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নেয় যে দু'জনেই সংসার জীবন গ্রহণ করবে, যদি বীতপাল আগে সংসার শুরু করে। বীতপাল সম্মত হয় না প্রথমে। কিন্তু ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে যে বীতপাল বিয়ে না করলে সে সংসার জীবনে আসবে না। শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে বীতপাল। দু'বছর পর এক পুত্র জন্ম নেয় ওদের ঘরে। বীতপাল এবার পীড়াপীড়ি করে ওর বিয়ের জন্য। সে বলে, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করবে না সে। বিয়ে নিশ্চয় করবে। পরিবার জীবনের প্রতি আরও গভীর মোহ সৃষ্টি হোক যেন ছেড়ে না যেতে হয় গৌতমের মতো। প্রতিমা নির্মাণ শিখতে চায় সে বীতপালের কাছে। সম্মত হয় না বীতপাল। শিল্পীর জীবন বড় দুঃখের। কোনোভাবেই এটা নিস না। জবাবে সে বলে, সংসারে যদি বাঁধতে চাও আমাকে তাহলে শিল্প দিয়েই বাঁধতে হবে। এরপর মন্দিরে নিয়ে যায় ওকে বীতপাল। বলেছিলি তোর মায়ের কোনো প্রতিমা কেন নির্মাণ করিনি, দেখবি? যমুনেশ্বরী নদীতীরের ঐ মন্দিরে নিয়ে যায় ওকে। সত্যিই কী ওটা ওর মায়ের আদল? বিশ্বাস না হলে তোর জন্মদাতা পিতাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। ওর পিতাকে নিয়ে আসে বীতপাল। বাকরুদ্ধ হয়ে যায় ওর পিতা। কীভাবে এটা সম্ভব?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮

জীবন ও যৌবনের শুরু থেকে প্রায় পুরোটা সময় হাতির হাওদা ও ঘোড়ার জিনে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন দেবপাল। সারাজীবন জয়োল্লাস ও সুসংবাদ পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। জীবনের শেষভাগে এসে কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি।

পিতামহ গোপালদেবের রাজ্যাভিষেক ছিল ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তারপর পিতাজি ধর্মপালদেবের দিগ্বিজয় ছিল গৌড়রাজ্যের এক অনন্য ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের ধারাবাহিকতা পুরোপুরি ধরে রেখে গৌড়বাংলার জন্য এক গৌরব ও আনন্দমুখর সময়ের দৃষ্টান্ত রেখেছেন দেবপাল। কিন্তু পুত্র মহেন্দ্রপালের দিকে তাকিয়ে হতাশ হন এই গৌড়াধিপতি। এমনকি শূরপালকেও ভরসা করতে পারছেন না তিনি। পিতা-প্রপিতাদের সামান্যতম যোগ্যতাও এরা ধারণ করে না। তুলনামূলকভাবে বরং জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল অনেকটা এগিয়ে ওদের থেকে। জয়পালও দেবপালের মতো বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। দেবপালের পর গৌড়াধিপতির এই বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা মনে হয় না কারো আছে। এমনকি সম্মিলিতভাবেও এই পালরাজ্যটা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না এরা। পিতাজির মহামন্ত্রী গার্গের পুত্র দর্ভপাণি গত হয়েছেন। দর্ভপাণির পুত্র সোমেশ্বরকেও মন্ত্রী হিসেবে ততটা ভরসা করতে পারেন না দেবপাল। দর্ভপাণির দৌহিত্র কেদারমিশ্র বরং অনেক প্রজ্ঞাবান। উপদেষ্টা হিসেবে তাঁকে সঙ্গে রাখেন এখন তিনি।

তাতভ্রাতা জয়পাল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানে ও রাজ্যশাসনে সহায়তা দিয়েছে তাঁকে। কিন্তু শূরপাল ও মহেন্দ্রপালের মধ্যে ঐ যোগ্যতাটা নেই। বিগ্রহপাল তো অনেকটা মন্দিরবাসীই হয়ে উঠেছে। রাজকার্যে ওর মন নেই। পিতা জয়পালের সঙ্গে যুদ্ধযাত্রায়ও সঙ্গী হয় না সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarbol.com ~

বৃদ্ধ জয়পাল অধিকাংশ সময় কাটান পাটলিপুত্রে। বিগ্রহপালকে ওর পিতার অধীনেই ন্যস্ত রেখেছেন দেবপাল। অধিকাংশ সময় গৌড়ে অবস্থান করেন শূরপাল। ফলে মহেন্দ্রকে বঙ্গ সমতটে পাঠিয়ে দেন দেবপাল।

বিগত একশো বছরে গড়ে ওঠা পালরাজ্যটি নিয়ে সত্যি অর্থেই দুর্ভাবনায় পড়েন মহারাজ দেবপাল। বঙ্গোপসাগর থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব ধরে রাখা সত্যিই কঠিন। অসংখ্য জাতি ধর্ম ভাষা ও বর্ণে বিভক্ত এই বিচিত্র ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ কোনোভাবেই আয়াসসাধ্য নয়। মেধা, শক্তি ও প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মিলনে এই মহাকঠিন কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব। কিন্তু মহেন্দ্র, বিগ্রহ ও শূরপালের সম্মিলিত শক্তিও এর ধারেকাছে যায় না।

বাল্যকাল থেকে ঠাকুর্দা গোপালদেব ও পিতাজি ধর্মপালের কাছ থেকে উদাহরণ হিসেবে শুনে এসেছেন বাংলার রাজা শশাঙ্কের ইতিহাস। যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে না পারায় অসীম সম্ভাবনাময় বাংলা রাজ্যটি কীভাবে শত বছরের অন্ধকারে হারিয়ে গেছিল। বাংলার এই বীররাজা প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাট হর্ষ ও ভাস্কর বর্মনকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছিলেন। শক্তিমান রাজা শশাঙ্ক গৌড়কে সর্বপ্রথম একটা স্বাধীন রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গুপ্তরাজাদের হটিয়ে কর্ণসুবর্ণে নিজের স্বাধীন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উত্তরে প্রাগজ্যোতিষ পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করেছিলেন। বঙ্গ ও সমতট নিজ রাজ্যভুক্ত করে স্বাধীন ও শক্তিশালী গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অথচ যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে সক্ষম না হওয়ায় তাঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

পালরাজ্যের সামনে আর কোনো আলো দেখতে পাচ্ছেন না মহারাজ দেবপাল। রানি মহতদেবীর সঙ্গে একান্তে কথা বলেন–

'ভগবান তো সবই দিয়েছেন আমাদের, মহারানি। বাহুবল, রাজ্যবল, অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি, কোনোকিছুরই কমতি নেই। এখন এ বয়সে মনে হয়, ভগবান যদি সবকিছুর বিনিময়েও একটি সুপুত্র ভিক্ষা দিতেন!'

'কেন মহারাজ, মহেন্দ্র বা শূরপালের কমতি কীসে?'

'শক্তিমত্তায় রানি, শক্তিমত্তায়, প্রজ্ঞায়, ধীশক্তিতে, রাজগুণে।'

'ওসব নেই ওদের?'

'আমাদের রাজ্যের যে বিস্তার এখন, সে-তুলনায় নিশ্চয় নেই। ছোটোখাটো কোনো রাজ্যের রাজা হওয়ার যোগ্যতা হয়তো ওদের রয়েছে। তাও পৈতৃক সূত্রে পাওয়া।'

'মহারাজও এ বিশাল রাজ্যটি পৈতৃক সূত্রেই পেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ মহতদেবী, ওটা শুধু রক্ষাই করিনি, বিস্তৃতও করেছি। একটা দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপর দাঁড় করিয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাহলে তো ওটার উপরই টিকে থাকার কথা।'

'যদি যোগ্য উত্তরসূরি থাকে। মহেন্দ্রদের কাছে আর কোনো প্রত্যাশা নেই আমার। রাজ্যবিস্তারের প্রয়োজন দেখি না। শুধু এটুকু ধরে রাখতে পারলেই খুশি হতে পারতাম।'

'ওরা পারবে নিশ্চয়।'

'কোনো লক্ষণ দেখি না আমি, রানি। এমনকি বিগ্রহপালেরও যদি ঐ ক্ষমতা থাকত, ওকে রাজ্যভার অর্পণ করতে কুণ্ঠিত হতাম না। আমাদের এই বিশাল রাজ্যটা শুধু পিতাজির একার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেনি। পিতৃব্য বাকপাল মহাশয়েরও প্রায় সমপরিমাণ অবদান রয়েছে। আমার সঙ্গে জয়পালদেব যেভাবে হাতে হাত ধরে এগিয়েছে তাতে বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়েছে। জয়পাল সঙ্গে না থাকলে কখনোই এত বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারতাম না আমি।'

'হ্যাঁ, সকলের সহযোগিতায়ই বড় একটা কিছু গড়ে উঠে।'

'এসবের সমন্বয়ের জন্য একটা নেতৃত্ব থাকতে হয়। ওটা যে কারো মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না।'

চুপ করে থাকেন মহতদেবী। রাজকার্যের এসব বিষয়ে খুব একটা জড়াননি কখনো তিনি। যুদ্ধ ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে আজীবন বুঁদ হয়ে ছিলেন মহারাজ। এখন কিছুটা হালকা হওয়ায় কথা বলছেন মহারানির সঙ্গে। এখানে ওর করণীয় তো কিছু নেই। কোনো সুপরামর্শ দেয়ার যোগ্যতাও রাখেন না তিনি। তবে এটা বুঝতে পারেন যে মনের বোঝা কিছুটা হালকা করার জন্য রানির সঙ্গে কথা বলছেন মহারাজ। নিজে নিজেই হয়তো ভেবে বের করবেন কোনো না কোনো কিছু। রাজা ও রাজনীতি নিয়ে খুব বেশি ভাবার ক্ষমতা নেই রানি মহতদেবীর। চুপচাপ শুনে যান দেবপালের কথা। তেমন কিছু না ভেবেই দু'একটা মন্তব্য করেন মাঝে মাঝে।

শুধু যে উত্তরাধিকারী রাজা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা দেবপালের ভেতর, তাই না। এতদিন তো ভারতবর্ষের তিনটে কোনার প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে ঠোকাঠুকি চলছিল। কিন্তু ভবিষ্যতে সম্ভবত বাইরে থেকে এগিয়ে আসছে মহাদুর্যোগ। তরুণ কেদারমিশ্রকে নিয়ে একদিন আলোচনায় বসেন দেবপাল। তরুণেরা অনেক বেশি খোঁজখবর রাখে। যথেষ্ট সচেতন ওরা। কেদারমিশ্রের সঙ্গে দেবপালের সম্পর্ক অনেকটা হালকা। সোমপুর প্রাসাদের খোলা চত্বরে এসে বসেছেন দেবপাল। ওখানে এসে মহারাজকে প্রণাম করে কেদারমিশ্র।

'বসুন কেদারমিশ্র মহাশয়।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'খবরাখবর কী বল দেখি, কেদারি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সব ভালো মহারাজ।'

'হ্যাঁ ভালো দিয়েই শুরু করতে হয়।'

'সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'তাহলে শেষেরটা শেষেই থাক। শুরুরটা দিয়ে শুরু কর।'

'পিতাজির শরীরটা ভালো নেই।'

'সোমেশ্বরের ওটা ভালো ছিল কবে?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'কী আজ্ঞে, কেদারি?'

'আজ্ঞে পিতাজির শরীরটা ভালো না, মহারাজ।'

'ও তো একবার বলেছিস ছোঁড়া।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'আবার আজ্ঞে?'

মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকে কেদারমিশ্র। মনে মনে হাসেন দেবপাল।

'শোন তাহলে, খারাপ খবর দিয়ে শুরু করি একটা।'

কৌতূহল নিয়ে মহারাজের মুখের দিকে তাকায় কেদারমিশ্র।

'আরবদের নাম শুনেছিস?'

'শুনেছি মহারাজ। কম্বোজের অশ্বগুলো বিক্রি করতে আসে ওরা।'

'শুধু কম্বোজের ঘোড়া বিক্রি করতেই আসে না। কম্বোজেও ঘোড়া বিক্রি করে ওরা। ওদের ঘোড়াগুলো বিশ্বসেরা।'

'শুনেছি মহারাজ।'

'কম্বোজের ঘোড়ার সঙ্গে ওদের ঘোড়াও এখানে নিয়ে আসে ওরা। ঘোড়া বিক্রি করে ফেরার পথে ভারতবর্ষ হতে বস্ত্র, তেঁতুল, মসলা, মণিমুক্তা কিনে নিয়ে যায়। ওগুলো নাকি আরও উত্তরের রোম সাম্রাজ্যের মানুষদের কাছে বিক্রি করে।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'তেঁতুলকে ওরা কী বলে জানিস কেদারি?'

'আজ্ঞে না মহারাজ।'

'বলে হিন্দুস্থানের খেজুর। তেমারহিন্দ।'

'এত টক ফলের তুলনা মিষ্টি খেজুরের সঙ্গে হয় কী করে মহারাজ!'

'ওটা ঐ আরবরাই জানে। দুনিয়ার যত গোঁজামিল সব ওদের মধ্যে। ভাওতাবাজি, তুকতাক, উলোটপালোট, ভাঙাভাঙি সব।'

আপন মনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন দেবপাল। কিছু একটা ভাবেন মনে মনে। তারপর বলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'জানিস তো কেদারি, বৌদ্ধধর্মটা এক সময় পারস্যরাজের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। তারপরের বিষয় তো ইতিহাসেই আছে।'

'সবই ইতিহাসে আছে মহারাজ।'

'আরব বণিকেরা নাকি এখন ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওদের ধর্মটাও নিয়ে আসছে। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য ওদের পদানত হয়েছে। ভারতবর্ষ ও পারস্যের মধ্যে যে পার্বত্য অঞ্চলটা পার্থক্য গড়ে রেখেছে ওটার দখলও ওরা প্রায় নিয়ে নিয়েছে। ওদের আগ্রাসী শক্তির বিপক্ষে কোনো সাম্রাজ্যই টিকে থাকতে পারছে না। এমনকি রোমান সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটতে শুরু করেছে ওদের বিধ্বংসী আক্রমণের আঘাতে।'

'কিছু কিছু শুনেছি মহারাজ।'

'বলিসনি কেন?'

'সুযোগ হয়নি মহারাজ।'

'আমার ভয় হচ্ছে এ কারণে যে প্রাচীন রোম ও পারস্য যেখানে লুটিয়ে পড়েছে ওদের ভয়াবহ আক্রমণে সেখানে গুর্জার-প্রতিহাররা ওদের প্রতিরোধ করবে কীভাবে?'

'গুর্জার-প্রতিহাররা তো এমনিতেই এখন দুর্বল শাসকে পরিণত হয়েছে।'

'ওটাই তো ভাবনার বিষয় কেদারবাবু।'

'ওদের সঙ্গে নিয়ে একটা সংঘশক্তি গড়ে তোলা যায় না মহারাজ?'

'জন্মাবধি যারা পরস্পরকে শত্রু মনে করে আসছে তাদের নিয়ে সংঘশক্তি হয় কীভাবে?'

'ভাবনার বিষয়ই মহারাজ।'

'আরও একটা বিষয় আছে কেদারি, মহাভাবনার।'

'কী ওটা মহারাজ?'

'ভারতবর্ষে আমরা যুদ্ধ করে আসছি সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে। যুদ্ধের কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করি আমরা, যতদূর সম্ভব। কিন্তু কোনো নিয়মকানুনের বালাই নাকি ওদের নেই।'

'ওটা কেমন মহারাজ?'

'সামনে, পেছনে, গোপনে, অতর্কিতে যে কোনো দিক থেকে, কোনো ঘোষণা না দিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওরা।'

'ভয়ানক কথা, মহারাজ।'

'তারপর আমাদের সেনাদল হচ্ছে পেশাদার, বৈতনিক। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে যুদ্ধ করে ওরা। লুটতরাজ, নারী নির্যাতন, এসবের অনুমতি নেই ওদের। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। পরাজিত রাজা বিজয়ী রাজার আনুগত্য মেনে নেয়। প্রজাসাধারণের উপর দিয়ে তেমন ঝড় বয়ে যায় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কলিঙ্গের যুদ্ধটা মহারাজ?'

'ওটা একটা ব্যতিক্রম, কেদারবাবু। তাছাড়া ঐ যুদ্ধটায় সম্রাট অশোকের বিরুদ্ধে লড়েছিল প্রায় সমগ্র কলিঙ্গবাসী। ফলে রক্তক্ষয়টা হয়েছে ওরকম ভয়াবহ।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'যাহোক, যা বলছিলাম। ওদের সৈন্যেরা বিজিত অঞ্চলের সম্পদ ও নারীদের লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে অতিরিক্ত প্রাপ্তিলোভে ওরা যুদ্ধটা করে মরিয়া হয়ে, প্রাণপণে।'

'কী ভয়াবহ!'

'আরও আছে। ওদেরকে বিশ্বাস করানো হয় যে ওসব ধর্মযুদ্ধ। বিধর্মীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। জয়ী হলে রয়েছে প্রচুর সম্পদ ও নারী। আর মৃত্যু হলেও পুনর্জন্ম নিয়ে এ পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না। অসীম পরজীবনে স্বর্গে বসে অসংখ্য অপ্সরা ও অঢেল প্রাচুর্যময় সুখী জীবন লাভ করবে।'

'এমন কিছু কিছু শুনেছি, মহারাজ।'

'কার কাছে শুনেছিস?'

'বণিকদের কাছে। পশ্চিমদেশীয় বণিকেরা এদেশীয় বণিকদের সঙ্গে যখন গল্পগুজব করে, এসব শোনায়।'

'বিষয়গুলো হয়তো সত্যি।'

'হবে হয়তো মহারাজ।'

মহারাজের জলখাবারের সময় হয়েছে। ওদের জন্য জলখাবার নিয়ে আসে ভৃত্যের দল। কিছু কিছু মুখে দেন দেবপাল। কেদারমিশ্রকে খেতে বলেন। ক'দিন থেকে অসুখে ভুগছেন দেবপাল। শরীরের তাপমাত্রা রাতে বেড়ে যায়। কোনো কিছু খেতে ইচ্ছে হয় না। কেদারমিশ্রকে জিজ্ঞেস করেন–

'তোর বাবার কী নতুন কোনো অসুখ কেদারি, না সাংবাৎসরিক ব্যামো?'

'বোঝা যায় না মহারাজ, কোনটার ফাঁকে যে কোনটা।'

'এটা ভালো বলেছিস। সুস্থ হলে ওকে একটু আসতে বলিস তো। কাজকর্ম তো বিশেষ কিছু নেই আমার, তোদের সঙ্গে একটু কথাটথা বলে সময় কাটানো আর কী।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'যাবি এখন তুই?'

'আজ্ঞে মহারাজ, নমস্কার।'

দেবপালকে গড় হয়ে প্রণাম করে ওখান থেকে বেরিয়ে যায় কেদারমিশ্র। অনেকক্ষণ কথা বলে মাথা কিছুটা হালকা হয়েছে দেবপালের। কিন্তু শরীর ব্যথা করছে। আবার শরীরে তাপ আসছে কীনা কে জানে। প্রাসাদের ভেতর শোবার ঘরে যেয়ে শুয়ে পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারের বৌদ্ধপূর্ণিমায় সোমপুর বিহারে পূজাঅর্চনা করে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন দেবপাল। পূর্ণিমার দিন সকালে সোমপুরের প্রাসাদভবনের সামনে মহারাজের রথ প্রস্তুত হয়ে এসে দাঁড়ায়। চার ঘোড়ায় টানা কারুকার্যময় রথটির দিকে তাকিয়ে থাকেন দেবপাল। শরীর এতটাই দুর্বল হয়েছে যে হেঁটে ঐ রথে যেয়ে বসতেও ইচ্ছে হয় না। মনের এ অবস্থাটা লুকিয়ে রেখে উঠে যান তিনি। রাজকীয় ঘোড়সওয়ার বাহিনী এগিয়ে চলে তাঁর রথের দু'পাশে। পথে যেতে যেতে দু'চোখ ভরে দেখেন প্রকৃতির অপরূপ সাজ। যুদ্ধ ও রাজ্যশাসনের ডামাডোলে কত কিছু যে ছেড়ে দিতে হয়েছে এ জীবন থেকে ভগবানই জানেন। নদীর তীর থেকে উঠে আসা বাতাস হু হু করে রথের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। শীত শীত লাগে দেবপালের। যৌবনের দিনগুলোয় শীত-গ্রীষ্মের পার্থক্য অনুভব করতেন না। এখন মনে হয় প্রতি চন্দ্রকলায় বয়স বেড়ে যাচ্ছে এক বছর করে। মনে হয় খুব বেশি আর অবশিষ্ট নেই এ জীবনের। সমবয়সীরা একে একে বিদায় নিতে শুরু করেছে। জয়পালও বুড়ো হয়ে গেছেন। দর্ভপাণি মহাশয় গত হয়েছেন। সোমেশ্বর শয্যাশায়ী। এখন এই তরুণ কেদারমিশ্র হয়েছে ওর সঙ্গী।

আজীবন সাফল্য ভোগ করে এই বুড়ো বয়সে হতাশার জালে জড়িয়ে পড়তে ভালো লাগে না দেবপালের। জীবনের এত সব প্রাপ্তি ও অর্জন কী শেষ পর্যন্ত ধুলোয় লুটোবে? এই প্রাপ্তিগুলোর জন্য তিন পুরুষের একশোটি বছর কী ভয়াবহ সংগ্রামই না করতে হয়েছে, হা ভগবান!

সোমপুর বিহারে পৌঁছার পর ঘটা করে মহারাজকে অভ্যর্থনা কক্ষে নিয়ে যায় আচার্যরা। কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে ওখানে। সুগন্ধি, লেবু ও গোলাপজল মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করা হয়। একটু একটু করে ওটা পান করেন মহারাজ। বেশ তৃপ্তি অনুভব করেন। মহাবিহারের আচার্য ও ভিক্ষুরা সবাই দ্বিপ্রহরের আগে অন্ন গ্রহণ করেন। মহারাজেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ওদের সঙ্গে।

রাজকীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে বিহার-প্রাঙ্গণে বসে আচার্যদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন দেবপাল।

'বলুন, কেমন চলছে আপনাদের আচার্য মুক্তিমিত্র মহাশয়?'

'ভগবান বুদ্ধের কৃপায় নিশ্চয় ভালো মহারাজ।'

'শুনেছি হিমালয়ের রাজ্যগুলোয়ও আমাদের শ্রমণেরা মহামুনির বাণী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে?'

'আজ্ঞে মহারাজ। চৈনিক পরিব্রাজকও আসছে। আমাদের বিহারেই পুবদেশের অনেক ভিক্ষু ও শ্রমণ রয়েছে মহারাজ।'

'আচ্ছা আচার্য মহাশয়, সম্রাট অশোকের সময়, হাজার বছরেরও আগে পশ্চিমের পারস্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত বুদ্ধের বাণী ও ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল, তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ বিষয়ে মহারাজ যা জানেন তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা জানি না। তবে বুদ্ধের বাণী ও শিক্ষা মনে হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। বৈদিক ও লৌকিক ধর্মের সঙ্গে মিশে সুপ্ত হয়ে আছে।'

'হতে পারে আচার্য মহাশয়।'

'পুবদেশে কিন্তু খুব দ্রুত প্রসার লাভ করছে এখন এটা, মহারাজ।'

'কোনো সংঘাতে যেন জড়িয়ে না পড়ে এটা লক্ষ্য রাখতে বলবেন আপনার শ্রমণদের।'

'নিশ্চয় মহারাজ। প্রভু বুদ্ধের বাণীই হচ্ছে অহিংস। শ্রমণদের সংঘাতে জড়ানোর প্রশ্নই আসে না।'

'অন্য কিছু ধর্মের বিষয়ে শুনেছি ওদের মূলমন্ত্রই হল শান্তি।'

'কথাটা হয়তো বলে ওরা। কাজটা তো দেখি না, মহারাজ।'

'ওদের শান্তিটা হয়তো আসে রক্তপাতের পর।'

'হয়তো চিরশান্তি! বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে এটা হওয়ার আশঙ্কা নেই মহারাজ।'

'তাই কী আচার্য মহাশয়?'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'সম্রাট অশোক ভারতবর্ষ জুড়ে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। তার আগে মনে হয় কিছুটা রক্ত ঝরিয়ে নিয়েছিলেন।'

'কিছুটা তো নয় মহারাজ। রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিলেন তিনি।'

'ওটা বলেছি যেন মনোকষ্ট না পান আপনি।'

'তা নয় মহারাজ। আমার মনোকষ্টে কিছুই আসে যায় না। দুঃখ কষ্ট, লোভ লালসাকে জয় করাই প্রভু বুদ্ধের নির্দেশনা। বিষয়টা হল, ঐ রক্তপাত ঘটানোর আগে সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ছিলেন না, মহারাজ।'

'আগে না পরে, কী আসে যায় আচার্য মহাশয়। এখনও রক্তপাত ঘটিয়ে চলেছি আমরা।'

'আমরা সব সময় উপাসনা করি এটার অবসানের জন্য, মহারাজ।'

'করুন, উপাসনা করুন। একদিন না একদিন ওটা বন্ধ হবে, আচার্য মহাশয়।'

আর খুব বেশি এগোয় না ধর্ম নিয়ে এ আলোচনা। ধর্মতত্ত্বের পথ ধরে অন্যান্য বিষয় এসে যায় ওদের আলোচনায়। বিভিন্ন পুজো, অর্চনা ও মন্ত্রপাঠের অনুষ্ঠান চলতে থাকে সারাদিন। সন্ধ্যাবেলা আকাশপ্রদীপ উড়িয়ে প্রাসাদে ফিরে আসেন দেবপাল। এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন।

খুব সকালে রাজচিকিৎসক সাত্যকি মহাশয় বগলে করে বিশাল 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়' গ্রন্থখানি নিয়ে মহারাজের শয্যাপাশে এসে করজোড়ে প্রণাম করেন। ওকে দেখে হেসে ওঠেন দেবপাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কী এখন ঐ অষ্টাঙ্গ হৃদয় খুলে উপাচার আরোপ করবে আমার উপর সাত্যকি বৈদ্য?'

'মহারাজ, খুব জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ এটা। বৈদ্যরাজ ভগবৎ মহাশয়ের রচনা

'অনেকবার শুনিয়েছ ওটা সাত্যকি।'

'আজ্ঞে মহারাজ।'

'ঐ গ্রন্থটা না খুলে চিকিৎসা কী দেবে বল দেখি সাত্যকি।'

মহারাজের নাড়ি টিপে, চোখ দেখে, জিভ টেনে শতবার নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে বৈদ্যগৃহে উঠে যায় সাত্যকি। আধ ঘণ্টা পর ফিরে আসে এক পেয়ালা সবুজ তরল নিয়ে। ওটা দেখে মহারাজ বলেন–

'সেই তো একই জিনিস সাত্যকি। এত ভনিতা কেন?'

জিভ কেটে বলে সাত্যকি–

'আজ্ঞে না মহারাজ, খেয়েই দেখুন।'

নাক চোখ কুঁচকে অষুধটা গলায় ঢেলে দেন দেবপাল।

'তুমি কী জান সাত্যকি যে ভগবান তোমাকে নরকে পাঠাবেন।'

'আজ্ঞে জানি মহারাজ।'

'ওখানে যেয়েও কী এই বৈদ্যগিরিটাই করবে?'

'নরকে চিকিৎসার সুযোগ নেই মহারাজ।'

'তাই তো বৈদ্য মহাশয়। ভুলেই গেছিলাম।'

সাত্যকি বৈদ্যের তেতো অষুধ খেয়ে সত্যিই ভালো হয়ে উঠেন দেবপাল। কিন্তু মনের অশান্তি আর যায় না। দীর্ঘ এ জীবনের সবকিছু অর্থহীন মনে হয়। এমন একটা সফল জীবন এ পৃথিবীতে ক'জনই বা আর যাপন করে যেতে পারে। অথচ এখন এটাকে একেবারে অর্থহীন মনে হয়।

প্রভু বুদ্ধের বাণী এখন অন্তরে অনুভব করেন দেবপাল। এ জীবন দুঃখময়। পৃথিবীর তাবৎ মোহ ত্যাগ করে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে হয় মহানির্বাণ লাভের দিকে। এটা কী কখনো সম্ভব ভগবান! মানুষ কী করে মোহমুক্ত হতে পারে! ঐ নির্বাণ বাসনাটাও কী এক প্রকার মোহ নয়?

এক মহারহস্য এ জীবন। প্রাপ্তিবাসনা থেকে সৃষ্টি হয় মোহ। প্রাপ্তিযোগের পরই কেবল মোহমুক্তি ঘটে। পাওয়ার আগে মোহমুক্তির উদাহরণ আছে কী এ জগতে? কী মোহে এ জীবন-সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে দেবপাল, জিজ্ঞেস করে নিজেকে। রাজ্য, রাজশক্তি, না অন্য কিছু? জীবনের শুরুতে তো কোনো আচার্য এসে বলেনি, যুদ্ধে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তোমার দেবপাল, মোহমুক্তি ঘটাও, নির্বাণ লাভ কর, মহানির্বাণ!

এক অজানা রহস্যের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন দেবপাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯

রাজবৈদ্যের অষুধের গুণে অথবা দীর্ঘ ক্লান্তিজনিত কারণে রাতের ঘুমটা খুব ভালো হয় দেবপালের। হালকা মন নিয়ে ঘুম থেকে ওঠেন। মনে মনে ভাবেন নৌভ্রমণে যাবেন কোথাও।

সোমপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া যমুনেশ্বরী নদী কিছুটা ভাটিতে নেমে আত্রাই নদীর সঙ্গে মিশেছে। এই মিলিত স্রোত আরও ভাটিতে যেয়ে মিশেছে নাগর নদীর সঙ্গে, তারপর আবার করতোয়ার সঙ্গে। এই স্রোতধারা আবার বাঙালি ও বড়াল নদীর সঙ্গে মিশে যেয়ে পড়েছে প্রমত্তা পদ্মায়। এসব নদীর প্রসারণে এখানে অনেক জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। দেবপালের মনে পড়ে প্রথমবার প্রাগজ্যোতিষ অভিযানের সময় একটা জ্যোৎস্না রাত এখানে কাটিয়েছিলেন বিলের উপর ভেসে। অসাধারণ সৌন্দর্য এ বিলটার। রাতের নিস্তব্ধ প্রকৃতি, ঝিরঝিরে বাতাস এক জাদুকরী স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায় শরীরে। মশাল জ্বেলে বর্শা দিয়ে গেঁথে বিল থেকে মাছ শিকার করছিল দেবপালের সৈন্যেরা। বিশাল আকৃতির একটা মাছ ধরা পড়েছে ওদের হাতে। ওটা ঘিরে ওদের চেঁচামেচি শোনেন দেবপাল। ওদের কলহাস্যে পুরো বিল মুখর হয়ে উঠেছিল অনেক রাত পর্যন্ত।

নাগর নদীর পশ্চিম তীরে সামন্তরাজা সৌম্যপালের প্রাসাদ। ওর আতিথ্য গ্রহণের জন্য দীর্ঘ দিন থেকে প্রার্থনা জানিয়ে আসছিল সে। এই অবসরে ওর ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে জানান দেবপাল। নদীর তীর থেকে প্রাসাদ পর্যন্ত তোরণ সাজিয়ে দেবপালকে অভ্যর্থনা জানায় সৌম্যপাল। এসব আর ভালো লাগে না দেবপালের। বরং চুপিচুপি কোথাও ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। কেদারমিশ্রকে ওর ইচ্ছেটি জানান দেবপাল। সে বলে যে এখান থেকে ফিরে কাউকে কিছু না জানিয়ে শুধু একদল গোপন দেহরক্ষী সৈন্য নিয়ে বেরোবে এর পরের দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা সৌম্যপালের প্রাসাদে দ্বিপ্রাহরিক ভোজসভার পর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন দেবপাল। সোনার থালায় ভর্তি মুক্তো এনে মহারাজকে উপঢৌকন দেয় রাজা সৌম্যপাল। একটু ভাবেন মহারাজ। দেহরক্ষী সৈন্যদলের সেনাপতিকে আদেশ দেন একদল সৈন্যকে সারিবদ্ধভাবে মাঠের পাশে দাঁড় করাতে। মহারাজ ওদের পাশে যেয়ে থালা থেকে এক মুঠো মুক্তো নিয়ে ছুঁড়ে দেন। সৈনিকেরা ঘাড় ঘুরিয়েও দেখে না। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সেনাপতিকে দেবপাল বলেন, 'যার সামনে যে মুক্তোটি রয়েছে সে যেন ওটা কুড়িয়ে নেয়।'

মহারাজের বজরা পর্যন্ত এগিয়ে আসে রাজা সৌম্যপাল। তারপর রাজপ্রণাম সেরে বিদায় জানায় তাঁকে। পরদিন সোমপুর বিহার প্রাঙ্গণে আচার্য মহাশয়ের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে তাঁকে অনুরোধ জানান একদল ভিক্ষুকে মাঠের এক প্রান্তে দাঁড় করাতে। রাজা সৌম্যপালের দেয়া অবশিষ্ট মুক্তোগুলো ছুঁড়ে দেন ওদের সামনে। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে ওগুলো কুড়িয়ে নেয় ওরা। এই আচার্য মহাশয় গতকালও দেবপালের ভ্রমণসঙ্গী হয়েছিল। একটু অবাক হয় সে। কী বোঝাতে চান মহারাজ দেবপাল।

কিছুক্ষণ পর দেবপাল বলেন–

'আচার্য মহাশয়, এক সময় এই মুক্তোগুলোর মূল্য আমার কাছে ছিল অপরিসীম। এখন হয়তো ধূলি পরিমাণও না। কারণ এসবের প্রয়োজন আর নেই এখন আমার। আমার প্রয়োজন আর ক'টা দিন আয়ু। যেন একজন যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে পারি। আর গতকাল যে সৈনিকদের দেখেছেন, ওদেরও ঐ মুক্তোগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু সৈনিকের ধর্ম শৃঙ্খলা, ওটা ভেঙে ঐ প্রয়োজন মেটাতে পারে না ওরা। আপনার ভিক্ষুদের প্রয়োজন মোহমুক্তি। মুক্তোর কী প্রয়োজন রয়েছে ওদের আপনিই ভালো বুঝবেন।'

বিষয়টা বুঝতে পারেন আচার্য মহাশয়। চুপ করে থাকেন। পরদিন কেদারমিশ্র অনেকটা গোপনে ছদ্মবেশী প্রহরী সৈন্যদল সহ মহারাজকে নিয়ে নদীপথে বেরিয়ে পড়ে। অনেকটা দূরে নদীর বিস্তীর্ণ জলে পৌঁছে বজরা থেকে বেরিয়ে আসেন দেবপাল। কিছুক্ষণ বসে থাকেন চুপচাপ। তারপর বিছানা পেতে দিতে বলেন ওখানে শোয়ার জন্য। চিত হয়ে শুয়ে হেমন্তের শুকনো আকাশ দেখেন। হালকাভাবে কিছু মেঘ ভেসে রয়েছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারেন না যে কোথাও ভেসে যাচ্ছে কিনা ওগুলো। নিজের জীবনটাকেও এমনি এক গতিহীন জড়পিণ্ড বলে মনে হয় দেবপালের। কিছুক্ষণ পর এক ঝাঁক বলাকা উড়ে যায়। তারপর আরও এক ঝাঁক। অনেক ক'টা বলাকার ঝাঁক গোনেন দেবপাল। তারপর ক্লান্ত হয়ে যান। প্রাগজ্যোতিষের ঐ হ্রদগুলোর কথা মনে পড়ে। উত্তর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা উড়ে এসে পুরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীতকালটা কাটিয়ে যায় ওখানে। পরিযায়ী ঐ পাখির ঝাঁকের সঙ্গে মানুষগুলোর পার্থক্য কী? যখন যৌবন ছিল, এভাবে দল বেঁধে সারি সারি সৈন্য নিয়ে পশ্চিমে এগিয়ে গেছিল সে। আরব সাগর পর্যন্ত অভিযান চালানোর কী তীব্র বাসনাই না ছিল! ওসব সফল হয়েছে। এখন মনে হয়, তাতে কী হয়েছে? তখন মনে হয়েছিল জীবনের সকল অর্থ ঐ সাফল্যে নিহিত। এখন মনে হয়, অর্থহীন।

অস্বস্তিকর এক ঘুম অথবা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন দেবপাল। দুপুর গড়িয়ে যায়। ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারেন না কোথায় এখন তাঁর অবস্থান। মাথার উপর খোলা আকাশ। ঘাড় উঁচু করে পাশে তাকিয়ে দেখেন দূরে জলের রুপালি বিস্তার। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে। উঠে বসে দেখেন কেদারমিশ্র বসে রয়েছে সামনে। ওকে জিজ্ঞেস করেন–

'কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বল দেখি কেদারি?'

'মনে হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, মহারাজ?'

'সত্যিই ক্লান্ত আমি কেদারি।'

'আরেকটু বিশ্রাম নেবেন, মহারাজ।'

'নাহ্, খেয়ে নেই আগে।'

মনে মনে একটু অবাক হয় দেবপাল। খুব খেতে ইচ্ছে করে ওর এখন। অথচ প্রায় কোনো কিছুই হজম করতে পারে না। সাত্যকি বৈদ্য কীসব দেয়, ক'দিন ভালো থাকে, তারপর আবার বুকজ্বলা, টক-ঢেঁকুর ওঠা, এসব লেগেই আছে। অথচ খাওয়ার জন্য মন আকুলিবিকুলি করে। কী লজ্জার কথা, রাজার কী করে এমন খাইখাই স্বভাব দেখা দিতে পারে!

নদী থেকে সদ্য তোলা বিশাল রুই মাছের তরকারি রেঁধেছে রাজপাচক। সঙ্গে রয়েছে বরেন্দ্রে জন্মানো সাদা রঙের সরু চালের ভাত। এখানের চালগুলোর আশ্চর্য সুগন্ধি। এক টুকরো লেবুর রস ওখানে ছড়িয়ে দিলে অমৃত হয়ে উঠে যে-কোনো খাবার। বঙ্গ সমতটের গাভীগুলো কী ঘাস খায় ভগবান জানেন! এদের দুধ ও ঘিয়ের কাছাকাছি ভারতবর্ষের অন্য কোনো অঞ্চলের দুধ ও ঘি যায় না। জিভে জল এসে গেছে দেবপালের। স্নান করে খেতে বসেন কেদারমিশ্রকে নিয়ে।

ক'দিন নৌকোয় কাটিয়ে মহারাজের শরীরটা সত্যিই ঝরঝরে হয়ে ওঠে। সোমপুরে কাটান তিনি আরও কিছুদিন। শীত তীব্র হয়ে উঠার আগেই মঞ্জীরে ফিরে যান। রাজকার্য নিয়ে এখন আর খুব বেশি মাথা ঘামাতে হয় না তাঁর। কেদারমিশ্র ওর ঠাকুর্দা দর্ভপাণির স্থানটি নিয়ে নিয়েছে। বেশ ভালোভাবে সামলে নিচ্ছে রাজকার্যের সকল দিক। দেবপাল শুধু মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিয়ে যান সবকিছুতে। অনেক সময় ভেবেও দেখে না কীসে সম্মতি জানাচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতপক্ষে গত একশো বছরে পালরাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোয় একটা সুদৃঢ় ভিত্তি দাঁড়িয়ে গেছে। এটার উপর নির্ভর করে আরও অনেকদিন রাজ্যটা টিকে থাকতে পারে। এখন শুধু প্রয়োজন একজন যোগ্য প্রশাসকের যে দৃঢ়তা নিয়ে সবকিছু সামলে রাখতে পারবে। ঐ দৃঢ়কঠিন রাজপুরুষটিকে দেবপালের দিব্যচোখ কোথাও খুঁজে পায় না। এ নিয়ে আর আক্ষেপও করে না এখন। নিজের জীবনে যা করণীয় ছিল তা করেছে। অন্যের জীবন তো সে তৈরি করে দিতে পারে না। ভবিষ্যতই নির্ধারণ করবে আগামী দিনগুলোয় কী ঘটবে।

আপাতশান্ত দিন কাটিয়ে চলেছেন মহারাজ দেবপাল। কোথাও থেকে বড় কোনো সুসংবাদ নেই। দুঃসংবাদও নেই। এতেই খুশি দেবপাল।

এক সকালে পেটের ব্যথায় কাত হয়ে বিছানায় শুয়েছিলেন দেবপাল। প্রতিটা নিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর কানে আসছিল ইঁদুরের তীব্র কিচকিচে চিৎকার। ভেবে পাচ্ছিলেন না কোনোভাবে যে প্রাসাদভবনের ভেতর ইঁদুর ঢুকেছে কেমন করে! অনেক পরে বুঝতে পারেন যে ওটা ওর ফুসফুসের ভেতর থেকে আসা মিহি শব্দের চিঁচিঁ ধ্বনি। সাত্যকি এসে মধুর সঙ্গে কী সব মিশিয়ে একটা অষুধ তৈরি করে দেয়। ওটা খেয়ে কিছুটা সুস্থ বোধ করেন দেবপাল।

সকালের খাবার শেষ করে প্রাসাদের বারান্দায় এসে একটু আয়েসে শরীর ছড়িয়ে আরামকেদারায় বসেছেন দেবপাল। ছোট্ট একটা দুঃসংবাদ বিচলিত করে ওকে। কল্পনায়ও ছিল না যে এমন একটা কিছু অপেক্ষায় রয়েছে ওর জন্য। দূত খবর নিয়ে এসেছে, গত রাতে যমুনেশ্বরী নদীতীরের চাঁপাডাঙ্গা বিহারের আচার্য ভূদেব মহাশয় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। এই বিহারটি রাজশিল্পী বীতপালের গড়া। কিছুই ধারণা করতে পারেন না দেবপাল। প্রথমেই ডেকে পাঠান বীতপালকে। ও এলে জিজ্ঞেস করেন–

'আচার্য ভূদেব মহাশয়ের আত্মহননের বিষয়ে কিছু জান বীতপাল?'

অবাক হয় সে। ভেবে পায় না যে মহারাজ কেন এটা জিজ্ঞেস করছেন ওকে। মনে মনে ক্ষোভ জাগে। যেভাবেই হোক, আচার্য ভূদেব মহাশয় ছিলেন ওর জন্মদাতা, পিতা। অন্তর ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এখন ওর। বাইরে যদিও প্রকাশ করতে পারে না ওটা। অকস্মাৎ জেগে ওঠে ওর শিল্পীসত্তা। গুরুদেব দেবজ্যোতি মহাশয়ের কথা ক'টা মনে পড়ে। একজন শিল্পী হচ্ছে ঈশ্বরপ্রতীম। তার কোনো আনুগত্য নেই। না সৃষ্টির কাছে, না স্রষ্টার কাছে। গুরুদেবের দৃঢ় মুখভঙ্গিটি স্পষ্ট মনে পড়ে ওর। দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয় সে–

'আচার্য মহাশয় ওবিষয়ে কিছু বলে যাননি আমাকে, মহারাজ।'

ওর কণ্ঠের দার্ঢ্য বিস্মিত করে দেবপালকে। বুঝতে চেষ্টা করেন এটার পেছনের রহস্যটা কী! তাকিয়ে থাকেন বীতপালের মুখের দিকে। আশ্চর্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচেনা মনে হয় ওকে। বীতপালের এ রূপটা তো কখনো দেখেননি মহারাজ! জীবনে আর কত কী দেখার আছে, হে ভগবান! ধীরে ধীরে আবার জিজ্ঞেস করেন–

'আমি জানতে চেয়েছি তুমি কিছু জান কীনা। তোমার প্রতিষ্ঠিত বিহারের আচার্য ছিলেন তিনি। যদি কোনো ইঙ্গিত পেয়ে থাক, বা কোনো সূত্র।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে বীতপাল। আচার্যের মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে ওর মানসচোখে। দৃঢ়স্বরে বলে সে–

'আমি কিছু জানি না মহারাজ।'

অমোঘ সত্যের মতো উচ্চারিত শব্দ ক'টা দেবপালের কানের ভেতর অবিরত গুনগুন করতে থাকে, 'আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু জানি না...'

মনে মনে ভাবেন বয়োবৃদ্ধ মহারাজ: এ পৃথিবীর কেউ কী কিছু জানে?

আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় না ওকে। বিড়বিড় করে আচার্য ভূদেব মহাশয়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করেন–

উৎখিত্তখগ্‌গমতিহত্থদারুনন্তং
ধাবন্তিযোজনপথ'ঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভিসংখতমনো জিতবা মুনিন্দো
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক আমিয়াহ্, আমিয়াহ্, আমিয়াহ্ ...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~